কারাগারে ১৮ বছর

আজিজুল হক

৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭
স্বত্ব : মণিদীপা সৈয়েদা
প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

মুদ্রাকর :
শতদল গোস্বামী
নবগ্রন্থনা
৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবরোধ ভেঙে আজ পর্যন্ত সসম্মানে
বেঁচে থাকার জন্য যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের প্রতিনিধি

শ্রদ্ধেয় ডাঃ অবনী রায়চৌধুরী

ও

স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত-কে

কারাগারে ১৮ বছর

॥ প্রথম পর্ব ॥

এ লেখার ইতিহাস

বাবাই বড় হচ্ছে। বাবার সম্পর্কে ওর এখন অসীম কৌতূহল। এত লোক প্রশংসা করে, তার থেকেও বেশি লোক গালাগালি দেয়। যত লোক ভালবাসে, বেশি না হলেও প্রায় সমসংখ্যক লোক ভয় করে, এ কেমন বাবা? তাই এখন ও প্রায়ই জানতে চায়—বাবার জীবন। বিশেষ করে দেড় বছর বয়স থেকে ও বাবাকে দেখছে জালের ফাঁকে—জেলে! জেল বস্তুটাই বা কী? বিশেষ করে যে লোকটার ১৮টা বছর ঐ পাঁচিলের ভেতর কাটল—সেই জগৎটাই বা কেমন? ওর এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই এ লেখার অবতারণা। এখন বুঝতেই পারছি—আর বেশিদিন তো নেই—চরম মুক্তির জন্য দিন গুনছি। সুতরাং বলেই যাই না কেন কারাগারের কথা। স্মৃতিকথা লেখার আমি বিরোধী। বিরোধী, কারণ আমি মনে করি—যাঁরাই স্মৃতিকথা লেখেন প্রত্যেকেই মেগালোম্যানিয়ার রোগী। যতই সেলফ্-ক্রিটিক্যাল হোন না কেন! স্মৃতিকথার সেলফ্-ক্রিটিসিজম্—ব্যাজস্তুতি! দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা "ছ্যাখো আমি কত মহান! আমি নিজেকেও ছাড়িনি!" ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এগুলোর মূল্য তো নেই-ই। কেউ কিছু খুঁজে পেলে —সেটা তাঁর কৃতিত্ব! স্মৃতিকথা লেখকের নয়। তাছাড়া আমি ইতিহাস গড়ার শ্রমিক। ইতিহাস রচনার কারিগর নই। তাই এটা স্মৃতিকথা নয়। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার আগে কিছু না-বলা-কথা! সবথেকে বিতর্কিত মানুষটার মনের ভার হাল্কা করা। কেউ যদি কিছু খুঁজে পান—সেটা তাঁর দায়িত্ব। আমার নয়। একটা ত্রুটি, ছিদ্রান্বেষীরা খুঁজে তো পাবেনই—সেটা হল 'আমি'র প্রাদুর্ভাব। 'আমি'র আগে সমাজে 'আমরা' সৃষ্টি হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস তো প্রমাণ করেছে মানুষ আগে বাক্যের ব্যবহার শিখেছে, তার পর পৃথক পৃথক শব্দের মানে জেনেছে। আগে সে চিৎকার করে সঙ্গীদের বলেছে—'ঐ বনে বাঘ আছে।' তখন, সে 'বন' 'বাঘ' 'আছে' এসব কথার আলাদা আলাদা মানে জানত না। এরকম ভাবে সমষ্টি থেকে ব্যক্তি। তবুও তো—'আমার যখন পায়খানা পায়'—তখন তো বলি না—'আমাদের পায়খানা পেয়েছে!' তখন 'আমি' এসেই যায়। ভোগান্তিটার ভোগ যখন আমাকেই করতে হয়—অভিজ্ঞতাটা যখন আমার

ইন্দ্রিয়গুলো ক্ষতবিক্ষত করেই সঞ্চয় করতে হয়—তখন তো 'আমি' একটা ব্যাপার বটে। ব্যক্তি আর সমষ্টির এই যে দ্বন্দ্ব—এটা আছে। থাকবে। সমষ্টির অংশ ব্যক্তি। ব্যক্তির মিলনে সমষ্টি নয়। সেই সকলের-'আমি'-র 'আমিত্ব'টাই 'আমি' হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই এটা স্মৃতিকথা নয়। ভোগান্তির ইতিবৃত্তান্ত! এর জন্য আমার এতটুকু গ্লানি নেই। নেই অনুশোচনা! কেনই বা থাকবে! দিয়েছি যা পেয়েছি তো তার থেকে অনেক বেশি! হাত দিয়েছি, পা দিয়েছি, বৈদ্যুতিক শকে যৌনজীবন বিসর্জন দিয়েছি! নিউরনগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ মস্তিষ্ক দিয়েছি। পেয়েছি সারা অঙ্গে ক্ষত! অক্ষত শুধু হৃদয়ের ভালবাসা! ক্ষতের বিনিময়ে ভালবাসা, সেটা কি কম পাওয়া? আজও তাজা আমার হৃদয় যে ভালবাসতে পারে। ক্ষতগুলো যদি না থাকত, থাকত না ঘৃণা। ঘৃণা না থাকলে থাকে না ভালবাসা!

অনেকের সম্পর্কে সম্পর্কিত আমি। অনেকেই সে সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু মুছে ফেলতে পারবেন কি? জানি প্রশ্ন উঠবে। 'না' 'না', 'মিথ্যা', 'কুৎসা', এসব বিশেষণে ভূষিত হবে এ লেখা। তবুও ইতিহাস মিথ্যা হবে না। এ লেখার সত্যতা যাচাই করার জন্য থাকবে কিছু দলিল কিছু ব্যক্তি আর যাঁরা অস্বীকার করবেন—তাঁদের বিবেক! মিঃ হাইডরা, ঘুমের ঘোরেও তো ডাঃ জেকিল হতে পারেন। তখন কি করে অস্বীকার করবেন এর সত্যতা?

অচিরেই আমার মস্তিষ্ক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত কাজ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। হয়ত তখন পড়ে থাকব কোন পাগলা গারদে। তখন কি কেউ ভাববে না 'কে এই জড়পদার্থ?' না ভাবলেও কিছুই এসে যায় না। কেউ ভাবুক সেটা চাইও না। আমার সমস্ত স্মৃতি আমার সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যাক্। বাবাই—তিন্নি যুগের প্রতিযোগিতায় যদি বেঁচে যায়—এটা ওদের, একান্ত ভাবেই ওদের! ওরা তো প্রাতঃস্মরণীয়দের চিনুক! জানুক! চকচকে জিনিস দিয়ে পৃথিবীতে কোনও কাজের বস্তু তৈরি হয় না। এটা ওরা জানুক।

৩০টা বছর পলিটিক্স করেছি। জানি না পলিট্রিক্স্! এরই জন্য সাদাকে সাদা, কালোকে কালোই বললাম। পাতি-রাজনীতিজ্ঞসুলভ ভণ্ড বিনয়ে আমার বিশ্বাস নেই। কেউ কেউ বলতে পারেন 'উদ্ধত' কেউবা 'ইমপার্টিনেণ্ট'ও বলতে পারেন। তবে সত্যটা তো আপেক্ষিকভাবে হলেও সত্য। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভয় পেলে বস্তুবাদী হওয়া যায় না। বস্তুবাদী মানেই নির্ভীক, রোমাণ্টিক। তার 'প্রজেকশন' সবসময় অসীমে। অসীম তো দুটোই। এত বিশাল—যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আবার এতই ক্ষুদ্র যে সেটাও ধারণা করা যায় না। আমার এক্স (X) 'অলওয়েজ টেণ্ডস্

টু ইনফিনিটি' কিন্তু কখনই 'এক্স ইজ ইকোয়াল টু ইনফিনিটি' নয়। তাই এ লেখার শেষ নেই। তবে একটা ধ্রুবক 'K' (কনস্ট্যাণ্ট) না থাকলে কি হিসাব মেলে! একটা 'K' তো আছেই। সেটাই কনস্ট্যাণ্ট। অনিশ্চয়তার জীবনে এই 'K' তো নিশ্চিত। এটাই বাঁচার মন্ত্র!

সরে আসার ইতিহাস

সবে পার্টি কংগ্রেস শেষ হয়েছে। তার উত্তেজনার রেশ তখনও কাটেনি। জ্যোতিবাবু, ই এম এস বাদে সব প্রথমসারির নেতারাই জেলে। 'তেনালী'-তে যে 'ছেনালী' হল তার বিরুদ্ধে ধিক্কারে সোচ্চার বাংলার সব সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বাসবপুন্নাইয়া যে দলিল হাজির করলেন—সেটা করার জন্য পার্টি ভাগ করার দরকার ছিল না। আমরা ত্রিমূর্তি—শৈবাল মিত্র, রণেন ঘোষ এবং আমি পাগলের মত ঘুরছি। এ কী করলাম! নির্মল তো কবিতাই লিখে ফেলল—'কত কষ্টে একটা বউ জোটালাম, ছেলে হলো/মা বললো—খোকা/তোর ছেলের মুখ নারানের মত র‍্যা-/ আমি কিন্তু তার মধ্যে দেখতে পেলাম খ্রুশচভের মুখ!' অবশ্য আমাদের হিম্মত জুগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন কয়েকজন প্রাজ্ঞ নেতা যাঁরা আজও করে কম্মে খাচ্ছেন। তাঁদের নাম তাই করলাম না। একজন শ্রদ্ধেয়, মৃত্যুপথযাত্রী। দুজন মৃত। নেপাল মারফত চীনা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি তখন ঘটে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার—এ ব্যাপারে যাঁরা মদত জুগিয়েছিলেন—তাঁরাই নাকি আবার গোয়েন্দাগিরি করার জন্য লোকও নিয়োগ করেছিলেন। একজন তো বুক ঠুকে বলেই ফেলেছে—আমরা গোয়েন্দা ছিলাম! (আজকালে প্রকাশিত চিঠি! সত্য মিথ্যা জানি না)।

আমি তো একজনকে সাক্ষী মানতেই পারি তিনি সুধাংশু পালিত এবং এখনও জীবিত। অন্যজন মৃত—কেষ্টদা। জ্যোতিবাবুরা তখন সি ইউ সি করে পাল্টা দলিল দিয়েছেন। মূলত সিটি কলেজের ছাত্র ইউনিট জ্যোতিবাবুকে নিয়ে একটা সভা ডেকেছিল, লক্ষ্মীর মারফত সেই সভাতে যাবার ডাক পাই। সুধাংশু পালিত এবং কেষ্ট ঘোষ—অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মী দে-কে বললাম—'যেতে পারি, তবে আমি প্রশ্ন করব এবং সভার রিপোর্টিং, আমি যাঁদের পার্টি বলে মনে করি—তাঁদের জানাব।' সুধাংশু পালিতকে বললাম—'স্পাইং ঘৃণ্য কাজ! ওসব আমি পারব না! আমার কমিটমেণ্ট আছে—সেটাই করব, সেটা ওদের জানিয়েই করব!' ওঁরা একটু অসন্তুষ্ট হলেন। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়াতে আমার একটা

সুবিধা ছিল, এখনও আছে। পড়া বইয়ের পাতা বা লাইন ধরে—এখনও উদ্ধৃতি দিয়ে যেতে পারি। অভ্যাসটা কি কাজেই না লাগছে! এখন তো হাতের নাগালে কোন বই-ই নেই। সেই অভ্যাসটার জন্য—এখনও সমানে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখতে পারছি। তা সে মারলোর—ডাঃ ফাউস্টাসই হোক আর মাও সে তুং-এর 'সঠিক চিন্তা কোথা থেকে আসেই' হোক। এটা অর্জিত। বাচ্চা ছেলে দেখেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—লক্ষীদা আমার শর্তে রাজি হলেন। উত্তর কলকাতার চণ্ডী মুখার্জির বাড়িতে সভা। বয়ঃসন্ধির ঔদ্ধত্য নিয়ে প্রাজ্ঞকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গেলাম। দেখি কে জেতে?

২

জ্যোতিবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কায়দায়—'ওঁরা বললেন' এবং 'আমি বললাম' মার্কা কথা দিয়ে শুরু করলেন। মূলত চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা নিয়ে কলম্বো প্রস্তাবের ওপর উনি ওঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখলেও 'শান্তিপূর্ণ উত্তরণ' ইত্যাদি মৌলিক সমস্যাগুলোও এসে গেল। "কলম্বো প্রস্তাবকে চীন যখন প্রাথমিক ভাবে সমর্থন জানাল, জেলের ভেতরের ওই ওঁরা (অর্থাৎ প্রমোদবাবু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ দত্তরা) স্লোগান তুললেন 'নেহরু সরকার কলম্বো প্রস্তাব মেনে নাও!' অদ্ভুত ব্যাপার! কোন অজ্ঞাত কারণে চীন সেটা নাকচ করল অমনি ওঁরা বললেন—কলম্বো প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াশীল! বুঝুন একবার!" (জ্যোতি বসু) সমস্ত সময়টা উনি এরকমই চালিয়ে গেলেন।

আমার ভেতরের খেপা ঘোড়াটা দাপাদাপি শুরু করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছি। বাকি প্রশ্নে উনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন, কোন প্রশ্নে শতকরা ৬০ ভাগ চীন ঠিক, কোন কোন প্রশ্নে শতকরা আশি ভাগ রাশিয়া সঠিক! ওঁর বক্তৃতার নোট নিতে নিতেই (দীর্ঘকাল পার্টি মিটিং-এ মিনিটস লেখার কাজটা আমার ওপরই বর্তাতো! তাতে সুবিধা হয়েছে—সেগুলো সভাপতির সই সহ এখনও কিছু কিছু আমার হেফাজতে রয়ে গেছে!) আমরা তিনজন গুজ-গুজ করে ৩৬টা প্রশ্ন তৈরি করে ফেললাম। অবশ্যই আমরা একদেশদর্শিতায় ভুগেছি। আমরা পক্ষ অবলম্বন করেই গিয়েছিলাম। সুতরাং ওঁর প্রত্যেকটা কথাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। প্রশ্নোত্তর পর্বে খুবই ঔদ্ধত্য নিয়ে আমি প্রত্যাক্রমণ শুরু করলাম (আজ লজ্জা হয়!) "এটা ময়দান নয়। আর লড়াইটাও 'ওঁরা' বনাম 'আমি' নই। এটা মতাদর্শগত সংগ্রাম। একটা সঠিক লাইন বিতর্কের মাধ্যমে বার করে আনার সভা...।" প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জ্যোতিবাবুর মত দক্ষ

পার্লামেণ্টারিয়ান বিধ্বস্ত না হলেও বিচলিত তো হয়েই ছিলেন! তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল—জ্যোতিবাবু বলেই সেদিন আমার সেই ঔদ্ধত্য সহ্য করেছিলেন। আমি যাঁদের পার্টি বলে মনে করতাম—তাঁরা হলে যে সোজাসুজি বার করে দিতেন এ ব্যাপারে আমি সেদিন নিঃসন্দেহ ছিলাম না, কিন্তু পরবর্তীকালে নিঃসন্দেহ হয়েছি। পরে "আনন্দম" (মেয়র কমল বসুর বাড়ি) ভবনে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সভাতে প্রশ্ন করতে গিয়ে কপালে·গলাধাক্কা জুটেছিল। হয়তো এটা আমার স্বভাবের দোষ! আমার ভেতর একটা পাগলা দাশু আছে। মাঝেমাঝেই সে নড়েচড়ে বসে। না·হলে পরীক্ষার হলে বসে কারুর মধ্যে এ প্রশ্ন জাগে—'এই যে লোকটা প্রশ্ন করছে? এর কী অধিকার আছে আমাকে প্রশ্ন করার? লোকটা তো লম্পট কী মদ্যপ হতেও পারে?' ব্যস্ আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। কেরিয়ারের দফারফা। যাক্, যা বলছিলাম। আমাদের বিতর্কে অন্যরা চঞ্চল হয়ে ওঠায় (বিশেষ করে উদ্যোক্তারা হঠাৎ নেতার সম্মান রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন!) মাঝ পথেই বসে পড়লাম। পরে লক্ষ্মী দে-র এক ক্যাডার খুব সম্ভব রজত একদিন বলেছিল—জ্যোতিবাবু কিন্তু মোটেই বিরক্ত হন নি। তুমি বেরিয়ে আসার পর চা খেতে খেতে চণ্ডীদাকে বললেন—'ছেলেটার দিকে নজর রাখবেন। একটা অ্যাসেট।' সত্যি মিথ্যা যাচাই করার সুযোগ বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। একজন লিবারেল-ডেমোক্র্যাট (তখনও পর্যন্ত তিনি তাই ছিলেন) এ ধরনের কথা বলতেই পারেন।

সভা থেকে বেরিয়ে ডি সি অফিসে নেতাদের সব বললাম। ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙারকে দিয়ে কর্মিসভা করবেন। সেটা হল 'আনন্দমে'। এইরকমভাবে যখন জ্যোতিবাবু এবং হরেকৃষ্ণ কোঙার চাপান-উতোর চলছিল—সেই সময় হঠাৎ ঘোষণা। জাতীয় পরিষদ থেকে ৩৬ জন বেরিয়ে এসে পৃথক পার্টি গড়ার ঘোষণা করেছেন। আমরা হতভম্ব! আমরা চেয়েছিলাম মতাদর্শগত সংগ্রামটা দৃঢ়ভাবে চালিয়ে রাশিয়াপন্থীদের একেবারে নির্মূল করে দিতে। তা না করে কোথাকার ডাঙ্গে তার লেখা কবেকার একটা চিঠি, তাও আবার বেরিয়েছে কোথায়? না সিয়া'র নিজস্ব কাগজ 'কারেণ্ট' পত্রিকায়—সেটাকে কেন্দ্র করে পার্টি ভাগ! এক মিনিটেই বুঝে নিলাম—এই সেই 'আমি' এবং 'ওঁরা'-র ফল। রাজনীতি পেছনে চলে গেল। আবার একবার পার্টি মধ্যপন্থীরা দখল করবে! ৩৬ জনের মধ্যে কে কে আছেন?,জ্যোতি বসু, নাম্বুদিরিপাদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সমর মুখার্জি, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ! আমার 'মেণ্টর' আশিষদার (আশিষ দে) ভাষায়: 'এ কি হলো! এই দ্যাখো মীরজকরের ভাষণ।'

মীরজফরের ভাষণটা পড়লাম। তার সারমর্ম—'ডাঙ্গে কতখানি অসৎ! মীরজফরের ছেলেকে মস্কোতে না পাঠিয়ে নিজের মেয়েকে পাঠিয়েছে! মেয়ের নামে পি পি এইচ-এর শেয়ার কিনেছে' ইত্যাদি ট্র্যাশ! 'এটা আবার একটা বিশাল গাড্ডা তৈরি হল।' আশিষদার বক্তব্যে আমার মনেরই কথারই প্রতিধ্বনি। তবুও আমরা ব্রেক-আওয়ে গ্রুপটার সঙ্গেই থাকলাম—কারণ আমরা মনে করতাম যদি কিছু করা যায় এদের মধ্যে দিয়েই করা যাবে। পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে তেনালীতে কনভেশনে বসলেন নেতারা। প্রথম চমক সভামঞ্চ থেকে স্তালিন এবং মাও-এর ছবির অন্তর্ধান। যা দলিল বেরুলো! আমরা বলাবলি করতে শুরু করলাম 'তেনালীর ছেনালী'। তেনালীর পর জ্যোতিবাবুর গ্রুপের দুজন নেতা, ভোলাদা (বীরেন রায়) এবং নরহরি কবিরাজ একদিন জ্যোতিবাবুকে চেপে ধরেছিলেন—'আপনি যে বলেছিলেন হরেকৃষ্ণবাবু, প্রমোদবাবুর লাইনে যাবেন না, এটা কী হলো?' জ্যোতিবাবুর সপ্রতিভ উত্তর: 'আমি গেলুম কোথায়? ওঁরাই তো এলেন! আপনারাও চলে আসুন!' ঠিক তাই! বাসবপুন্নাইয়ার খসড়া কর্মসূচিতেও আমাদের আশা মিটল না। হতাশ হলাম। আদর্শগত প্রশ্নে নিরুত্তর। রাষ্ট্র-চরিত্র নির্ধারণে মধ্যপন্থী। চীন আক্রমণের পরও কংগ্রেস এবং নেহরু-ইন্দিরা সম্পর্কে একই ধরনের মোহ সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। যা কিনা অজয় ঘোষের কথারই পুনরাবৃত্তি। বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যে যে রকম ভাবে পারল—বিদ্রোহ সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়ল। সৃষ্টি হল অসংখ্য গ্রুপ। এদের বলা হত 'আলট্রা'। আমরা ওঁদের বলতাম 'অফিসিয়াল' বা সরকারি। এরকম অবস্থায় কলকাতায় ৭ম কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলল। কেন্দ্রের সরকার দ্বিধায় পড়ে গেল। জারি হল অঘোষিত জরুরী অবস্থা। শীর্ষস্থানীয় সব নেতাই প্রথম রাউণ্ডেই ধরা পড়ে গেলেন। বাদ শুধু জ্যোতি বসু। নানান টাল-মাটালের মধ্যে ৭ম কংগ্রেস শেষ হতেই দ্বিতীয় রাউণ্ড গ্রেপ্তার শুরু হল। এবার টার্গেট—বাসবপুন্নাইয়ার দলিলের বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন তাঁরাই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় শাখা সম্মেলন, জেলা সম্মেলনে বিরোধীদের নামও পুলিস পেয়ে গেল!

৬৫-র জানুয়ারি মাসে ভবঘুরে-সাংবাদিক মিহিরদা (ঘোষ দস্তিদার) এক সন্ধ্যায় আমার হোস্টেলে হাজির। উনি পাঁচজনের নামের লিস্ট দিয়ে বললেন—'আজ অথবা কালই তোমরা গ্রেপ্তার হচ্ছো!' লিস্টে দেখলাম শৈবালদা ছাড়া আমি, হৈমী বসু (এখন কংগ্রেস এম এল এ, প্রাক্তন কাউন্সিলর) ও আছেন। লিস্ট পেয়েই করিম এবং সমীরকে হোস্টেল ছাড়তে বললাম। কারণ করিম তখন রাশিয়ায় একটা চাকরি বা বৃত্তি পেয়ে চলে যাচ্ছে। এখানে ওকে দেখলে—ওর

পাসপোর্ট সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমীর (রক্ষিত) ইদানীং মাঝে মাঝে আসত। আর্কিটেক্ট পাস করার পর ও খুব গভীরভাবে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন। দু-একটা লেখা এদিক-ওদিক বেরিয়েওছে। তবুও ওকে সাবধান করে দিলাম। ঘর পরিষ্কার করে যখন ভাবছি শৈবালদাকে ফোন করব—শৈবালদা এসে হাজির। সঙ্গে খুব সম্ভব অধ্যাপক সুভাষ বসু। মুখ দেখেই বুঝলাম ভূষণ্ডীর কাক মিহিরদা আমার আগেই ওঁকে জানিয়েছেন।

৩

তিনজনের মধ্যে শেয়ালের যুক্তি হল। শৈবালদার সেই impulsive যুক্তি! "আমাদের বাড়িতে পুলিস ঢোকার আগে ফোন করে ঢুকতে হবে। বাবা না ঠাকুর্দা কে যেন জে পি! তুমি আমার ওখানেই চল!" মানতে পারলাম না। তাছাড়া ওঁর শরীরের অবস্থা যা তাতে ওঁকে আত্মগোপনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বলার অর্থ হয় হাতি পোষার খরচ নাহয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। ওঁকে বললাম—"বাড়িই চলে যাও।" "আমি দেখি কোথাও কিছু করতে পারি কি না!" বুঝলাম সমস্ত কাজ একার ঘাড়ে চাপছে। "মেজদিকে (পরবর্তীকালে ওঁর স্ত্রী সুদেষ্ণাদি) খবর দিয়েছ?" উনি বললেন, "না"। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব কাজ সারতে হবে। অসিত (সিন্হা) কে খবর দিতে হবে। নির্মলকে না হয় যোগাযোগ করা যাবে। ও কাছেই থাকে। তাছাড়া আর এক মহিলাকে একটু সাবধান করতে হবে। তার বাবা পার্টির নেতা, হিন্দি কাগজের সম্পাদক। ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছে। ওর সঙ্গে সম্পর্কটা ইতিমধ্যেই পার্টিতে বেশ চাউর হয়ে গেছে। ফলে পুলিসও জানে। ওর কাছে কিছু ডকুমেণ্ট এবং ছ্যাবলামার্কা আবেগদীপ্ত চিঠিও আছে—আমি যদি ধরা পড়ি সেগুলোও যাতে পুলিস না পায়। একটার-পর একটা সিগারেট খাচ্ছি। একটু উত্তেজিত; বিমূঢ়। শৈবালদার সঙ্গে বিচ্ছেদ ভাবতেই পারছি না। কত সুখের-দুঃখের সাথী! পুলিস মহলে একটা প্রবাদ ছিল 'আজিজুলকে খুঁজতে গেলে শৈবালকে খোঁজ—তার আড়াই হাতের মধ্যেই ওকে পাবে।' সুচিত্রাদির মুখটা মাঝখানে ঝিলিক মারল। নিশ্চয় ওঁর সাহায্য পাব। এমন নিঃস্বার্থ, নিরুচ্চার প্রেম! আমরা সকলেই জানতাম। খারাপ লাগত ওকে দেখে। কিন্তু মহিলার এই তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়াটা এক অস্বস্তিতে ফেলত! কেন যে এমন হয়! সব জেনেশুনে সুচিত্রাদি এরকম অসম্ভব একটা বাজি ধরে বসে আছেন কেন? এই দুর্দিনে সুচিত্রাদি নিশ্চয় সাহায্য করবেন! পার্টি আমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে না। কারণ

ইতিমধ্যেই আমরা 'আলট্রা', তাছাড়া ছাত্র ফ্রণ্টে বিমান বসু-বুদ্ধদেব-অনিল দে-র মত মডারেটরা যাতে ওয়াক-ওভার পায় তার ব্যবস্থাও তো ওদের করতে হবে।

৪

বেশ কয়েক দফা চা খেয়ে শৈবালদাকে বাড়ি পাঠানো হল, কতগুলো পুস্তিকা রক্ষা করতে হবে। কতগুলো ধ্বংস। "তিব্বত এবং নেহরু দর্শন" ৫১ সালে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দেওয়া নেহরুর শ্বেতপত্রের অনুবাদ (আমার লেখা), "নেহরু দর্শন প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা কথা" বিশেষ করে এই তিনটে বই রক্ষা করতেই হবে। কারণ কিছু কিছু কমিউনিস্ট তখন নেহরুকে "কমরেড" বানানোর চেষ্টা করছে। 'ব্লিৎস'-এর আশীর্বাদ ধন্য এই নেতারা খুনে নেহরুর চরিত্রটা আড়াল করতে চায়। একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক—সারা এশিয়ার সম্রাট হতে চান, এটা তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন—এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই লেখা তিনটে। ওদিকে শিক্ষক ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে। ডাক্তার এবং ট্রাম শ্রমিকদের দিয়ে একটা ধর্মঘটের আয়োজন করা হচ্ছে। তাতেও আমাদের ভূমিকাই হবে প্রধান। আন্দোলন যাতে অভ্যুত্থানের রূপ নেয়—তার প্রস্তুতি। উত্তর বাংলা থেকে খবর আসছে ওরা ভিয়েতনামের সমর্থনে একটা জাঠা নিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে প্রচার করতে করতে কলকাতার দিকে আসবেন। তাঁদেরও রিসিভ করতে হবে। অসিত তার কলেজ ইউনিয়ন এবং সিটি এস-এফ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। নির্মল তো নানান কাজের লোক। থিয়েটার, কবিতা, খেলা, কাগজ সব মিলিয়ে সে 'বিজি-ফর-নাথিং' মার্কা লোক। তবে ছেলে যোগাড় করতে পারে। 'ছাত্র-ছাত্রী' পত্রিকাটা ষড়যন্ত্র করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শ্যামল বসু এর মালিক ছিল। কিন্তু কার্যত এটা চালাতাম আমি, শৈবালদা এবং সুভাষদা। 'দীপক-প্রিণ্টার্স' থেকে প্রকাশ করা হত। খুব সম্ভব এই শ্যামলই বর্তমানে 'রিফ্লেক্ট' প্রকাশনার মালিক। সেই যুগে যখন যুবকরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেই ভালবাসতেন, ভালবাসতেন আত্মত্যাগে, সেই যুগেতেই এ ছেলেটা ব্যবসা এবং টাকাটা ভাল চিনেছিল। ও হঠাৎ 'শৌলমারীর সাধুই সুভাষ বোস!' এই তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠল। 'ছাত্র ছাত্রী'টার প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে চাইল। শ্যামল ছিল শৈবালদার বিশেষ বন্ধু। সুভাষদা তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা পেয়েছেন। আমার থেকেও রগচটা লোক! ওঁর প্রথম মাসের মাইনে থেকে নির্মলের নামে, নির্মলকে সম্পাদক করে কাগজটা আমরা কিনে নিলাম। কাগজের মূল লেখক শৈবালদা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল—শ্যামল আমাদের একটা উপকার

করেছিল। 'বঙ্গ সন্তানদে'র মস্তিষ্কে নেতাজী 'ফিক্সেশন'কে কাজে লাগিয়ে ও টাকা কামাতে চেয়েছিল। ওর প্রচারের ধরন ছিল "মাঞ্চুরিয়া থেকে 'নেতাজী'র বাহিনীই ভারতে আসছে।" সেই উগ্র-চীন বিরোধিতার যুগে—যখন চীনা-বাদাম উচ্চারণ করাটাও পাপ। এবং তার জন্য মার খেতেও হত, জেলেও যেতে হত। সেই সময় ওর এই প্রচার নেতিবাচক ভাবে কাজে লাগল। যাই হোক, চারের দশকে 'ছাত্র অভিযান' বন্ধ হয়ে যাবার পর এটাই প্রথম ছাত্র-যুবদের পত্রিকা। ওতে পর পর কয়েকটা বিস্ফোরক নিবন্ধ এবং প্রতিবেদন বেরুল। সুভাষ বোসের 'ভারতবর্ষ—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মৃগয়া'। শৈবালদায়—'উগ্র জাতীয়তা-বাদের জনক ডি এল রায়;—ফ্যাসীবাদের কবি!' আমার ধারাবাহিক লেখা—'বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্র।' আমার এবং আশিষদার নেওয়া অধ্যাপক মণীন্দ্র চক্রবর্তীর (পরে যাদবপুরের উপাচার্য) সাক্ষাৎকার। অধ্যাপক চক্রবর্তী তখন সবেমাত্র ইউনেস্কোর একটা প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে দক্ষিণ এশিয়া ঘুরে এসেছেন। উনি চীনের 'কমিউন' ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন! সরাসরি বললেন—"ভারতের বাঁচার পথ—ঐ পথ। অর্থাৎ চীনের পথ!"

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। একদিন ডি সি অফিস থেকে তলব। কেষ্ট ঘোষ ডেকে পাঠিয়েছেন। ডি সি অফিসে গিয়ে দেখলাম সেক্রেটারিয়েট রুমের টেবিলের ওপাশে কেষ্টদা এবং সুধাংশু পালিত। এ পাশে একটা চেয়ারে রোগা, বেঁটে একটা ছেলে বসে আছে। পরে জানলাম উনি অনিল বিশ্বাস। রানাঘাট না কোথায় বাড়ি। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছেন। 'ছাত্র-ছাত্রী' থেকে চারটে লেখার ক্লিপিং সুধাংশুদার হাতে। উনি সেগুলো আমাকে দিলেন। লাল কালিতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় আণ্ডারলাইন। ক্লিপিংগুলোতে চোখ বুলিয়ে ওঁকে ফেরত দিলাম। কেষ্টদা বললেন—"এগুলো মানো?" অর্থাৎ—"নেহরু যে আমেরিকার টাকার লোভে চীন আক্রমণ করেছে"—"দলাই লামাকে দিয়েই যে তিব্বতে ভারতীয় সৈন্যরা প্রথম গেরিলা আক্রমণ সংগঠিত করে গণ্ডগোল পাকাতে চেষ্টা করেছিল", "দলাই লামা, কয়েকশ কোটি টাকার সোনা চীন থেকে ভারতে নিয়ে পালিয়ে এসেছে"—এগুলো মানি কিনা? বললাম—"একশ দশ ভাগ মানি! দরকার হলে প্রমাণ দেব। কাগজ তার সোর্স জানাতে বাধ্য নয়।" উনি বোধহয় হোঁচট খেলেন। এবার সুধাংশুদা আক্রমণ করলেন—"বিজ্ঞানে বলের (ফোর্স) এত ছড়াছড়ি করেছেন কেন?"

বললাম—"আমি করি নি! প্রকৃতি করেছে। নিউটনের চিন্তার সীমাবদ্ধতাটাই আমি দেখিয়েছি। ধরতে হয় বৈজ্ঞানিকদের ধরুন!" কেষ্টদা বললেন—"ডি এল

রায়ের শতবর্ষে ওঁকে আক্রমণ করা হঠকারিতা! এর জন্য পার্টির ক্ষতি হবে!" বললাম—"আপনারা পাল্টা লেখা দিন, ছাপিয়ে দেব।" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ওঁরা যেটা বললেন তার সারমর্ম—কাগজের মালিকানা এবং সম্পাদনার দায়িত্ব আমাদের স্বেচ্ছায় ছাড়তে হবে! ফিরে এসে শৈবালদা এবং সুভাষদাকে সব জানালাম। সিদ্ধান্ত হল 'কখনই না।' এ ব্যাপারে সেদিন আমাদের সঙ্গে এমন অনেকেই ছিলেন আজ নাম বললেই তাঁরা চিৎকার করবেন। যেমন একজন সেদিন লিখলেন (তিনি মন্ত্রী)—"সবই তো বুঝছি। এতদিন পর একটু স্বস্তিতে আছি, তোমার সহ্য হচ্ছে না। আমরাও তো ৪৮-৫১-তে অনেক মার খেয়েছি। এখন একটু ভাল আছি—সেটাতে কাঠি করতে চাইছ কেন?" থাকুন ওঁরা স্বস্তিতে, সুখে থাকুন! তবে সেদিন ওঁরা দারুণ কথা বলেছিলেন—"আমরাও তোমাদের সঙ্গে একমত! কিন্তু জ্যোতিবাবুদের মত সেন্ট্রিস্টরাও তো আছেন! ওঁদের কোণঠাসা করার জন্য তোমাদের মত ছেলেদের পার্টি নেতৃত্বে আসা দরকার! তাই গোঁয়ার্তুমি না করে একটু অ্যাডজাস্ট কর! কাগজটা অনিলের নামে ট্রান্সফার করে দাও!" পাঠকরা বিশ্বাস করুন! আমি সমরেশ বসু নই! এতটুকু কুৎসা করার বাসনা আমার নেই। বরং আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব—কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাল দিকটাই তুলে ধরার! ওঁদের একথার তো মানে একটাই—'ঝামেলাবাজ অফিসারকে প্রোমোশন দিয়ে ট্রান্সফার করে দাও!' শৈবালদা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়া মানে কাগজটার পুরো দায়িত্ব ঘাড়ে চাপা। মায় লেখা পর্যন্ত:

"এত কাজ আছে একা কি পারিব করিতে
কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষা হরিতে!"

রাত পোহালেই শৈবালদা থাকবেন না। উনি যে খুব একটা শারীরিক পরিশ্রম করতে পারতেন তা নয়। শারীরিক শ্রম মারফত সাহায্যের আশা ওঁর কাছে আমরা করতাম না। শৈবালদা-কফি হাউসে আড্ডা দিচ্ছেন এটা জানলেও একটা ভরসা। অসাধারণ কূটবুদ্ধি! যেটা আমার একদম নেই। আমি 'হ্যাঁ'কে 'হ্যাঁ', 'না'কে 'না' বলতেই জানি। ওঁর এই কূটবুদ্ধি অনেক দুর্যোগের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। মনে পড়ছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনের কথা। কলেজ কর্তৃপক্ষ এস এফ-কে বেআইনী করে দিয়েছে। মেডিকেল কলেজের এস এফ ইউনিট গলা ফাটিয়ে দাবি করছে—'আমাদের এফিলিয়েশন' কেটে দিন। আমরা অটোনমাস। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি এ দাবির মূল তাত্ত্বিক নেতা শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তীর ভাতিজা—বর্তমানের দোর্দণ্ড সার্জন-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (পি জি-র) 'শকুন'। নির্বাচনে আমাদের দাঁড়াতেই হবে। সুবিনয়দা, দীনেশদা কোন সিদ্ধান্ত

নিতে পারলেন না। বিমানদা আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কিত! 'ছেলেগুলোর নিরাপত্তার প্রশ্নটা দেখতে হবে তো!' আমাদের প্রার্থী মোটামুটি স্থির। মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জের অঞ্জন বলে একটি ছেলে সম্পাদক পদে প্রার্থী। সেও একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তবে দৃঢ়তা হারায়নি। ইউ সি আর সি অফিসটাই তখন আমাদের দখলে। প্রলয় দাসগুপ্ত আর সুধীরদা অফিস সেক্রেটারি। অফিস থেকে বেরিয়ে শৈবালদার সঙ্গে কথা বললাম। উনি বললেন—নাম পাল্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কেমন হয়? ব্যস! লাইন পেয়ে গেলাম। রাতারাতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ 'ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' তৈরি হয়ে গেল। অনুপ প্রচণ্ড উৎসাহ দেখাল। আশিষদা এবং মলয় চ্যাটার্জিও পেছন থেকে মদত দিলেন। মূলত আশিষদার তদ্বিরে সুধাংশুদার ৪৪ নং ওয়ার্ডের কমরেডরা নিরাপত্তার দায়িত্বটা কাঁধে নিলেন। তিনকড়িদা, সত্যদা, 'ভানু গুণ্ডা'-র দলবলকে ঠেকাবার দায়িত্ব নিলেন। আমাকে পেটো বাঁধতে শেখাচ্ছেন তখন আর সি পি আইয়ের শ্যামলাল ছেত্রী। শ্যামলালদাও ভরসা দিলেন। সদস্যবিল ছাপা হল। এস এফ এ-র মটোতে ছিল "স্বাধীনতা-শান্তি-প্রগতি" (পরবর্তীকালে 'প্রগতি'র জায়গায় 'সমাজতন্ত্র' লেখা হতে থাকে)। পার্টির মধ্যকার মতবিরোধ তখন আমাকে এমন গ্রাস করেছে যে আমি ডি এস ইউ এ-র 'মটো'-তে "ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য"টা ছাপালাম। এক সপ্তাহের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কয়েক হাজার ছেলে ডি এস ইউ সদস্য হয়ে গেল। এস এফ এ-র ছেলেরাই ডি এস ইউ ব্যানারে বিপুল ভোটে জিতে বেরিয়ে এল। ৬২-৬৩-তে বিনয়দার (চৌধুরী) জেতাটা যদি নেহরুর নির্যাতনমূলক আটক আইনের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভের নিদর্শন বলে চিহ্নিত হয় তাহলে বলতে হবে—সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ডি এস ইউ-এর জেতাটা চীনের পক্ষে যুবকদের সমর্থন এবং সোচ্চার ঘোষণা। কারণ লড়াইটা হল একদিকে চিত্ত-ভানু-গোপালদের মত পেশাদার মস্তান বনাম আদর্শের জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত এমন আনাড়ি যুবকদের লড়াই! বলে রাখা ভাল—এই প্রথম রাস্তার খণ্ড যুদ্ধে বায়রনের সোডা বোতল, ইট, সাইকেলের চেইনের পরিবর্তে 'পেটো'র আবির্ভাব ঘটল। মরার আগে অসত্য ভাষণে দুষ্ট নাই-বা-হলাম। অবশ্যই জেতার পর দীনেশ মজুমদারই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর সেই কথা—"এ জয় অতি-সাবধানী ভীরুদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের জয়। এ জয় তোমার। একান্ত ভাবেই এর কৃতিত্ব তোমার প্রাপ্য।" লজ্জায় সেদিন মাটিতে মিশে গিয়েছিলাম, মাথা ফাটল অনুপ-অচিন্ত্যের আর জয় হল আমার! আসল মন্ত্রণাদাতার নাম গোপনই থাকল—শৈবাল মিত্র।

সত্যিই ছেলেটা পারেও বটে। এই তো ইউনিভারসিটি ইলেকশনে কি চালটাই না চালল!

সেণ্ট্রাল বডিতে তিনজনকে জিতিয়ে সেক্রেটারি, প্রেসিডেণ্ট, ট্রেজারার পোস্ট দখল করে নিল—সেরেফ সিঙ্গল কাস্টিং করে। আর প্রতিপক্ষ সব কারা? এক-দিকে সি পি আইয়ের কমল গাঙ্গুলি, বাম-কমিউনিস্ট (সরকারি)দের বিমান বোস-বুদ্ধদেব (তখন পার্টি থেকে শৈবাল মিত্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে বুদ্ধদেবকেই পার্টি প্রোজেক্ট করছে) অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রিয় (রায়গঞ্জ কলেজ থেকে তছরুপের দায়ে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতায় এসে প্রতাপচন্দ্রের আশ্রয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে) সুব্রত-শ্যামল ভট্টচার্য (বর্তমানে অশোক সেনের সঙ্গে)। শৈবালদার এই কূট-বুদ্ধির জন্য পরবর্তী কালে আমরা হাসি ঠাট্টা করতাম, 'তুমি ইলেকশন-রাজনীতিতে না যাওয়াতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অশেষ ক্ষতি সাধন হয়েছে। জনগণও অশেষ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে!' হয়ত আমরা একটু বেশি করেই ভাবতাম। ভাবতাম বলেই মনে করতাম বাংলা দেশে জ্যোতিবাবুর পরবর্তী প্রজন্মে বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের সঠিক রক্ষাকর্তা হতে পারত শৈবাল মিত্র। ওর সে গুণাবলী ছিল।

এই প্রসঙ্গে পরের দু-একটা কথা আগে বলে নিতে চাই, কারণ পরে আর বলা হবে না। ছয়ের দশকের ছাত্র-আন্দোলন নিয়ে অনেক বিদগ্ধজন অনেক লেখা লিখছেন। প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবে তাঁরা শৈবাল মিত্রকে কটাক্ষ করেছেন। এঁরা কেউই সেই সময়কার কমিউনিস্ট নন—যখন লাল ব্লাউজ পরে মেয়েরা রাস্তায় বেরুতে পারতো না। কমিউনিস্ট কথাটাই ছিল তখন "পাপ", তখন আমাদের একদিকে গোপাল-ভানু-চিত্তদের বিরুদ্ধে গায়ের জোরে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে অন্যদিকে অম্লান দত্ত, চপলাকান্ত, প্রতাপচন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়ে নিজেদের বুদ্ধিতে অনবরত শান দিতে হয়েছে। এক কথায় চরম প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করেই (নেতৃত্বের কোনরকম সহযোগিতা ছাড়াই। কারণ তখন থেকেই তাঁরা বিকল্প সরকারের স্লোগানে মশগুল!) আমাদের বিকাশ, বৃদ্ধি। এরই জন্য 'সাইকাট্রিস্ট'রা যাকে বলেন 'ফিক্সেশন'। আমাদের একটা ফিক্সেশন হয়ে গেছে। আমাদের কাছে একজন কমিউনিস্ট মানে তাঁর থাকতে হবে মার্ক্সের মত গভীর প্রজ্ঞা, লেনিনের স্থির-চিত্ততা, স্তালিনের দৃঢ়তা আর মাও-এর মানবিকতা! একজন আদর্শ মহিলা মানে জেনী মার্ক্স! এত মূল্য দিয়েও সে-বোধ কাটল কোথায়? আজও একটা 'বোধ' কাজ করে। ৬৪'র পর চিত্রটা পাল্টে যায়—কমিউনিস্ট না হওয়াটাই তখন পাপ, মার্কুইজ-দেবরে পড়া 'মার্ক্সবাদী'দের আবির্ভাবে বাজারে ছেয়ে যায়। আজ ছাত্রদের মধ্যে যে ইয়াপী কালচারের

আধিপত্য তার শুরু সেই ৬-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে! ঘুষ দিয়ে, নির্যাতন করে যখন শাসক বা হবু-শাসকরা দেখল ছাত্র-যুবদের ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না—তখন তারা কাল্‌চারালি আক্রমণ হানল। বামপন্থী বুলির আড়ালে চরম দক্ষিণ পন্থা! ক্ষুব্ধ প্রজন্মকে ক্ষুধার্ত (যৌন) প্রজন্মে পরিণত করার চেষ্টা করল। ইয়ুং, ফ্রোম মার্কুইজ তাদের হাতে তুলে দিল যুক্তি!

থাক্ সে সব কথা! সে সব লেখার লোক আলাদা। শৈবালদা কাল থেকে থাকবে না, ভাবতে ভাবতে কখন নিজের চোখের জল চশমা ঝাপসা করে দিয়েছে খেয়াল করিনি।

"আমি এক রণ ক্লান্ত সৈনিক
চারিদিকে মোর অসংখ্য চৈনিক
হে বন্ধু। একটা রাইফেল দাও
আমি লড়ব সেই বৃত্তের বিরুদ্ধে
যার মধ্যমণি কমিউনিস্ট!"

দেবদূতের মত স্বরচিত কবিতা চিৎকার করতে করতে নির্মলের আবির্ভাব। এটাই নির্মল ব্রহ্মচারী! বিরক্ত হলেও হেসে ফেললাম। হঠাৎ ও আমার চোখে জল দেখে ঘাবড়ে গেল! "এ কি! শ্লা! পাথরে রস!" দুজনেই হেসে ফেললাম! এ কথাটার একটা অন্য তাৎপর্য আছে। এক মহিলা কিছুদিন আমার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। পরে বিরক্ত হয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন "পাথর নিঙড়ালে রস বেরুলেও বেরুতে পারে—আজিজুলে নয়!" বন্ধু বৎসল নির্মল ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে উত্তর দিয়েছিল, "তুমি কি ওর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিঙড়ে তারপর নিঃসন্দেহ হয়েছ?" মহিলা শুধু ওকে জুতো মারতে বাকি রেখেছিলেন। নির্মলকে সব বললাম। ওর সমস্ত পরিকল্পনাই রেডিমেড! সিদ্ধান্ত হল আমি রাত্রে ইউনিভারসিটি লনেই শুয়ে কাটাব! ভোর বেলা থেকে ল' এর ছাত্রদের ধরে ধর্মঘট। ও অসিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদ্যাসাগর এবং গুরুদাস কলেজ স্ট্রাইক করিয়ে ইউনিভারসিটিতে আসবে। তারপর মিছিল। ছাঃ পঃ (ছাত্র পরিষদ) বিরোধিতা করলে ঠেঙিয়ে মির্জাপুর পার করে দিয়ে আসা হবে। তা ছাড়া ওরা বিরোধিতা করার সময়ও পাবে না। সমস্যা হল তখনও তো আমরা পার্টিতে! বিমানদাদের জিজ্ঞাসা না করে এটা করা উচিত কি না?

একেই পত্রিকাটা নিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে। এই সময় ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া ঠিক হবে কিনা! নির্মলের চটজলদি সমাধান। "অস্ত্র তুলে দিতে হবে না! ষড়যন্ত্রীদের অস্ত্রের অভাব হয় না! জেনে নাও, তুমি পার্টিতে থাকতে

পারছ না। ইতিমধ্যেই তোমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আর চীনের নয়, এবার পাকিস্তানের চর বলে প্রচার চলছে!" মাথাটা ঘুরে গেল। এও কী সম্ভব! এ রকমভাবে কি বিরুদ্ধমত ধ্বংস করা যায়? এ সব যারা করছে তারা কারা? ওকে বললাম—"আমারও আয়ু শেষ! তুই পত্রিকাটার প্রকাশনার দিকে নজর-দিস!"

"ওটাও থাকবে না!" নির্মলের উত্তর। সত্যিই থাকেনি। অনিলের সম্প্রতি একটা নিবন্ধে দেখলাম—"খাদ্য আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্রদের আইন অমান্য আন্দোলনে, নির্মল গ্রেপ্তার হয়ে যাবার পর 'ছাত্র-ছাত্রী'র মালিকানার জটিলতা দূর হল!" সত্যি কথাটা বলার জন্য অনিলকে ধন্যবাদ! অর্থাৎ ম্যানডেট্ দিয়ে নির্মলকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হলো! এবং পত্রিকাটা দখল করা হল।

আশঙ্কাই ঠিক। শৈবাল মিত্র গ্রেপ্তার হল। আমার 'ফলপট্টির ঠেক' এবং 'হস্টেল' রেইড হল। এর প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ সংখ্যা বেরুলো! নির্মলের জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় আর আমার প্রতিবেদন নিয়ে প্রকাশিত সে সংখ্যার বিক্রি বোধ হয় ছাত্র-পত্রিকা হিসাবে বিক্রির বাজারে রেকর্ড! এদিকে 'নন্দন'কে কেন্দ্র করেও জটিলতা দেখা দিয়েছে। নামে না থাকলেও 'নন্দনে'র প্রতিষ্ঠা থেকে পালিসি নির্ধারণে এই অভাজনের একটা ভূমিকা তো ছিলই। সেই পুরনো-প্রেমে এখনও মাঝে মাঝে 'নন্দন' পড়ে ফেলি। বাজারে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বোধ হয় এই একটা 'সাহিত্য' পত্রিকাই আমি পয়সা দিয়ে কিনি! শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটের একটা গলির একতলাতে নোনা-ধরা প্লাস্টার-খসা একটা ঘরই নন্দনের আঁতুড় ঘর। ইতিমধ্যে ঐ কাগজে বেনামে আমার কয়েকটা বিস্ফোরক লেখা বেরিয়েছে। নির্মলের কবিতাও ছাপা হয়েছে। রাম ভট্টচার্য, সত্য গুপ্তকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী। আসলে 'নন্দনে'র বাজার তো ছাত্ররা। সুতরাং ওঁরা আমাদের সহ্য করে নিতে বাধ্য হত। হঠাৎ 'নন্দনে'র ওপর ওঁদের নজর পড়ল। ওখানে না কি 'আলট্রা'দের ঘাঁটি গড়ে উঠছে। রসুল সাহেবের একটা উপন্যাস—'না-সাহিত্য', 'না-রাজনীতি' বলে ছাপানোর অযোগ্য ঘোষণা করার পরই পার্টির খাঁড়া নেমে এল। অফিস উঠে এলো। সূর্য সেন স্ট্রীটে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির মূল অফিসের (দোতলা) পাশের ঘরে। সত্যদা এবং রামকে হটিয়ে শ্যামসুন্দরকে আনা হল। রসুল সাহেব এবং পরবর্তীকালে শহিদুল্লা সাহেব সম্পাদক হলেন। ব্যাপারটা হল জমিদারবাবুকে ট্রেনে চাপতে দেওয়া হল না। তাই তিনি গোটা রেল কোম্পানিই কিনে নিলেন। ওখানে 'নন্দন' উঠিয়ে নিয়ে

যাবার আরও একটা কারণ—এন বি এ-র তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর পীযূষ দাশগুপ্ত যাতে কে কে ওখানে যান নজর রাখতে পারেন। তাই ওঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা যখন বুক ঠুকে বলেন—"হাওড়া স্টেশনে আমরা শৈবাল-আজিজুলের ওপর নজর রাখতে গিয়েছিলাম" তখন আশ্চর্য হইনি। ইতিহাস বড় রসিক পুরুষ! সেই পীযূষদাকেই গায়ে কাদা মেখে পার্টি ছাড়তে হল। আমাদের তো না-হয় রাজনৈতিক কারণে তাড়ানো হয়েছিল! পীযূষদার বিরুদ্ধে কুৎসাগুলি কিন্তু সেদিনও বিশ্বাস করিনি, আজও করি না। যেমন বাসব-বিপ্লবের প্রতি স্নেহ আজও অটুট।

ধন্দে পড়ে গেলাম! কার বুদ্ধিতে এসব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহা বিতর্কে চীনের সমর্থকদের এমন ষড়যন্ত্র করে চার্জ করা (তখনও বিতাড়ন শুরু হয়নি। বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া চলছে)। এটা যে জ্যোতিবাবুর বুদ্ধি নয় বুঝতে কষ্ট হল না। জ্যোতিবাবুব সঙ্গে রাজনীতিগতভাবে শতকরা দু'শো ভাগ অমিল। কিন্তু উনি ভদ্রলোক! ষড়যন্ত্রী নন। উনি সংবিধানপন্থী। এরই জন্য সংবিধানবিরোধী কাজ ওঁর দ্বারা হবে না। বাকি থাকেন আর দুই জনা! হরেকৃষ্ণ কোঙার আর প্রমোদ দাশগুপ্ত! তা হলে ওঁরা কি সত্যি সত্যিই জ্যোতিবাবুদের দলে ভিড়ে গেলেন? মাথার ওপর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। তিনমাস অতিক্রান্ত!

একটা আত্ম-সন্তুষ্টি ভাব দেখা গেল। একটু ডেসপারেট হয়ে গেলাম। সতর্কতা গেল শিথিল হ'য়ে। মাথার ভেতরে এত প্রশ্ন। সুসাহিত্যিক এবং অনুবাদক অশোক গুহ এবং সত্যদার সঙ্গে যোগাযোগ করে 'নন্দনে'র ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সময়টা এপ্রিলের প্রথম দিকে। পার্ক সার্কাস মোড় থেকে আমাকে নিয়ে যাবার কথা। মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মনে হল ব্যস্ত রাস্তাটা যেন অস্বাভাবিক রকমের জনশূন্য। অন্যান্য দিন এমনিতে এখানটায় চার পাঁচটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকত। আজ সেগুলোও নেই। নিজেকে নিজেই বললাম "আজিজুল হক। ভয় পাচ্ছ তুমি? রজ্জুতে সর্পভীতি!" হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সামনের দিক থেকে চার পাঁচজন লোক এগিয়ে আসছে। যতই পা-জামা পাঞ্জাবি পরা থাক চিনতে ভুল হল না। ডাইনে বাঁয়ে তাকালাম। দু দিক থেকেই ৫ জন করে লোক এগিয়ে আসছে। বালিগঞ্জের দিক থেকে একটা স্টেশন ওয়াগন খুবই মন্থর গতিতে ক্রমশ আমার কাছাকাছি এসে হঠাৎ ব্রেক কষলো! পেছনে পান-বিড়ি-সোডা বোতলের দোকান। চকিতে মনে হল দোকান থেকে বোতল তুলে নিয়ে আক্রমণ করি।

"এই যে হক সাহেব! নমস্কার!" নেপালী কাটিং একজনের নমস্কারে একটু হাসলাম। সে ভদ্রলোক আমার হাতটা ধরার আগেই চিৎকার করে উঠলাম—

"গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে।" স্টেশন ওয়াগন থেকে একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিস নেমে এল "কেন ঝামেলা করছেন! গাড়িতে উঠুন।" এতক্ষণে আইনত গ্রেপ্তার হলাম।

আমাকে মাঝখানে বসিয়ে দুপাশে দুজন, দুজন বসল। ভাবছি কী করে এটা হল! সত্যদা, অশোক গুহ ব্যতীত আর জানে একজন! তা হলে… ? 'চার অধ্যায়ের' কেস! মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। খেপা ঘোড়াটা দাপাদাপি করছে। প্রচণ্ড রবীন্দ্র ভক্ত আমি,—চার অধ্যায় পড়েই কালাপাহাড় হয়ে গিয়েছিলাম। এক মণ দুধে এক ফোঁটা চোনার মত ঐ লেখাটা যতদিন রবীন্দ্রনাথের নামে চলবে—ততদিনই আমি রবীন্দ্রবিরোধী থাকছি, থাকব। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার—গলা থেকে বেরিয়ে এল রবীন্দ্র কবিতাই!

"ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা…।

পরবর্তীকালে লর্ড সিন্‌হা রোডের পুরনো অফিসাররা, গ্রেপ্তার হওয়া কমরেডদের কাছে গল্প করেছে বলে শুনেছি—"অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা গ্রেপ্তার করলাম। আর উনি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন!" আসলে খেপা ঘোড়াটাকে শান্ত করতেই সেদিনকার সে আবৃত্তি। যেমন একা লোকে ভয় পেলে গান করে।

প্রথম জেলে

স্থান পরিবর্তন না করে ওপরের দিকে থুতু ছেটাতে গুরুজনরা নিষেধ করে গেছেন, আজ তো সে সমস্যা নেই। এক সময়ের সাথীরা আজ শাসক, আমি শাসিত। সুতরাং স্থান পরিবর্তিত। আমি থুতু কেন, আজ আমি ওদের ওপর বমিও করতে পারি। এর দায়িত্ব ওদের। যারা আক্রমণকারী এবং আক্রান্তকে নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে একই চোখে দেখেন তাঁরা আসলে আক্রমণকারীদেরই দোসর! কংগ্রেস আমার হাত ভেঙেছে, মাথা ফাটিয়েছে, আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত এক ডজন ফ্র্যাকচার, পা পুড়িয়েছে, ঝুলিয়েছে সবই সত্যি। আমি যাঁদের আত্মজ তাঁদের কেড়ে নিয়ে ঘর ছাড়িয়েছে—এটাও সত্য, তবু তখনও আমার হৃদয়টা ছিল অক্ষত, আর এঁরা? লোহার নাল-পরা বুট দিয়ে আমার হৃদয়টাকেই থেঁতলে দিয়েছেন। আক্ষরিক অর্থেই—"প্রিয়জনদের আমার" কেড়েছে। অবরোধ তৈরি করে আমার আত্মজদের তিলে তিলে মরার বন্দোবস্ত করেছে। সেই ষোল বছর বয়সেই জানতাম এ সব হবে। শাসিতের কপালে, শোষকের কাছ থেকে এ

ব্যবহারই প্রাপ্য, পুলিস ব্ল্যাকমেইল করবে, মারবে, টিটকারী দেবে, খিস্তি-খেউর করবে—এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু কমরেডরা যখন এটা করে তখন নিজেকে দৃঢ় রাখা বোধহয় অসম্ভব। যদি কেউ পারেন, তা হলে ভাবতে হবে হয় তিনি এঁদের কমরেড বলে কোন কালে মনে করতেন না, না-হয় তিনি হৃদয়হীন, বিবেকশূন্য অতিমানব। তাই আজ স্তালিনকে অনেক বেশি বুঝতে পারি। আগে দূর থেকে শ্রদ্ধায় মাথা নত করতাম, এখন বুকে টেনে নিতে পারি, বলতে পারি : কমরেড স্তালিন, তোমার দুঃখ আমি বুঝি! তোমার সহকর্মী আমি!

এর জন্য দুঃখ নেই। আছে ক্ষোভ, আছে বুকভরা ঘৃণা। আজ অনেকেই যে আমার পাঁজরের নিচে হার্ট-লাংসের পরিবর্তে বারুদের ঠাসা স্তূপ দেখেন—সে বারুদ তিলে তিলে সে দিনই জমতে শুরু করেছিল। জানি এই বারুদের বিস্ফোরণেই হবে আমার ধ্বংস। গাড়ি ঢুকল কড়েয়া থানায়, ওখানে পরিচিত এক দারোগাকে পেয়ে গেলাম। ওঁকে বললাম—"আমার ডাক্তারকে ফোন করতে হবে। না হলে উনি বসে থাকবেন।" গোয়েন্দা পুলিসরা বিশেষ আপত্তি করল না। বালিগঞ্জে এক ডাক্তারকে (বর্তমানে তিনি সরকারি আনুকুল্যে করে কম্মে বিশাল—তাই নাম বললাম না। ওঁর ক্ষতি হতে পারে!) কায়দা করে জানিয়ে দিলাম—"আমি গ্রেপ্তার!" সন্ধ্যাবেলাতেই তো ওখানে যাবে। সুতরাং খবরটা ছড়িয়ে পড়বে। ওখানে অফিসার-অফিসারে কিছু কথাবার্তার পর আবার গাড়িতে উঠলাম। এবার সঙ্গে আরও দুটো ভ্যান। একটা আগে, ওয়্যারলেস! অন্যটা পেছনে, জিপ! ঢুকলাম লর্ড সিন্হা রোডে! সূর্য পড়ন্ত! লনের গাছগুলোর পাতায়—লাল আভা। এমনিতেই আমি যথেষ্ট লম্বা! প্রায় ছ'ফুট! মাথাটা আরও উঁচু করার জন্য আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়ালাম। ভাবখানা এই—"দ্যাখ! আমাকে দ্যাখ! লাল-সূর্যের আলোয় আমাকে দ্যাখ। তোমরা যে ছেলেটার গতি রুদ্ধ করতে চাইছ—সে তোমাদের থেকে অনেক উঁচুদরের!" যৌবনের ঔদ্ধত্য তার মুক্তির পথ পেয়ে সীমা ছুঁয়েছে। আজ ভাবলে হাসি পায়। আজ বলি—"ভুলে যাও আমাকে। আমি যতক্ষণ বেঁচেছিলাম পৃথিবী জানত আমি বেঁচে আছি। আমার স্বার্থেই আমার কীর্তি যেন লোপ পায়। মরার পরে বেঁচে থাকার ধান্দা বড় বিপজ্জনক।" সাদা তিনতলা বাড়ির লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় উঠলাম। ডানদিকে একটা ঘর, বাঁয়ে ঘুপচি মত সার সার কামরা, প্যাসেজটা আবছা অন্ধকার। শ্মশানের নিঃস্তব্ধতা মানে যেমন হয়। "ফিস-ফাস, শোঁ···শোঁ।" প্যাসেজ দিয়ে দোতলায় উঠতে হল। যে দিক মুখ করে উঠলাম তার বাঁ দিকে ঘুরে একটা হলঘর বাঁয়ে ফেলে

রেখে ছোট সাজান একটা কামরায় আমাকে বসিয়ে রেখে গোয়েন্দা অফিসাররা বেরিয়ে গেলেন।

ঢুকলেন এক সুবেশ মধ্যবয়সী দৃশ্যত ভদ্রলোক। বুঝলাম কোন বড় অফিসার হবে। একটা টেবিলের যে দিকটায় আমি বসে তার উল্টোদিকে গদি লাগানো চাকাওয়ালা চেয়ারে আসীন হয়েই জোড় হাতে নমস্কার করলেন। একজন আর্দালি একটা ব্রাউন সরকারি খাম রেখে গেল। সেখান থেকে দুটো ছাপান কাগজ বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"ও দুটো পড়ুন। আর এই দু'টোই সই করুন!" পড়ে বুঝলাম একটা ডি আই আর (৩০) এ গ্রেপ্তার করার নির্দেশনামা। রাজ্যপালের সহকারী সচিবের সই করা। অন্যটা কোন জেলে থাকতে হবে তার নির্দেশ। ওয়ারেন্টের ভাষা দেখে হেসে ফেললাম। "হোয়ার অ্যাজ দ্য গভর্নর ইজ স্যাটিসফায়েড···" গভর্নর মানে তখন পদ্মজা নাইডু! সোচ্চার স্বগতোক্তি—"বাব্বাঃ ঐ মহিলাকে স্যাটিসফাই করা।" গোমড়া-মুখো অফিসার গম্ভীর হবার চেষ্টা করেও হেসে ফেললেন। প্রথম লাইনে 'স্যাটিসফায়েড' হয়েই শেষ লাইনে—"সো, দ্য গভর্নর ইজ প্লিজড, টু ডিটেইন হিম!" কী রসিকতা! ইংরেজী কেতাই বটে! স্যাটিসফ্যাকশনের পর তো প্লিজড্ হতেই পারেন ঐ মহিলা! পরের ওয়ারেন্টে নির্দেশ—কোন জেলে রাখা হবে। "প্রেসিডেন্সি জেল।" কলকাতার লোক হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলই জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে।

অফিসার বললেন—"আপনাকে আর কী জিজ্ঞাসা করব? আপনার সবই আমরা জানি। কেন এ সব 'আলট্রা' লাইনে গেলেন? আপনার বাবা সি এম-এর এত ঘনিষ্ঠ! বসুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই!" উনি বেল টিপলেন—একজন ঢুকতেই বললেন—"আমার আলমারি থেকে ফাইল এস এন আই এ-টা নিয়ে এসো।" যথারীতি হুকুম তালিম হ'লো। ইতিমধ্যেই ফাইলটা বেশ মোটাই হয়েছে দেখছি। উনি প্রায় তিরিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটা লেখা আমাকে দিয়ে বললেন—"এটা চিনতে পারেন?" ভেতরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। এ কী! এ যে আমারই লেখা। ছাত্র-শাখা সম্মেলনে বাসবপুন্নাইয়ার দলিলের বিরোধিতা করে যে-কর্মসূচী হাজির করেছিলাম—এটা তো সেটাই। কিন্তু এটা তো আমি প্রেসিডিয়ামকে দিয়েছিলাম। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি হিসাবে রসুল সাহেবের সইও আছে শেষ পৃষ্ঠায়। এটা এখানে এল কী করে? এই কর্মসূচীতে আমরা '৪৮ সালে বি টি আর মাও-সে তুংকে যে পাতিকৃষকনেতা, সংশোধনবাদী বলে

চিহ্নিত করেছিলেন—তার সমালোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম বাসব-পুন্নাইয়া আসলে একজন টিটোপন্থী! সমগ্র কর্মসূচীটাই ট্রটস্কি-টিটোর লাইনের ফলশ্রুতি। পার্টির কর্মসূচীতে ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যা কৃষক মুক্তির কথা অনুপস্থিত। আমাদের কর্মসূচীতে ইন্দোনেশীয় পার্টির কর্মসূচী থেকে তুলে ধরা কয়েকটা লাইন ছিল যা আজও প্রাসঙ্গিক। "পার্লামেণ্ট এবং পার্লামেণ্ট বহির্ভূত পথের সমন্বয়ের কথা বলে" চকচকে কথার ঝকমকে বাক্যজালে বাসবপুন্নাইয়া কর্মীদের ধোঁকা দিতে চাইছেন। শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট বহির্ভূত ব্যাপারটা কমতে কমতে শূন্য হয়ে যাবে। সকলেই চাইবেন পার্লামেণ্টারী পথের কাজে আত্মনিয়োগ করতে। কারণ এটাই পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা—"কম কষ্ট করে, তার থেকেও কম ত্যাগ স্বীকার করে—সব থেকে বেশি গ্ল্যামার এবং লাভ।" এটার উৎস-বুর্জোয়া অর্থনীতি যার মূল কথা "মিনিমাম ইনভেস্টমেণ্ট ম্যাক্সিমাম প্রফিট"...

"বিপ্লবের সময় হয়নি বলে যাঁরা ওকালতি করছেন যুক্তির খাতিরে তাঁদের বক্তব্য সঠিক বলে মেনে নিলেও, একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায়—আমি যাব খড়্গপুরে ট্রেন আসার সময় হয়নি, তা বলে কি আমি বর্ধমানগামী ট্রেনে চেপে বসব! বিপ্লবের সময় যখন হয়নি, সুতরাং ক'বছর মন্ত্রিত্ব করে নিই!"... ২০/২১ বছরের ঔদ্ধত্য নিয়ে লেখা সে কর্মসূচী আজ অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও একটা কথা তো ঠিক, আমরা সমস্যাটা ধরেছিলাম। যদিও আমরা ৪৮ সালের অন্ধ্র ডকুমেণ্টকেই গাইড লাইন করেছিলাম। প্রোগ্রামটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমার চিন্তা অন্যখাতে বইতে শুরু করল। তা'হলে এর সমর্থনে শৈবালদা যে রণ-কৌশলগত লাইনটা দিয়েছিল সেটাও কি এরা পেয়ে গেছে? তা হ'লেই সর্বনাশ! তাতে যে সাংগঠনিক ডিটেইলস্ আছে! অফিসারের মুখে ব্যঙ্গের হাসি, হঠাৎ লেখাটা ছিনিয়ে নিলেন। (হায় তিরিশ কেন তিনশ' বছর পরেও কি এ রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে না?")

এরপর উনি হাসতে হাসতে একটা ছবি আমার হাতে তুলে দিলেন। বাংলার বধূ, হেনরিয়েটার কবরের পাশে মাইকেলের মূর্তির নিচে এক মহিলা এবং আমি। না-চেনার কথা নয়। আমি কী বলছি—উনি লিখে যাচ্ছেন। কী লেখা সেটাও মনে পড়ল। ওনার ক্লাসের একজন ছাত্র একটা হিন্দি কবিতা বই প্রকাশ করেছেন, সেটার বাংলা অনুবাদ করে দিতে হবে আমাকে, তাতে একটা কবিতা ছিল শৈবাল মিত্রের উদ্দেশ্যে, আমরা সেদিন যেটা অনুবাদ করছিলাম সেই লাইন ক'টাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"হয়েছে অনেক ভুল
জীবনকে জানতে
অথবা বুঝতে···
চলো না, অভিকর্ষের আকর্ষণ থেকে
চলে যাই দূরে
আকাশকে চ্যালেঞ্জ জানাই।"

অফিসার ভদ্রলোকও রসিক। উনি হ্যামলেটের তৃতীয় অঙ্ক আবৃত্তি করলেন; মায়ের বিরুদ্ধে পুত্রের অভিযোগ, 'কেন, আমাকে ডাক বার বার। বাবার শরীরের ওম এখনও বিছানায়, সেই বিছানাতে তুমি কাকার অঙ্কশায়িনী। আমার বাবা হত্যাকারী···' ইত্যাদি। "এত দিন নির্মল-প্রেম না-করে যদি নেতাদের মত ... ছেলে রেখে আসতে পারতেন সে হয়ত চ্যালেঞ্জ করত!" গা রি-রি করে উঠল। মুখ থেকে শুধু বেরুল—"ভাদ্দরে কুত্তা!" পরে জেনেছিলাম ইনি বিখ্যাত শিল্প-রসিক—আইয়ান রশিদ খান, তখন বোধহয় প্রোবেশনারি অফিসার! তাই এই কয়েকদিন আগে বিধানসভাতে জ্যোতি বসু যখন বললেন—"শেক্সপীয়র না পড়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না, এটা কেমন কথা?" বিনা-প্রচেষ্টাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"জ্যোতিবাবু আমার থেকেও মূর্খ" উনি জানেন না, একজন ডাক্তারের কাজ শুধুমাত্র রোগের বাহ্যিক কারণগুলো দূর করা নয়, রোগীর মনটাকেও মেরামত করা। পাভলভ পড়লে বুঝতে পারতেন। আর মনের কারবারি, শেক্সপীয়র-দস্তয়ভস্কি-গোর্কি-বালজাক-তলস্তয়—বাদ দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন, —একজন ডাক্তার? উনি জানেন না, লেডি ম্যাকবেথের মন, হ্যামলেটের 'ডিলেরিয়াম', টেম্পেস্টের 'হ্যালুসিনেশন', ওথেলোর 'প্যারানইয়া' নিয়ে ইতি-মধ্যেই কয়েকশ' ডাক্তার ডি এস সি পেয়েছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন দর্শন জন্ম নিতে চলেছে। আর ইঞ্জিনিয়ার? বিটোফেন জানেন না বা বোঝেন না, এমন একজন ইঞ্জিনিয়ার তো—নিছক হাতুড়ে রাজমিস্ত্রি। হেগেলের ভাষায়—"আর্কি-টেক্ট ইজ আ ফ্রোজেন মিউজিক!" অর্থাৎ তাজমহলকে যদি গতিশীল করা যায়—সৃষ্টি হবে—ওমর খইয়ামের রুবায়েৎ, বিটোফেনের সোনাটা আর রবিশঙ্করের সেতার কিংবা পাগিনিনির ভায়োলিন! আর ওঁদের, এগুলোকে 'ফ্রিজড্' করলেই হবে 'তাজমহল'! হায় আমাদের গার্জেনরা! এরই জন্য বাসবপুন্নাইয়ার কর্মসূচীতে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট নিয়ে একটা কথাও ছিল না। সেদিন সংস্কৃতি সম্পর্কে নিরুচ্চার থাকাটা যে নিছক 'অমিশন' ছিল না, সেটা ছিল 'ডেলিবারেট-কমিশন'

সে কথা আজ পরিষ্কার। সে দিনই নিরুচ্চার থেকে ওঁরা সোচ্চার ঘোষণা করেছিলেন—'আসছে হোপ-৮৬', এবার আমরা 'জাগবো নব আনন্দে', রঙ-চটা মুখোশকে ঔজ্জ্বল্য দেবার জন্য করব—'বক্রেশ্বর-৮৯'। গোর্কির ভাষায়—(আমেরিকায় আলোর ঝলকানি দেখে) 'এখানকার আলোগুলোও অন্ধকারের চোরের মত লোকের পকেট কাটে!'

ফিরে যাওয়া যাক ২৫ বছর আগে। একজন এসে বলল—"স্যার, গাড়ি রেডি!" "দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। অতএব যান এখন নেতাদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করুন।" আবার দো-তলা ভেঙে একতলার লন। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে, বেশ গাঢ় নিওন-লাইটের আলোতেও অন্ধকারের আগমন টের পেলাম। 'অদ্ভুত আঁধার এক নেমেছে পৃথিবীতে আজ।'

বাচ্চা বেলায় বাবা পড়াতেন সত্যেন-কানাইদের গল্প। আমি 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল' কিংবা 'পক্ষীরাজের' গল্প শুনে বড় হইনি। মা শোনাতেন লায়লা-মজনু কিংবা শিরি-ফরহাদের গল্প। প্রেমের মূল্য নিঙড়ে নেয় প্রেম নিজেই। "প্রেম করব অথচ মূল্য দেব না এ তো হ'তে পারে না।" তা সে দেশপ্রেমই হোক আর মানব-মানবীর প্রেমই হোক। "কে আমাকে ভালবাসল সেটা বড় কথা নয়, আমি ভালবাসি! দ্যাটস্ অল!" সুতরাং নেতারা কিভাবে আপ্যায়ন করবেন, কেমনই বা ব্যবহার করবেন সেসব ভাবছিলাম না। কোট্-করি, রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোই মাথায় উঁকি মারল—"ভাল লাগা আর ভালবাসা দু'টো বিপরীত শব্দ!…একটা আত্মকেন্দ্রিক, আমাকে ভাল লাগে, অন্যটা বহির্মুখী, আমি ভালবাসি…।" (উক্তিতে যদি ভুল হয়ে থাকে পণ্ডিতজন ক্ষমা করে নেবেন। হাতের কাছে তো বই নেই) আমি তো জানি, আমি যা করেছি ভালোর জন্যই করেছি। জ্ঞানত পার্টি বা জনগণের ক্ষতি করিনি। সুতরাং ওঁরা যা খুশি করতে পারেন, করুন! আমার বাঁ-পা! চোয়ালটা শক্ত হতে শুরু করল। 'হাসি দিলে বাঁশি পাবে, কাঠি দিলে লাঠি!' এসব ভাবতে ভাবতেই স্টেশন-ওয়াগনটা প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে এসে পৌঁছল। গাড়িটা জাল-দিয়ে-ঘেরা চ্যালেঞ্জ গেট পার হয়ে লৌহ-ফটকের সামনে ব্রেক কষল। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি "…", "বড়দা" আরও কয়েকজন। আমাকে নামতে দেখেই ছুটে এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরল। ওর চশমার ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ধমক দিলাম (ওটা আমার স্বভাব।)—"চোখের জলটা দেখানোর জিনিস নয়। ওটা একান্তই নিজস্ব বস্তু। বালিশ-ভেজানোর জন্য। মানুষ দেখুক আমরা আনন্দিত, আমরা সুখী"।

ও থতমত খেয়ে আধো আধো বাংলায় বলল—"তোমাকেও না।" এবার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। যতদুর সম্ভব কঠোর হবার ভান করে বললাম "না-না"। "ওঃ"! এগুলো নিয়ে যাও, "লুঙ্গি, গামছা, সাবান, পেস্ট-ব্রাশ আছে।" অশোক স্তম্ভ শিরোধার্য করা—তার নিচে চকচকে পেতল খোদাই "সত্যমেব জয়তে" লৌহ-কপাট খুলে গেল।

"সত্যমেব জয়তে" মাথার ওপর রেখে চরম মিথ্যার জগতে ঢুকে গেলাম। স্বগতোক্তি—"বেশ্যাপল্লীতে সতী মন্দিরের ছড়াছড়ি।"

২

আমাকে গ্রাস করে লৌহ কপাট—ঘটাং। বাইরে তখনও ওঁরা দাঁড়িয়ে। যে-দিকে মুখ করে ঢুকলাম তার বাঁদিকে একমানুষ সমান উঁচু একটা টেবিল তার পেছনে একজন খাকি-লোক দাঁড়িয়ে। ৮টা ১৫ মিঃ। বুঝলাম ফোনটা কাজ করেছে। এস-বি অফিসের দেরিটার সুযোগ ওঁরা নিয়েছেন। ডানদিকে ঘেরা একটা টেবিল-চেয়ার। তাঁর হাতের কাছে সাজানো-লাল-সবুজ-সাদা বিভিন্ন ধরনের পতাকা। ছোট ছোট লাঠিতে জড়ানো। একটা সুইচ বোর্ড। তাতে লেখা 'অ্যালার্ম'। আমি ঢুকতেই ঘেরা টেবিল থেকে স্বাভাবিক পোশাক পরা একজন বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলেন—। 'ডিসিপ্লিন অফিসার—মিঃ কেরী!' একটা পা খোঁড়া। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পতাকাগুলো কীসের।" "অ্যালার্ম সিগন্যাল, ঐ বোতামটা টিপলেই 'পাগলি' সাইরেন বাজে। যদি খুব মারাত্মক গণ্ডগোল হয়—লাল পতাকা গেটে টাঙাতে হবে। রুটিন 'পাগলি' হলে সবুজ। অল-ক্লিয়ারেন্স 'সাদা'।" জেলের প্রথম পাঠ শেষ হল। উনি নিজেই বাঁদিকের খাতায় আমার নাম এন্ট্রি করে দিলেন। "চলুন, জেলরবাবু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন!"

ওঁর টেবিলের পাশের দরজা দিয়ে একটা হলঘর। পর পর চেয়ার-টেবিল-আলমারী সাজানো। কেরানিকুলের বসার জায়গা যেমন হয়। হলঘরের ডান-দিকে সবুজ পর্দা ঝুলছে। দরজায় লেখা 'জেলর'। সামনের টুলে ধবধবে সাদা-মোটা সুতোর জামা-প্যাণ্ট পরা একজন ঢুলছিলেন। আর্দালি। কনভিক্ট। ডি ও-কে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে আনাড়িভাবে স্যালুট করল। আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ডি ও ভেতরে গেলেন এবং বেরিয়ে এসে বললেন—"চলুন"। জেলর ভদ্র-লোক—ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। চোখে চশমা। বসতে বললেন। এস বি-র লোকরা জিজ্ঞাসা করল—"আমরা আসতে পারি স্যার?" উনি 'আসামী বুঝিয়া পাইলাম' সার্টিফিকেটে (ওয়ারেণ্ট) সই করে দিলেন। গোয়েন্দারা বিদায় নিল। ওঁদের

এক অফিসারকে জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—"আই থিঙ্ক ইয়ংগেস্ট ডেটেনিউ ইন্ ইণ্ডিয়া !" আফিসারও বললেন, "আই থিঙ্ক সো ! তবে স্যার ধানী লঙ্কা !" এস বি অফিসার চলে গেলে উনি একজন ডেপুটি জেলর একজন সিপাহীকে বললেন—"সাত খাতায় দিয়ে আস্থন।" কথাগুলোর মানে পরে জেনেছি। 'খাতা' মানে ব্লক। চৌকা—কিচেন। কেস্ট-ফাইল—কেস-টেবিল। অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক বেল—অ্যাণ্টিসিপেটারি বেইল। গামলা—দেহের পশ্চাদাংশ। যাক জেলের পাঠ শুরু হল। মনে মনে বললাম, "বাবুজী ! তুমি খুশি তো !" ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করলে বাবা বলতেন "দিয়ে আসব জেল-স্কুলে বুঝবে ঠ্যালা ! ধানে-চালে মিশিয়ে দেবে। শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে পেটাবে !" সেই জেল স্কুলের প্রথম পাঠ শুরু হল—'খাতা' শব্দ দিয়ে। যে রাস্তা দিয়ে জেলরবাবুর ঘরে ঢুকেছিলাম সেই রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে এলাম।

পেছন ফিরে দেখি লোহার গেটটার দুটো রড ধরে···পাথরের মূর্তির মত তাকিয়ে আছে। "ইজ্‌ সি হ্যাপী প্রিন্সেস !" একটু ম্লান হেসে হাত নেড়ে বললাম—"পেছনে পড়ে রইলে যারা পেছনেই থাক।" হ্যাঁ, তারপর থেকে এ লেখা শুরু করার আগে আর পেছনে তাকাইনি। ৭০/৮০ পা সিমেণ্ট বাঁধানো চাতাল হেঁটে আর-একটা লোহার গেট। তার পাশে ছোট কাঠের দরজা। কাঠের দরজাটা খুলে গেল। "আমদানি—এক বাবু, স্বদেশী, সাতখাতা !"

গা-ছমছমে আবছা অন্ধকার। দূরে দূরে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। কোথাও বা থালা-পিটিয়ে গানের মহড়ার আওয়াজ কানে এল। সামনে একটা শান-বাঁধানো পুকুর আছে বুঝলাম। ডেপুটিবাবু বললেন—"ঐ যে হলঘরটা দেখা যাচ্ছে—মাঠের ওপারে—ওখানেই আপনাদের কমরেডরা থাকেন।" তাকিয়ে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"কতজন থাকেন ?" "তের"। বাঁদিকে মোড় নিয়ে লোহার রেলিং। লাগোয়া গেট। ডেপুটিবাবুকে দেখে গেটের সিপাহী শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। একটা টিনের বাটি থেকে কি যেন খাচ্ছিল। বাটিটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে যেতেই মাংসের গন্ধ পেলাম। "আজ বোধহয় মাংসের ফাইল ছিল !" ডেপুটিবাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর না-দিয়ে সিপাহীবাবু গেট খুলে দিল। আমার শব্দ ভাণ্ডারে নতুন সংযোজন 'মাংসের ফাইল!' ফাইল মানে জানি। কিন্তু মাংসের ফাইল ?

"এটা কুষ্ঠ রোগীদের সেল—১০ ডিগ্রি। এটা বড় চৌকা," ডেপুটিবাবু জেল চেনাতে চেনাতে চলেছেন। আমিও শব্দগুলোর নিগূঢ় অর্থ বোঝার চেষ্টা করছি।

নতুন জগৎ। ভাষা তো নতুন হবেই। বিংশ শতাব্দীকে পেছনে ফেলে এসেছি। মধ্যযুগীয় ভাষা রপ্ত না করলে চলবে কেন? দু-তলা করে এক-একটা ব্লক। বাঁদিকে। "এটা ২১নং ওয়ার্ড। ৯ খাতা। এখানে কনভিক্টরা থাকে।" প্রত্যেকটা 'খাতা' দেড়মানুষ সমান হলুদ রঙ করা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য একটা করে ছোট দু-পাল্লার কাঠের দরজা। ৮ খাতার দরজা পার হলাম। এবার 'সাত খাতা' কত রক্ত-ঝরা ঘটনার সাক্ষী! সিপাহীবাবু হাঁক ছাড়লেন—"ডিউটি··· এক আমদানি।"

একেবারে ৯০° খাড়া কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দু-তলায় উঠলাম। লোহার গেটের চাবি খোলার আওয়াজ। আনন্দকের শব্দ 'ঘটাং'? একগাল হাসি নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এক তরুণ, এঁকে চিনতাম। কারণ ৭ম কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনে প্রেসিডিয়াম যখন আমাকে বক্তব্য রাখা থেকে বিরত করার চেষ্টা করছিল, এঁর নেতৃত্বে বেশ কিছু প্রতিনিধি প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন। সেদিন প্রেসিডিয়ামের বাঘা বাঘা সদস্যরা তিন মিনিটের জায়গায়—আমাকে পনের মিনিট বলতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উনি প্রতিনিধির আসন থেকেই দাবি তুলেছিলেন—"কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার পার্টি কর্মসূচী ব্যাখ্যা করতে দেড়ঘণ্টা সময় নিয়েছেন। কমরেড আজিজুলের বিকল্প কর্মসূচী আছে। ওঁকেও দেড়ঘণ্টা সময় দিতে হবে। এটা তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বীকৃত নিয়ম। প্রেসিডিয়ামের সভাপতি কমরেড কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই নিয়মটুকুও মানবেন না?" হরেকৃষ্ণ কোঙারের নির্দেশে প্রেসিডিয়াম তাঁর অনুরোধ মানেননি। তবে তিন মিনিটের জায়গায় আমাকে পনের মিনিট সময় দিলেন! আমার রাখা কর্মসূচীটা ব্যাখ্যা করা তো দূরে থাকুক —পড়তেই পারলাম না। রাগে ক্ষোভে শৈবালদা তো বক্তব্যই রাখলেন না। অসিত মুখ-খিস্তি করে কয়েকজনকে (অসিত সিন্‌হা) নিয়ে চেয়ার ছুঁড়ে ফেলে সেই যে সম্মেলন ছেড়ে গেল আর এলই না। সেদিনই বুঝেছিলাম—কমিউনিস্ট গণতন্ত্রের ধ্বংসসাধন শুরু হয়েছে। এটা হয়েছে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে। কমিউনিস্ট পার্টিকে এরা 'সাফোকেটিং কেজে' পরিণত করছে। কতকগুলো 'সাইকোফেণ্ট' ছাড়া—কেউ আর পার্টিতে থাকতে পারবে না। এর ফল হবে মারাত্মক! একটা মহত্তম গণতন্ত্র কতগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষীর হাতে পড়ে নস্যাৎ হতে চলেছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল—বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন! ২০/২১ বছরের একটা দুর্বিনীত যুবকের সে আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করার জন্যই আজ গরবাচভ গ্লাস-নস্ত করলেন। আজ মনে পড়লে হাসি পায় সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রায় এণ্টনির মতই বক্তৃতা দিলাম—এই নেতারা তেলেঙ্গানা করেছেন, কাকদ্বীপ করেছেন একথা

ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে, এঁরা জেলে নির্যাতিত হয়েছেন ভাবলে চোখে আসে জল, এঁরা যতদিন লড়াকু ছিলেন ততদিন পেয়েছেন শ্রদ্ধা, সম্মান। আজ এঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ঘৃণা আর নাকচ ছাড়া এঁদের আজ আর কিছুই প্রাপ্য নয়।"

জেলে প্রথম যিনি অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে দেখেই সেই কথাগুলোই মনে পড়ে গেল! "যাক্ একটা কচি-কাঁচা দিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্য-সংখ্যা (১৩)টা কাটলো।" ইনি অশোক বোস। তখন কাউন্সিলর ছিলেন। অমায়িক ভদ্রলোক। তাই আজ যখন শুনি অমুক কেলেঙ্কারির সঙ্গে অশোক বসু জড়িত, ভাবতে কষ্ট হয়। আমার আজকের কমরেডরা হয়ত এটাকে আমার উদারতাবাদ ভাবতে পারেন। বুর্জোয়া-ভাইসেস বলে গালাগালি করতে পারেন। হয়ত তাঁরা সঠিক। কারণ দু-যুগের ব্যবধানে কত কিছুই তো ঘটে যায়। অশোকদা একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন, প্রশান্ত শূর (জেল পার্টির নেতা), রাধানাথ চট্টরাজ এম এল এ, জুড়ন গাঙ্গুলি, শ্যামল রায়, মণ্টুদা, সুশোভন বসু (জয়ার সম্পাদক), রবীন মুখার্জি এম এল এ, "ইনি হচ্ছেন, কমরেড মানিক হাজরা", "কাকদ্বীপের ?" আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন "হ্যাঁ", অদ্ভুত শিহরণ। চন্দনগিড়ির অহল্যার নেতা! মাইলের পর মাইল নদীর বুকে নৌকার ওপর লাল পতাকা উড়ছে। কৃষক শক্তির বিজয় নিশান। সেই কাকদ্বীপ। আমার স্বপ্নের কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গানা—তার নেতা! মাথাটা নিচু হয়ে গেল। বিশাল ভুঁড়িওয়ালা কুতকুতে চোখের কালো ভূষণ্ডী লোকটা কি বুঝতে পারল আমার আবেগ! আমার অনুভূতি! না! "ওই অতি-ক্ষতি এখানে চলবে না।"—"এ কি রে বাবা ?" চোয়ালটা শক্ত হতে শুরু করল। "তুমি যেই হও। তুমি অতীত! আমি ভবিষ্যৎ। সুতরাং তোমাকে তোয়াক্কা করতে যাব কোন দুঃখে!" প্রায় ৭৫ বছরের শীর্ণ এক বৃদ্ধ নিয়ে এগিয়ে এসে লাল-সেলাম জানালেন—'সতীশ পাকড়াশী!' আশ্চর্য! সতীশদা এখানে আছেন অথচ কেউ পরিচয় করিয়ে দিলেন না। এঁদের ভাঙিয়েই তো ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন। চমকে উঠে হাত দুটো চেপে ধরলাম। "সতীশদা!" বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। ব্রিটিশ, বোমা, সাহেব খতম, উত্তাল যুবসম্প্রদায়। ফাঁসির মঞ্চে আত্ম-বলিদান! মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র! মেছোবাজার বোমা-মামলা—সতীশ পাকড়াশী! গলা ধরে গেল! গ্রেপ্তারের দুঃখ ভুলে গেলাম। প্রিয়জনদের ফেলে আসার শোকের জায়গা দখল করে নিল আমার বিনয়ী ছাত্র-মন। সত্যিই জেলখানা বিশ্ববিদ্যালয়! একদিকে মানিক হাজরার হৃদয়হীনতা বিপরীতে সতীশদার কলজের উত্তাপ, অশোকদার হাসি, প্রশান্তদার 'হুকুমী মেজাজ' জীবনের (জীবন মুখার্জি) 'ডেমাগ', কী নেই এখানে! আছে রাধানাথদার সরলতা! গোটা মানবসমাজের

সামাজিক-মনটাই কেন্দ্রীভূত এই দুটো হলঘরে। বিশাল বিশাল দুটো ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকেই যেটা ওটা ১৮নং ওয়ার্ড, মুখোমুখি বিশাল বিশাল জানালা। আটটা করে ১৬টা। মাঝখানে একটা লোহার গেট—ওপাশটা ১৬নং ওয়ার্ড। প্রায় সকলেই ওদিকে থাকেন।

অশোকদা প্রথম হল ঘরটার (১৮নং ওয়ার্ড) দরজার বিপরীত দিকের জানালার ধারে একটা লোহার খাটে ধব-ধবে মোটা-সুতোর সাদা চাদর বিছানো, 'শয্যা' (শরশয্যা নয় তো ! দেখা যাক) দেখিয়ে বললেন, "এটা তোমার খাট। জানালা দিয়ে জেলের মেইন গেটের ভেতরের দিকটা দেখতে পাবে। সামনে পুকুর। কদম গাছ, মাঠ। তুমি তো আবার কবিতা লেখো, তাই জায়গাটা তোমার ভালই লাগবে ! আর দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালেই তোমার মনটা হু হু করে উঠবে। দেওয়ালের ওপাশেই ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠ। তোমাদের ইয়ে···"। হাসলাম। "নাও কাপড় চোপড় ছাড়ো পরে কথা হবে।"

৩

ষোল নম্বর ওয়ার্ডের এক কোণে একটা ছোট ঘর। দু-ভাগে বিভক্ত। ঢুকতেই একটা বিশাল ড্রাম ভর্তি জল, আর মগ। ভেতরে একটা লোহার ঢাকনা-বিহীন ড্রাম। অশোকদা দেখিয়ে দিলেন। এটাই এখানে বাথরুম (রাতের জন্য)। এই জলে হাতমুখ ধুয়ে নাও। পেচ্ছাব-পায়খানা ঐ ভেতরের ড্রামে। পায়খানা ঘরে ঢুকে গা-গুলিয়ে উঠল। মল ভাসছে। মানবীয় বর্জ্য পদার্থের দুর্গন্ধ ! গ্রামের ছেলে ছিলাম। প্রশস্ত মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতাম। পায়খানায় বসেও বুকভরে টেনে নিতাম দখিনা কিংবা উত্তরে হাওয়া। লজ্জা আড়াল করে থাকত সবুজ-গাছ-গাছালি—প্রকৃতি নিজেই—তার যে-টুকু গোপন রাখা উচিত বলে মনে করত—গোপন রাখত। আমাদের লজ্জা ঢেকে রাখত প্রকৃতি ! এরা কৃত্রিমতা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে গিয়ে—আরও লজ্জায় মাখামাখি হচ্ছে। পেচ্ছাব করতে গিয়েই বুঝলাম সে-কথা। ড্রাম থেকে মল-মূত্র ছিটকে এসে সমস্ত কাপড় নোংরা করে দিল। স্নান করতে বাধ্য হলাম।

স্নান সেরে ফিরে আমার জন্য নির্দিষ্ট শয্যায় সবে গা-এলিয়েছি। আধ-ময়লা মোটা কাপড়ের (চট বলাই ভাল) হাফ প্যান্ট পরা যুবক একটা কলাই-করা থালাতে, চারটে লুচি, তরকারি, একটা সন্দেশ, একটা কলা নিয়ে হাজির। বিছানার মাথার দিকে মিটসেফের ওপর কুঁজো গ্লাস।··· "বাবু, আপনার টিফিন !" "বাবু !" শুনেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। "বাবু, ফাবু নই ! কোন্ শালা বাবু ?"

ছেলেটা ঘাবড়ে গেল। "আমি ফালতু, বাবু ?" মানুষ আবার 'ফালতু' হয় নাকি ! "বাবু আপকা নাস্তা !"—যুবকের কথায় থালাটা হাতে নিয়েই হেসে ফেললাম। লক্ষ্য করিনি ইতিমধ্যে সতীশদা কখন পাশে এসে বসে গেছেন। গ্লাসে জল গড়ানোর শব্দে সচকিত হলাম। ওঁকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি জানলেন কী করে, এই একটা কাজেই আমি ভীষণ আলসে !" এখনও পর্যন্ত জল গড়িয়ে খাওয়াটা আমার কাছে সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজ। চেষ্টা যে করি না তা নয়। হয় গ্লাস ভাঙবে, না হয় চারদিক ভাসবে ! প্রশ্ন শুনে সতীশদাও হেসে ফেললেন—"তোমার মত বয়স যে আমারও ছিল ! নাও খেয়ে নাও ! ডিনার—রাত দশটায়"। 'ডিনার' কথাটার ওপর এমন ব্যাঙ্গাত্মক জোর—যা লিখে বোঝানো যাবে না। এবার সতীশদা প্রশ্ন করলেন "থালাটা হাতে নিয়ে তুমি হাসছিলে কেন ?" লজ্জা পেয়ে বললাম—"বাবা বলতেন জেলস্কুলে চালে-ধানে মিশিয়ে খেতে দেয়। রোজ সকালে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে কোঁড়া মারে। এ তো রাজকীয় ব্যাপার দেখছি ! বাবা দেখলে, ওনার ভুল ভাঙতো !"

বৃদ্ধের বুক-চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস !···

"ছিল হে, তাই ছিল ! তখন ওরা বুঝতে পারেনি আমরা মন্ত্রী হয়ে যেতে পারি। এখন ওরা বুঝেছে আমরা হবু মন্ত্রীর দল। তাই এত খাতির। তোমরা সেইদিনগুলো ফিরিয়ে এনো। এই জেলেই গোবর্ধন শহিদ হল। কাকাবাবু-বিধান রায় চুক্তি হল। তা কি শুধু প্রতিদিন দু-টাকা সিগারেট খরচ, বছরে ২৩৫ টাকার জামা-কাপড় কেনা আর ১৩ টাকা খাবার খরচ দেবার চুক্তি ? গোবর্ধনরা কি এটা চেয়েছিল ? তোমরা সেইদিন ফিরিয়ে এনো !···" ওঁর চোখের কোণে জল ! আমার লুচি ঠোঁটের কাছে এসে স্থির ! ঠোঁট হাঁ, কিন্তু লুচি ঢুকছে না। মাথার ভেতর ভাসছে—৪৮-৪৯ সাল, কলকাতা উত্তাল। "রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।" জেলের ভেতর রাজবন্দীরা অনশন করছেন। কর্তৃপক্ষের অনশন ভাঙানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন—দমদম জেলের আর প্রেসিডেন্সি জেলের বন্দীরা। সাউথ ডি সি আর গুপ্ত (পরবর্তীকালে নকশাল হত্যাকারী রঞ্জিত গুপ্ত এবং এখন ভীষণ সংস্কৃতিবান—ওঁর লেখা ছাড়া কাগজ বেরয়ই না ?) নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনশনকারী মহিলা কমরেডদের চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে পেড়ে ফেলে এক একটা বিহারী সিপাহীকে দিয়ে ধর্ষণ করাচ্ছে। বাকি মহিলারা অনড়। তখন অনশনের ১৬/১৭ দিন। ডি সি-র অট্টহাস্য, বাইরের ছাত্র-যুবকরা উত্তাল। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে লাঠি-গুলি। বউবাজারে লতিকা-প্রতিভা শহিদ। সে সব ঘটনা স্মৃতি থেকে শ্রুতি হয়ে আমার মগজে গেঁথে আছে। আর আছে তদানীন্তন

পার্টি প্রকাশিত লিফলেট্ (যা আজও সংরক্ষিত; সযত্নে। কারণ আমি যে তাঁদেরই উত্তরসূরি। তাঁদের মধ্যে আজ যাঁরা মন্ত্রী—তাঁদের নয়। সেদিনের সেই ইলা মিত্রকেই চিনি, এই ইলা মিত্রকে জানি না। সেই কনক মুখার্জিকে মানি, এম্ পি কনক মুখার্জি আমার কাছে ফসিল!) "কি, প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী আর বর্তমান সন্ত্রাসবাদী মিলে কি হচ্ছে?"

...রাধানাথদার কথাতে সম্বিত ফিরে পেলাম। সতীশদা মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে লাগলেন। আমি হাসলাম। সুখেও হাসি, দুঃখেও হাসি। রাধানাথদা তাঁর বীরভূমের টানে শুরু করলেন—"বুঝলে হে! সেদিন তোমাদের 'কেষ্ট কাফে'তে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে একটা রেস্টুরেন্ট। ওটাকে সুরেন্দ্রনাথের কফি হাউস বলা হত।) কতকগুলো ছেলে যখন শুনলো আমার বাড়ি লাভপুর—বলে কিনা আপনি 'তারাশঙ্করের দেশের লোক!' তাঁদের বললাম—"না হে! তারাশঙ্কর আমার দেশের লোক!" শালা, তে-ভাগার সময় পালিয়েছিল। ওর দাদাকে ধরে এনে আমরা গণ-বিচার করলাম। প্রচণ্ড অত্যাচারী, তাতে আবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট! কেউ আর বামুন হত্যার পাপ নিতে চায় না। অথচ বিচারে রায় হয়েছে পঁচিশ ঘা বেত মেরে ওকে ফাঁসি দিতে হবে। সে তো আমার পা ধরে কান্না-কাটি করছে। মনটা গল্লে গ্যাঁলো গো! বললাম "ঠিক আছে, বামুনের সবচেয়ে বড় শাস্তি টিকি কর্তন! সে কাজটা আমাকেই করতে হল হ্যাঁ! চাঁদি ফাঁকা করে ওকে বললাম মহকুমা ছেড়ে চলেই যাবেক!..." গেট থেকে প্রশান্তদাকে আসতে দেখেই রাধানাথদা শুরু করলেন—"কি তোমরা জর্জ বিশ্বাস, হেমন্ত, সন্ধ্যা করো! সে-গান ছিল আমাদের সময় কাননবালা!" ব্যস্ উনি ধরলেন। "আয়রে বসন্ত, তোর কিরণমাখা পাখা তুলে!" আমি সতীশদা তো হেসে ফেললামই—প্রশান্তদাও হেসে ফেললেন। পরে দেড় বছর ধরে প্রতিদিন ভোরবেলা ওঁর এই আগমনী সুর শুনে ঘুম ভাঙতো!

অদ্ভুত ব্যাপার! সতীশদা কিন্তু রাধানাথদার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। রাধানাথদা অদ্ভুত কায়দায় প্রশান্তদাকে ধোঁকা দিলেন। রাধানাথদা যে এম এল এ। উনি ডজ্ করতে জানেন, ডিচ্ করতে জানেন। সেদিনই বুঝলাম—রাধানাথদা ডিপ্লোম্যাট, আর সতীশদা প্যাট্রিয়ট! একই বিশ্বাস, একই দীর্ঘশ্বাস—তবুও ফারাক আছে। হ'লে প্যাট্রিয়টই হ'ব, নেভার আ ডিপ্লোম্যাট।

"শোনো, কাল সকালবেলা বাজারের লোক আসবে, তোমার কি কি লাগবে লিস্ট করে রেখো!" প্রশান্তদার কথার উত্তরে জানালাম—"কিছুই তো লাগবে না!" "তা বললে তো চলবে না। ২৩৫ টাকার জামা-কাপড় তোমার প্রাপ্য। মাসে

৬০ টাকা হাত খরচ মাসেই খরচ করতে হবে। ওটাও তোমার। সপ্তাহে চারটে চিঠি লিখতে পারবে। এই নাও প্যাড, সাদা-স্ট্যাম্পবিহীন খাম, একটা কলম। এগুলো জেল থেকে এমনিতেই দেয়।"

৬৫ সালে ২৩৫ টাকার জামা মানে বিশাল ব্যাপার। আমি তো আজ পর্যন্ত সাড়ে তিন টাকার পাঞ্জাবি-পাজামা পরে কাটিয়েছি। মনে রাখতে হবে তখন সোনার ভরি যতদূর মনে পড়ছে ১৫০ টাকার কাছাকাছি। একখণ্ড লেনিন ভল্যুমের দাম ছিল ৮৭ পয়সা। "ওসব আপনি করে দেবেন!"—এই বলে প্রশান্তদাকে বিদায় দিলাম।

"আমরা পার্টির অন্নদাস হে! পার্টির অন্নদাস! চলুন কমরেড ও একটু জিরোক!" সতীশদা, রাধানাথদাকে নিয়ে চলে গেলেন।

সারাদিনের ক্লান্তি, উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা নিয়ে বালিশে মাথা রাখলাম। নার্ভ নাকি বেশি উত্তেজিত হলে, উচ্চকক্ষে 'ইন্‌হিবিশন' প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। ডাক্তাররা বলেন প্যারাডক্সিকাল স্টেজ। স্বপ্ন দেখার স্টেজ। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। একবার জমিদার—বাবার (এমনিতে বাবা খুবই ভাল মানুষ ছিলেন) লাথি খেয়ে ৭ মাসের পোয়াতি মায়ের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। মা অজ্ঞান। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে রক্ত দেখে আমিও বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম—কোন এক অচেনা পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার সেই—না-জন্মানো ভাইটা আমাকে ডাকছে—"দাদা, আমাকে নিয়ে যা! আমাকে শকুনেরা খেয়ে ফেলল!" আমি ছুটছি তো ছুটছিই—বার বার রক্তে পিছলে পড়ছি···আবার ছুটছি···

"এই কমরেড! ওঠো ওঠো খাবার সময় হয়ে গেছে!" অশোকদার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তখনও হাঁফাচ্ছি। "কী হল! অমন করছো কেন?" অশোকদার প্রশ্নে ম্লান হেসে বললাম—"একটু জল দেবে।"

শুধুই গ্লানি

যে হলঘরটায় আমার শয্যা, তার পশ্চিম বরাবর একশ পা দূরে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। লক আপ না খুলে ওপর থেকে নিচে নামার ব্যবস্থা। বিশাল ঘর। এক একটা কুট-কুটে কম্বলকে চার ভাঁজ করে আসন পাতা হয়েছে। বাইরে দিয়ে খোলা ড্রেন। ড্রেন থেকে ফিনাইল ব্লিচিং-এর উগ্র ঝাঁঝ এসে নাকে আঘাত করল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের গ্লাস হাতে করে নেমে এসেছেন। হাফ-প্যান্ট

পরা কালো ষণ্ডা গুণ্ডা একটা ছেলে আসনে বসতে না বসতেই গ্লাসে জল দিয়ে গেল। আমার একপাশে রাধানাথদা আর একপাশে সতীশদা। স্বপ্নের রেশ তখনও কাটেনি। কলাই-করা থালাতে ৬ খানা সাদা ধবধবে রুটি, পর পর বাটিতে সাজানো তরকারি। প্রথম দিনের খানা বলেই আজও স্মৃতিতে অম্লান। একটা বাটিতে পটলের দোরমা, একটাতে ডাল-চিংড়ি, শেষ বাটিতে মাংস। ঘি-গরম মসলার গন্ধে 'স্যালাইভা' নিঃসরণ বেড়ে গেলেও খেতে ইচ্ছা করছিল না। পর পর সাতজন সাতজন মুখোমুখি বসে। বেশির ভাগ কমরেডকেই দেখলাম, রাধানাথদাকে তো বটেই—গ্লাস থেকে জল নিয়ে থালার চারপাশে ছিটিয়ে তর্পণ করলেন, বা অর্পণ করলেন তাঁরাই জানেন। আপনা আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "হিন্দু কমিউ-নিস্ট"। আজ যখন অশোক রুদ্র কিংবা দেবু মুখুজ্যে পাঞ্জাবে হিন্দু মরছে বলে কান্নাকাটি করে তখন বুঝতে দেরি হয় না—এঁরা সেই ট্র্যাডিশন বয়ে চলেছেন। স্বগতোক্তিটা সোচ্চার হয়ে গিয়েছিল—ঈষৎ সোচ্চার! সতীশদা চিমটি কাটলেন, রাধানাথদাকে বললাম—"তাহলে আমিই বা বিসমিল্লা বলে শুরু করি না কেন?" উনি শুনলেন কি না বুঝতে পারলাম না। আওয়াজ উঠল থ্রি চিয়ার্স ফর অশোক বসু! পরে ব্যাপারটা বুঝলাম, ১৩ জন কমরেডের তিনজন করে এক একটা গ্রুপ করে এক সপ্তাহ রান্না করানোর দায়িত্ব পালন করেন। প্রশান্তদা অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত! রান্না তো করে ফালতুরা—এঁরা তদারকি করেন। ফালতু মানে—কম সাজা-প্রাপ্তরা। বন্দী বা ক্রিমিনাল কেসের বিচারাধীন বন্দী। এঁদের স্বদেশী বাবুদের চাকর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এ তো জেল খাটা নয়। এ যে জেল-উপভোগ করা। কোথায় খাটুনির-খাটুনি সেরা খাটুনি জেল খাটতে এলাম—তা নয় এ যে জেল উপভোগ করতে শুরু করলাম। তা হলে আর বাড়ি কী দোষ করেছিল। খেতে খেতেই সতীশদা জেলের নিয়মগুলো জানিয়ে দিলেন। প্রতি পাঁচজনে একটা করে খবরের কাগজ, অতিরিক্ত হলে একটা বেশি। অর্থাৎ আমি আসাতে কাগজের সংখ্যা বাড়বে না। আর একজন এলে একটা কাগজ বাড়ত। তিনজন পিছু একজন ফালতু—ফাইফরমাস খাটার জন্য। যত শুনি চোখ ছানাবড়া।

সত্যিই রীতিমত ডিনার। খেতে বসে বুঝলাম কেন সতীশদা 'ডিনার' কথাটা অমন ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করেছিলেন। ভোজন-পর্ব শেষ করে ওপরে উঠে দেখি একজন ফালতু মশারি টাঙাচ্ছে। নিষেধ করলাম, সতীশদা বললেন—"ভীষণ মশা ঘুমুতে পারবে না!" "মশারির মধ্যে শুলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে," আজও সেই অভ্যাস আছে। "ঠিক আছে টাঙানো থাক, যদি প্রয়োজন হয় ফেলে দিও।" সতীশদার উত্তর। "তা ও টাঙাবে কেন? আমি পারি না?" আমার প্রশ্নে ম্লান

হেসে বৃদ্ধের উত্তর "তুমি এখন বাবু, পেছনে সুড় সুড় করলে হাঁক দিতে পার এই ফালতু চিমটি দিয়ে পেছনের গুঁড়ো কৃমিগুলো বার করে দাও।" বৃদ্ধের হেঁয়ালি-ভরা প্রত্যেকটা কথাতেই যেন কিসের একটা গন্ধ। অব্যক্ত বিদ্রোহের কি? কিছু করতে না-পারার ক্ষোভ।

আমার বিছানাতেই গ্লাসটা হাতে নিয়ে উনি বসলেন, "বুঝলে তা বলে আবার সব সমান করে ফেল না। কমরেডলি ফিলিংস জিনিসটা একটা উন্নত স্তরের মানবতা বোধ! এই বোধই তোমাকে মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, সেটা কম বেশি প্রত্যেকেরই থাকে। আমরা দ্রুত এগুলো ভুলে যেতে বসেছি! শোন তবে একটা গল্প। আমরা তখন আন্দামানে কালাপানি খাটছি। একদিন এক ব্যাটা নাপিত—কনভিক্ট চুল কাটতে এল। চুল কাটতে কাটতে সে হঠাৎ বলল—'স্বদেশীবাবু! আপ ভি স্বদেশী হ্যায়! হাম ভি স্বদেশী হ্যায়' চমকে উঠলাম। হতেই পারে। আমাদের কত কমরেড কীভাবে রয়েছে জানব কী করে? জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমহারা কেয়া কেস?' ব্যাটা উত্তর দিল 'আপ সাহেব কো খুন করকে আয়া, আর হাম এক মেম কো রেপ (সে অবশ্য 'চ' কারান্ত দিয়েই বলেছিল) করকে মার্ডার কর দিয়া!' হো হো করে হেসে উঠলাম। বুঝলে স্তালিন আর ক্রুশ্চভের ফারাক কোথায়? তোম ভি স্বদেশী! হাম ভি স্বদেশী!" স্তালিন আর ক্রুশ্চভের ফারাক বোঝানোর জন্যই কি গল্প? না, এর মধ্য দিয়ে কোন এক সমত্ব-বাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ইঙ্গিত দিলেন সতীশদা।

জানালা দিয়ে মাঠটা দেখা যাচ্ছে, পুকুরে জলের ঢেউ, "পুকুরের পাড় দিয়ে পুব মুখে হেঁটে গেলে পাবে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেল। পশ্চিমমুখো সাত পা বাই সাত পা মাপের ঘর। কোন জানালা নেই। গরমের সময় কংক্রিটের দেওয়ালের ভাপ এসে তোমাকে আধা-সেদ্ধ করে দেবে। আগে ব্রিটিশ আমলে আমাদের ওখানে ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে রাখা হত। মোটা চটের প্যান্ট জামা! তখনও আমরা স্বদেশীবাবু ছিলাম ঠিকই কিন্তু সকলের সঙ্গে কেমন যেন একটা আত্মীয়তা ছিল। কেমন যেন একটা একাত্মতা বোধ করতাম···" বয়সের দোষ, বৃদ্ধরা অতীতের মধ্যেই বাস করতে ভালবাসেন। যে লোকটা দেশ এবং পার্টির জন্য সব দিয়েছে, যাঁর কোন সামাজিক জীবনই গড়ে ওঠেনি, অথবা গড়ে ওঠা সামাজিক জীবনকে তুচ্ছ করে, কিংবা ধ্বংস করে আজ নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ! অতীতই তো তাঁকে বেঁচে থাকার যুক্তি সরবরাহ করে। কারণ ইনি ক্রান্তিদর্শী, বয়স এঁকে শিখিয়েছে ইনি যাঁদের 'অন্নদাস' বলে নিজেকে মনে করছেন এরা কেউই সেই গৌরবময় অতীতের ঐতিহ্যবাহী নয়। অতীতকে পুঁজি করে বর্তমানকে ভোগ করার দর্শনেই এরা

বিশ্বাসী। কেমন হবে না জানা ভবিষ্যতের জন্য এরা মোটেই বর্তমানের সামান্যতম ইন্দ্রিয়সুখকে বিসর্জন দিতে রাজি নন। সমগ্র পার্টিটাকেই এরা সে দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি জীবন্ত-ইতিহাস ইনি। ইতিহাস মানে তো শুধু ইতি কথার বৃত্তান্ত নয়। কিংবা 'হিজ ম্যাজেস্টি স্টোরি' থেকেও হিস্ট্রি তৈরি হয়নি। সমষ্টি মানুষের অনুভূতিগুলো ব্যক্তি মানুষের মস্তিস্কে যে আঁচড় কাটে সেটাই তো ইতিহাস। পরে যখন ঐ চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলে থাকতে হয়েছে, কোঁড়ার পরিবর্তে দু-বেলা লাঠি পেটা খেয়েছি—গরমে মশায় রাতের পর রাত বসে কাটাতে হয়েছে। ডাণ্ডাবেড়ি জড়িয়ে পাকা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দাঁত ভেঙেছে—রক্তাক্ত হয়েছে সর্বাঙ্গ—বার বার মনে পড়ত সতীশদার কথা। থাক সেসব পরের কথা পরে হবে। বার্ধক্যের বোধহয় আর একটা দোষ (অথবা গুণ,) যে যৌবনের সঙ্গ চায়। যৌবন থেকে উত্তাপ পেয়ে নিজেকে উত্তপ্ত করতে চায়। যৌবনের ধর্ম আবার বৃদ্ধকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা! কিছু কিছু বৃদ্ধ থাকেন যাঁরা যুবককে বেঁধে ফেলতে পারেন। প্রত্যেকেই শোবার ধান্দা করছেন। সতীশদা বলে চলেছেন—"দেখ, রাত্রে ভয় পেও না। দু-ঘণ্টা পর পর সিপাহী বদলির সময় তালা টানার আওয়াজ পাবে। আর ওরা হাঁক দেবে। এই যে এখানে যাদের জামার কাঁধে কালো ফিতে আছে এদের বলে কালো-বিল্লা, আসলে 'এন-ডব্লু', নাইট ওয়াচ-ম্যান। এরা কনভিক্ট। কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকলে ছ'মাস পরে যে কোন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী 'এন-ডব্লু' হতে পারে। এদের কোন কাজ করতে হয় না। রাত্রে চার ঘণ্টা করে জেগে থাকতে হয়। আর ঐ দেখছ—বেল্টওয়ালা ও হল 'কনভিক্ট ওভারসীয়র'-মেট। এদের থেকে সাবধান থাকবে। তোমার নামে যা-সব রটেছে। তোমার ওপর এখন ডবল ওয়াচ! একদিকে কর্তৃপক্ষের অন্যদিকে······" বলে পাশের ঘরের দিকে চোখ টিপলেন। "সেয়ানাকে লিয়ে ইশারা কাফি" বুঝলে—

"কম খানা/গম খানা/দম খানা/তব কাটে গা জেল খানা", অর্থাৎ কম খাও, শোক হজম কর, তোমার দুঃখ যেন ভুলেও অন্যলোক জানতে না পারে, মনের কথা মনে রেখ। ওঃ এ সব কথা পরবর্তী জীবনে আমার প্যাথলজিই হয়ে গিয়েছিল। "নাও, শুয়ে পড়! ক্লান্ত, তুমি ঝিমুচ্ছ!" লজ্জা পেয়ে গেলাম। বৃদ্ধ গুন গুন করে সুর ভাঁজছেন—"ভেদী ভেদ্ না খুল না পায়ে/চা'য়ে জান যায়ে/ইয়া জান রয়ে/ভেদ না খুল না পা-য়ে···ফাটে শির টুটে দিল/ইয়া লহুকা লহর বহে/ভেদী ভেদ্ না খুল না পা-য়ে" চুক্তিকারী, চুক্তি ভঙ্গ কর না। প্রাণ থাক/কিংবা যাক চুক্তি যেন না ভাঙে/ভাঙে যদি মাথা কিংবা কলজে/যদি রক্তের নদীও বয়ে যায়/চুক্তি ভেঙ না! হায় দায়বদ্ধ মানুষ!

২

পরে সাতের দশকে সতীশদার স্মৃতিধন্য চুয়াল্লিশ ডিগ্রী সেলের (চুয়াল্লিশটা ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথম ২২টা—তাই এই অংশের নাম পয়লা বাইশ, তারপর ছ-ফুট পাঁচিল দিয়ে পৃথক আরও বাইশটা তার নাম তেইশ চুয়াল্লিশ। ইংরেজী এল প্যাটার্ন। প্রথম বাইশটা পশ্চিমমুখো, দ্বিতীয় অংশ উত্তরমুখো। বাস্তুবিদ্যার শ্লোকে আছে—পুবমুখো ঘর ঘরের রাজা/দক্ষিণমুখো তারই প্রজা/পশ্চিমমুখো ভীষণ তাপ/উত্তোর মুখো বাপরে বাপ!) একটা ঘরে বসে যে দিন খবরের কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যেখানে সিনেমা বিজ্ঞাপন থাকে তাদের মাঝখানে ছোট পাঁচ লাইনের একটা খবর 'বিশিষ্ট সি পি এম নেতা সতীশ পাকড়াশী মৃত'—খবরটা পড়লাম পাগলের মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। একজন সি পি এম নেতার মৃত্যুতে আমাকে এমনভাবে কাঁদতে দেখে আমার সেদিনের কমরেডদের অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, কেউ কেউ ব্যঙ্গ করেছিলেন, কেউ বা বললেন—"উদারতাবাদের তিন নম্বর!" তাঁদের ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করিনি। মাথার ভেতর গুঞ্জন—'শির ফাটে/ইয়া দিল টুটে/ভেদ না—খোল না পায়ে।' সত্তরের প্রথমদিকেই শুনেছিলাম উনি প্রায় অর্ধ পাগল (!) অবস্থায় উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন। ওঁর পার্টি ওঁকে পছন্দ করছে না। কারণ প্রমোদবাবুর নকশাল নিধন পরিকল্পনা উনি ফাঁস করে দিয়েছেন বলে পার্টি মনে করে। বর্তমান এম এল এ, বিপ্লবদার স্ত্রী আরতিদিকে উনি ভীষণ স্নেহ করতেন, ওঁরা তখন বিলেতে। আরতিদির প্রশংসা শুনলে ওঁকে খেপাতাম—"তবে আর কি! আপনার আরতি—বিপ্লব ফিরে এলেই পলিটব্যুরোতে ঢুকে যাবে দেখবেন। 'বিলেতী কমনিস্' পলিটব্যুরো ছাড়া জায়গা হয়?" আরতি-বিপ্লবের নামে কিছু বললে বুড়ো অসহিষ্ণু হয়ে পড়ত। আজ আরতি দাশগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, 'আরতিদি, ছাত্রফ্রণ্টে যোশী লাইনের প্রবক্তা, ভিড়ে দলে-ভেড়া একজনের নামে যখন অমুক ভবন, তমুক-লাইব্রেরি হয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ এই বৃদ্ধের স্মৃতিরক্ষার জন্য কি ব্যক্তিগতভাবে আপনার বা আপনার স্বামীর কিছুই করার নেই? আপনাকে চিনি না, কিন্তু আপনার স্বামীকে চিনি—তাই এই জিজ্ঞাসা!'

সতীশদা! অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা, বৃটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের অন্যতম নায়ক। কালাপানিতে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের একটা বিরাট অংশকে কমিউনিজম এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী করে তুলে কমিউনিস্ট সেল গঠন, জনযুদ্ধের যুগে পিপলস-রিলিফ সোসাইটির (পি-আর-সি) প্রতিষ্ঠাতা, চরম দুর্দিনে পি-আর-সি'র সেই অবদান আজও গল্প কথা। উদ্বাস্তু আন্দোলনের সংগঠক। কত বলব, না

সতীশদা, তোমাকে নিয়ে কোন তথ্য বিভাগ, কোন ডকুমেন্টারি করবে না। করলে বোধহয়—তোমাকে চরম অপমানই করা হবে। কারণ তুমি ছিলে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। তুমি ডিপ্লোম্যাসি জানতে না। জানতে না দ্বিচারী বৃত্তি (ডাবল ডিলিং) এটা সেদিন জেলখানাতেই বুঝেছিলাম। যেদিন দেখেছিলাম এক প্রাজ্ঞ নেতার (বর্তমানে এম-পি) উস্কানিতে তোমার হাঁটুর বয়সী এক তরুণ (ভিড় দেখে দলে আসা, বর্তমানে ডাকসাইটে মন্ত্রী) তোমার তলপেট লক্ষ্য করে লাথি (আক্ষরিক অর্থে) ছুঁড়েছিল—মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে পড়ায়—সে লাথি তোমাকে লাগেনি, লেগেছিল আমার গায়ে। লাথি খেয়ে মুখ দিয়ে তোমার বলা কথাগুলোই বেরিয়ে এসেছিল—'তুম ভি স্বদেশী—হাম ভি স্বদেশী!' সতীশ পাকড়াশীরও এক ভোট, ওরও এক ভোট, প্লাস নেতার স্নেহ! উৎপল দত্ত দেখেননি সে দৃশ্য? আজ কবরে এক-পা বাড়িয়ে তাই ভাবছি 'খুনী কে?'

একটা ২০ বছরের ছেলে পরিবার-পরিজনের স্নেহ মমতার ছত্রছায়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে এসেছে। তাকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সব থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের, পরবর্তীকালে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের সব থেকে অভিজ্ঞ, সব থেকে নির্যাতিত লোকটা। সেদিন কি জানতেন—তিনি যে বীজ ফেলছেন তা একদিন জেলের ইতিহাসই পাল্টে দেবে। আমি গর্ব করতেই পারি—আমি ভারতীয় বিপ্লবের দুই মহান ব্যক্তিত্বের এক মিলন দৃশ্যের সাক্ষী। শুধু সাক্ষী নই, কিছুটা পরিমাণে ঘটকের কাজও করেছিলাম বটে! চারু মজুমদার আর সতীশ পাকড়াশীর সে মিলন দৃশ্য, সে কথোপকথনের কোন নথিবদ্ধ নোট নেই—কিন্তু আজও আমি বেঁচে আছি! অশীতিপর বৃদ্ধ সতীশদা ব্যাকুলভাবে চারুদাকে প্রশ্ন করেছিলেন (তখনও তিনি শ্রদ্ধেয় নেতা হয়ে যাননি)—"আমি কী করব বল?" সবিনয়ে চারুদা (যিনি কাটা কাটা কথা বলতেই অভ্যস্ত) বললেন—"আপনার এই বয়সে, এই শরীরে আপনার দায়িত্ব আমরা নেওয়া মানে আপনাকে খুন করা। এখনও আমরা এত শক্তি অর্জন করিনি যে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারব। আপনার পায়ের তলায় বসেই তো রাজনীতির পাঠ নিয়েছি। আপনি দেখুন না আমরা কী করি? আপনি ওদের মধ্যে থেকেই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।" চারুদার মুখে 'আশীর্বাদ', 'পায়ের তলা' শব্দগুলো শুনে চমকে উঠেছিলাম, আজও সে চমক ভাঙেনি! দু-চোখ ভর্তি জল নিয়ে সেদিন বৃদ্ধ বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন ভাবেই হোক এ সাক্ষাৎকারের খবর প্রমোদবাবু পেয়ে যান। তারপর থেকেই তাঁর ভাগে-জামাই পরিচয় দিয়ে যে লোকটা—কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র করে

খাচ্ছিল—তার ঘরে সতীশদাকে পাগল সাজিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। প্রায় না খেতে পেয়ে তিনি মারা গেলেন! সেদিন চারুদার উদ্দেশ্যে সতীশদার বলা কথা-গুলো আজও প্রাসঙ্গিক। "ত্যাখো, প্রমোদবাবু ক্যাডারদের ধরে রাখার জন্য ওদের পার্টিকে রেজিমেণ্টেড করে তুলতে চাইছেন। প্রত্যেকটা লোকাল কমিটিতেই বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। কণ্ট্রোল-কমিশনে রোজ রিপোর্ট আসছে। ওরা পরিকল্পনা করছে মারামারি বাধাবার। একবার যদি মারামারি বাধিয়ে দিতে পারে তখন ওদের স্লোগান হবে—'পার্টি আক্রান্ত', ফলে আদর্শগত বিদ্রোহ চাপা পড়ে যাবে। পার্টিটা রেজিমেণ্টেড হয়ে যাবে। ওরা প্রভোকেশন দেবে, তোমাদের ছেলেদের তাতে পা দিতে বারণ করো, এমনকি ওরা যদি দু-একটা খুনগুমও করে (আজিজুল—শৈবালের খুন হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি) উত্তেজিত হয়ো না। দিন তোমাদের। বিপ্লব মানে—বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ধৈর্যের সমন্বয়।" প্রচারযন্ত্র-গুলো ওদের হাতে থাকায়—সকলেই জানে সি পি এম-নকশাল মারামারির জন্য আমরাই দায়ী, কিন্তু এটা যে কত বড় মিথ্যা, এ ছক যে '৬৯ সালেই প্রমোদবাবু কষেছিলেন—সেটা আজ না হোক একশ বছর পর হলেও প্রকাশিত হবে। যাদব-পুরে আমাদের এক কমরেডকে খুন করে এটা শুরু হয়। তখনও ছাত্র যুবকদের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য পুরো যাদবপুর অঞ্চল থেকে রাজনীতিগত-ভাবে সি পি এমকে মুছে দিতে পেরেছিলাম। তারপর ওরা মিছিলে বোমা মেরে সমীরকে খুন করে। তখন আর যুবক সম্প্রদায় আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। চলে গেছে এমন একজন লোকের হাতে অতুল্য ঘোষের বাড়িতে যার শেলটার! ('কষ্ট-কল্পিত', দেখুন!) প্রমোদবাবু-অতুল্য-পরিকল্পনার ফল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা! সরোজদা কিংবা চারুদা কারুরই কিছু করার ছিল না। যাক, সে সব তো আজকের কথা। প্রথম প্রেমের মত প্রথম-জেল-রাত কাটানোর আশঙ্কা নেই এতে।

সতীশদার কাছ থেকে জেলের প্রথম পাঠ নিতে নিতেই (ফাঁকিবাজ ছাত্র যেমন পড়তে বসলেই ঘুম ধরে) ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুম, নিঁদ না-জানে-তাকিয়া। ভুখ না-মানে সালুন! ঘুম যদি সত্যি আসে বালিশ বিছানার খোঁজ সে করে না। খিদে যদি সত্যি থাকে তরকারির স্বাদের বিচার তার কাছে তুচ্ছ। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল 'এই প্লা···হা···রা!' ভেতর থেকে আওয়াজ 'চৌদাবন্দী, ছ ফালতু, এক মেট, চৌদা খাট, চৌদা টেবিল···সব ঠিক হ্যায় হোঁজুর!' এক নিঃশ্বাসে ভেতরের পাহারা বাইরের পাহারাদার সিপাহীকে সব হিসাব দিয়ে দিল।" বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে যাবার জন্য বুকের ভেতরটা হাতুড়ি পেটা করছে। জল খেতে গিয়ে কিসে যেন হাত ঠেকে গেল! দেখলাম কে কখন মশারিটা ফেলে

গুঁজে দিয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে টান মেরে মশারিটা ছিঁড়ে ফেললাম— । 'যত্ত সব আদিখ্যেতা !' জল খেয়ে আর ঘুম আসতে চাইছে না, রাতও শেষ হয়ে আসছে । স্বপ্ন দেখার ঘুম । সেই বীভৎস স্বপ্নটা আবার দেখলাম । রক্তে ভেসে যাচ্ছে মা । পাহাড়ের চূড়া থেকে শিশুকণ্ঠের চিৎকার 'দাদা আমাকে নিয়ে যা । শকুনে খেয়ে ফেলল যে···' বাকি জীবন ধরে শুধু এই একটাই স্বপ্ন দেখে গেলাম । আমার না-জন্মানো ভাইটাকে শকুনেরা খুবলে খাচ্ছে । আমি হোঁচট খাচ্ছি । এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল ।

এক গাল হেসে সতীশদা এসে হাজির, "তুমিও দেখছি আমার মত আর্লি-রাইজার । কলকাতার বাবু-কলচার এখনও তোমাকে গ্রাস করেনি দেখছি ।··· তবে যে বললে মশারির মধ্যে তুমি ঘুমুতে পার না ।" তখনও দুঃস্বপ্নের রেশটা কাটেনি । ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—"এরই জন্য তো আজেবাজে স্বপ্ন দেখলাম !"

বৃদ্ধ হতবাক ।

প্রথম দিন

'বাবু চা' এই ভোরে জেলখানাতে বেড-টি ! অবাকের পর অবাক । মনে পড়ল নির্মলটা এখন কী করছে । অসিতের কি সারাদিনের খাওয়ার পয়সা জুটবে ? কাগজের এই সংখ্যাটা তো আমিই ঠিক করে দিয়েছি । ওটা কি ওরা ঠিক সময়ে পেমেণ্ট দিয়ে বার করতে পারবে ? আমার গ্লাসে চা-টা ধরে, সতীশদা বললেন "খেয়ে নাও" । উনি পাশের ঘরে গেলেন নিজের গ্লাসটা আনতে । ফালতুর 'বাবু-চা' চিৎকারে জেলের পলিটিকাল বাবুরা জাগছেন, ঘুমিয়ে থাকা বিপ্লবীদের খোঁয়াড়ি কাটানোর চমৎকার ব্যবস্থা ! সতীশদার পরেই প্রশান্ত দা (শূর) চায়ের গ্লাস হাতে এসে হাজির—"কি কেমন ঘুম হল !" বললাম 'ফাইন', অশোকদার মুদ্রা-দোষ এটা, সব কথাতেই 'ফাইন' । "তুমি এসেই ধরে ফেলেছ দেখছি অশোককে ।" মুখে আটকে গেল সত্যি কথাটা "আপনার অনেক আগে থেকেই ওঁকে চিনি ।" প্রশান্তদা বললেন—"সতীশদা, আপনি আজিজুলকে নিয়ে একটু ঘুরে জেলটা দেখিয়ে আসুন" । সেদিনের প্রশান্তদাকে যেমন দেখেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল পার্টি নেতা হবার চেয়ে বাড়ির গার্জেন হবার গুণাবলীই ছিল ওঁর বেশি । নিখাদ অপত্যস্নেহ । কিছু মূল্যবোধের মর্যাদা দিতেন—মধু বাগ (মুর্শিদাবাদের), জীবনদের মত আড়ি-পাতার মেয়েলী স্বভাব ওঁর ছিল না । বরং তাকে ঘৃণাই করতেন । সাধারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকে শ্রদ্ধা করতেন । তবে ভীষণ

চেঁচামেচি করতেন। সমস্যা না থাকলেও সমস্যা তৈরি করে নিতে ওস্তাদ! আমি হলফ করে বলতে পারি প্রশান্তদার জায়গায় যদি প্রমোদবাবু বা অন্য কেউ থাকতেন কিছুতেই সতীশদাকে দায়িত্ব দিতেন না—আমাকে শিক্ষিত করে তোলার। সরকারি দায়িত্ব সতীশদা পেলেন। মনে মনে আমিও খুব খুশি! সতীশদা কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা। ফুট চারেক চওড়া হবে, রাস্তার উল্টো দিকে একটা চৌবাচ্চা। জল পড়ছে। চৌবাচ্চার থেকে কয়েক পা দূরে অ্যাসবেসটসের ছাউনি দেওয়া টানা ঘর। ওপরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ওঠা দেখেই বোঝা যায় এটা রান্নাঘর। পলিটিকাল চৌকা। উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম এক ফালি ফাঁকা জমি। একটা গঙ্গা-জলের চৌবাচ্চা, তিন সারি পায়খানা। দু-হাজার বাসিন্দার মধ্যে এই চোদ্দজনের জন্য ১০টা স্যানিটারি পায়খানা। কমরেডরা আমি আসার আগে লড়াই করে বানিয়েছেন। বাকি মানুষগুলোকে খোলা ড্রেনে আধখানা শরীর দৃশ্যমান রেখে প্রাতঃকৃত্য সারতে হয়। একটা পায়খানা ঘরে চাবি তালা দেখে সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করলাম। উনি লজ্জা পেয়ে গেলেন। "আমার তো বয়স হয়েছে। যখন তখন পায়খানা পেয়ে যায়। এখন সমস্ত সিস্টেমটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। একটু দেরি হলে কাপড় নষ্ট হয়···তাই প্রশান্তবাবু এই ঘরে চাবি লাগিয়ে এটা আমার কাছে দিয়ে রেখেছেন।" আজ বুঝতে পারছি কেন সতীশদার ঐ অবস্থা হয়েছিল। এই 'চাবি'র দাবি নিয়েই সতীশদাকে লাথি মারতে গিয়েছিলেন বর্তমানের এক মন্ত্রী। পেছনে মদত এক প্রাজ্ঞ নেতার! সতীশদা পায়খানায় ঢুকলেন। আমি মাঠ পেরিয়ে কিচেন অর্থাৎ চৌকাতে এলাম, বিশাল তিনটে উনুনের মধ্যে দুটোতে আঁচ পড়েছে, একটাতে নেট লাগিয়ে টোস্ট তৈরি হচ্ছে। পাশে টিনের একটা ঝাঁঝরি মত পাত্রে কিছু ছোলা-সেদ্ধ। এক 'ফালতু'কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কী?" "আমাদের, চোরেদের নাস্তা।" এক মুঠো ছোলা হাতে তুলে নিলাম। তিনটে ভাল ছোলা বেরল বাকি সব পোকা খাওয়া। ইতিমধ্যে কে একজন কমরেড পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে বললাম—"এরা এগুলো খায়?" তিনি বললেন—"না, এরা আমাদের সাথে খায়।" আমার প্রশ্ন সেটা নয়। এখানে তো ন/দশ জন, বাকিরা? বাকি দু হাজার মানুষ এই মনুষ্যেতর জীবেরও অখাদ্য খাবার খান? উনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। "লুম্পেনদের জন্য অত ভাবনাচিন্তা ভাল নয়।" সে দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জেলে যদি আবার আসতে হয়, যদি কিছু করি তো এই 'লুম্পেনগুলোর' জন্যই করব। জেলের জামাইদের জন্য বলার অনেক লোক আছে।

অদৃশ্যে কেউ হয়ত সেদিন সেটা 'অ্যাপ্রুভ' করেছিলেন। তাই বাকি জেল-জীবনে যতবার লড়েছি, এদের জন্যই লড়েছি। কে তিনি? পেছন ফিরে দেখি সতীশদা, হাতে সাবান ঘষছেন। "বুঝলে, আমরাও এসব খেতাম! সে এক দিন! সে এক মেজাজ ছিল! খাবার বয়কট করতাম, মার খেতাম, খাবার পাল্টাত, বল তো, যার লড়াই সে লড়বে—এ তত্ত্ব যেমন ঠিক, তেমনই বেঠিক এর একপেশে প্রয়োগ। যার লড়াই সেই যদি লড়তে পারত—তা হলে কমিউনিস্ট পার্টির দরকার কী ছিল? নির্যাতিতরা যেখানে ভীত সন্ত্রস্ত সেখানে তো আমাদেরই লড়ে দেখাতে হবে—লড়াই করা যায়! এখন বুড়ো হয়েছি। আর পারি না চল।" শুধু বীজ বপন নয়। এক তরুণ হৃদয়ে বৃদ্ধ বোনা-বীজটাতে জল ছেটাতে শুরু করলেন। যাতে সেটা অঙ্কুরিত হতে পারে।

২

যে দিক দিয়ে জেলে ঢুকেছিলাম তার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে জেল ঘুরতে বেরুলাম। প্রথম গেট পার হয়েই চিৎকার করে উঠলাম। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। সিমেন্টের রাস্তার ওপর উলঙ্গ কতকগুলো লোক উবু হয়ে জোড়ায় জোড়ায় বসে, একজন মেট বেল্ট—জেলের ভাষায় যাকে বলে 'পেটি'—দিয়ে তাদের চাবকাচ্ছে। বিশাল চৌবাচ্চাতে দু-জন জওয়ান হাত-পা বেঁধে একজনকে চোবাচ্ছে। কাঁধের উপর সাদা দাগ কাটা একজন সিপাহী জমাদার গুনে চলেছে "দো-চার-ছ··· পঁচাশ···দো তিপান···আরে শালা···এক আদমি বাড় গিয়া কেইসে রে।" মেট করজোড়ে এগিয়ে এসে বলল, "হুজৌর (হুজুর), পঁচাশ-দো তেপান নেহি: বাহান"। "শালা মাদার···হামকো হিসাব শেখলাতা হ্যায়··· ।"

মেট করজোড়ে বলল—"হাঁ হৌজুর!" কোনটা যে 'হাঁ' বুঝলাম না। জমাদার একটা খাতায় সংখ্যা লিখে নিলেন। সতীশদাকে বললাম—"সতীশদা, এ কোন জগতে এলাম! এ অসহ্য!" অভিজ্ঞ বৃদ্ধ হাসলেন, "জানি—অসহ্য, অমানবিক! তোমাদের পাল্টাতে হবে।" এরা পাগল, সামাজিক-নুইসেন্স, তাই সমাজ এদের জেলে পাঠিয়েছে। আর এই যে জোড়ায় জোড়ায় উবু হয়ে বসে থাকা একে বলে 'গিনতি' (গুনতি)। জেলের সব থেকে বড় কাজ 'গিনতি' ঠিক রাখা। ৪ বার 'গিনতি' হয়। আবার প্রত্যেক ব্লককেও ফাইল বলা হয়। এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে—বিনা মেট পাহারায় কেউ যেতে পারে না। সেটা জেল-কোডে অপরাধ। 'ব্রেকিং-ফাইল।' আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। মনুষ্যত্বের এ অপমান—দিন এলে এর প্রতিশোধ নেবই। ইতিমধ্যেই ভেতরের একটা গেট

পেরিয়ে আমরা খেলার মাঠে ঢুকে পড়েছি। কে একজন সতীশদাকে নমস্কার করল—"নমস্কার দাদা!" দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে সতীশদা নমস্কার করলেন। মুখে বললেন, "কি রে টিংবাজ! কেমন আছিস! আর ওসব করবি না তো?" টিং-বাজ মানে পকেটমার। জেলের ভাষাতে কতরকম 'বাজ'ই না আছে। যেমন রাম-রাজ বাইরে চলেছে তাতে 'বাজ'দের ছড়াছড়ি! গাম্বাবাজ—যারা তালা ভেঙে চুরি করে। ঢোলবাজ—মুটে সেজে মাল ঘুরিয়ে দেওয়া বা ট্রেনের বাঙ্ক থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে চম্পট দেওয়া। 'পড়ি-বাজ'—স্টেশনে ওয়েটিং রুমে আপনার পাশে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা, তারপর আপনার অসতর্ক মুহূর্তে মাল নিয়ে হাওয়া। সব থেকে খারাপ 'লাল টোপী' অর্থাৎ রেপ কেসের আসামী। তারপর গরু চুরির কেস, চোরেদের জগতে এরা চরম অস্পৃশ্য। বেশ বড় মাঠ, দুই প্রান্তে গোল পোস্ট দেখেই বোঝা যায় ফুটবল খেলা হয়। মাঠটা আড়াআড়ি পার হলে বাঁধানো ঘাট। বসার ব্লক আছে। ঘাটের এক ধারে একটা কদম গাছ। বেশ লাগল। আমরা কোনাকুনি মাঠটা পার হলাম। এবার রাস্তা খোয়া বিছানো। সতীশদা চেনাতে চেনাতে চলেছেন—"এটা ওয়েলফেয়ার অফিস!" আমি হেসে বললাম—"যেমন গ্রামের দিকে যিনি সমস্ত ডেভেলপমেণ্ট ব্লক করে দেন তার নাম ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার। সমস্ত স্বকুমার বৃত্তিকে ফেয়ার ওয়েল দিতে পারেন যিনি তিনিই এই দেশে ওয়েলফেয়ার অফিসার।" মোরামের রাস্তাটা যেখানে চওড়া হয়ে মূল রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেখানে একটা ছোটখাটো ফুলের বাগান। রেলিঙ দিয়ে ঘেরা অরবিন্দ ঘোষের মূর্তি। বৃদ্ধ বললেন "চিনতে পারছ?" বললাম, "নজরুলের 'ধূমকেতু'তে বাণী পাঠাতে গিয়ে যাঁর কথা মাথায় রেখে বারীন ঘোষ বলেছিলেন—'তোমার ধুমকেতু সমস্ত মেকি দেশ প্রেমিকদের দাড়ি-গোঁফ জ্বালিয়ে দিক।' ইনিই—তিনি তো!" বৃদ্ধ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোধহয় প্রাক্তন নেতা সম্পর্কে আমার মন্তব্যটা ওনার পছন্দ হল না। "দ্যাখো, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কোনদিনই আমাদের মূল্যায়ন করতে পারল না। যেমন রাশিয়ায় লেনিন নিহিলিজমের মূল্যায়ন করলেন, নারোদনিক-দের মূল্যায়ন করলেন—তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁদের দিলেন, আবার নতুন পথও বাতলালেন—সেটা এদেশে হয়নি। এরা শুধুই আমাদের ব্যবহার করে গেল। তাই এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে হয় নারোদনিক মতবাদ, না হয় আত্ম-সমর্পণবাদ ঘুরে ফিরে আসবে। আসতে বাধ্য। ইতিহাসকে নাকচ করার অর্থ ইতিহাসের হাস্যকর পুনরাবৃত্তি করা! 'এগুলো তোমরা করো'।" সেই তখন থেকে বুড়ো যে 'তোমরা কর' 'তোমরা কর' শুরু করেছে—বিরক্তিকর। বিরক্তি চেপে

রাখতে পারলাম না, "সবই যদি আমরা করব তো পি সি-র কণ্ট্রোল কমিশনে আপনি আছেন কেন? আমাদের বসিয়ে দেন" নিজের অজান্তে বৃদ্ধের কোথায় আঘাত দিয়ে ফেললাম জানি না। উনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন, স্থির-চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—মাথা নীচু করে বললেন—"চল"। আজ পরিণত বয়সে সে চোখের ভাষা বুঝতে পারি। সেদিন পারিনি। সেদিনের যৌবন যে-ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল—আজ তার জন্য কার কাছে ক্ষমা চাইব?

দু জনেই চুপ। একটা ফাঁকা চাতাল। মেয়াদী চাদর ঢাকা একটা টেবিল আর বেতের বোনা একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর একাগাদা সাদা কার্ড। কিছু কোর্টের ওয়ারেণ্ট। চাতালে একটা ওজন যন্ত্র এবং উচ্চতা মাপার জন্য একটা দাগ দেওয়া কাঠের লম্বা স্ট্যাণ্ড। চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁকে চিনতে অসুবিধা হল না। ইনিই কাল সন্ধ্যাতে আমাকে রিসিভ করেছিলেন। 'জেলর বাবু'! জোড়ায় জোড়ায় উবু হয়ে কতগুলো লোক চাতালে বসে আছে। সতীশদাই নীরবতা ভাঙলেন—"'কেস টেবিল' কনভিক্টদের ভাষায়—'কেষ্ট-ফাইল'" সতীশদাকে দেখে জেলর নিজে উঠে এলেন। "কোথায় চললেন এই সাত সকালে!" জেলরের প্রশ্নের উত্তরে সতীশদা জানালেন—"একে একটু ফাঁসির মঞ্চটা আর অরবিন্দ সেলটা দেখিয়ে আনব। একজন জমাদার দেবেন নাকি?"

"কি যে বলেন সতীশদা! আপনি যত বছর জেল খেটেছেন তাতে শুধু জেল কেন, গোটা দেশটাই তো আপনার কেনা হয়েছে! আপনাকে দেখলে কেউ আটকাবে না!" একজন বন্দীর প্রতি, জেলরের এই শ্রদ্ধা, এটা কি কেবল মেকি, লোক দেখানো বিনয় ছিল?

আমার কিন্তু তা মনে হয় নি। কেস্-টেবিলের পাশেই দরজায় তালা বন্ধ একটা ব্লক দেখিয়ে সতীশদা বললেন—"এটাই চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেল!" কে জানত সেদিন, পরে জীবনের পাঁচটা বছর ওখানেই কাটাতে হবে।

একটা রেলিঙ গেট পার হলাম, আবার একটা ছোট অন্ধকার ঘুপচি ঘর। সামনে অরবিন্দ মূর্তি। ভেতরে একশ পাওয়ারের আলোতেও অন্ধকার কাটেনি। অরবিন্দ ঘোষকে এখানেই রাখা হয়েছিল, একটাই দরজা, তাও ঘন জাল দিয়ে আটকানো। সাধারণ দরজার মত নয়। কেউ এই সেলের কাছেপিঠে আসতে পারত না।

সেলটা দেখে অরবিন্দ ঘোষের ঋষি হবার রহস্যটা বুঝতে পারলাম। এরকম একটা সেলে যদি কোন মানুষকে বছরের পর বছর একা আটকে রাখা যায়, কোন

মানুষের সঙ্গে যদি তাঁকে কথা বলতে না দেওয়া হয়—তাঁর মন শতকরা একশ ভাগ অন্তর্মুখী হয়ে যেতে বাধ্য। এইরকম পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাঁর সমস্ত চিন্তা অতিবাস্তব কিছুতে কেন্দ্রীভূত করতেই হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার এছাড়া আর অন্য কোন উপায় এসব ক্ষেত্রে খোলা নেই। এই কেন্দ্রীভূত করার নামই মেডিটেশন। মেডিটেশনের অনিবার্য ফল হ্যালোসিনেশন (অমূলক প্রত্যক্ষ)। এটা মস্তিষ্কের একটা বিশেষ স্তর। হ্যালোসিনেশন আবার দু ভাগে বিভক্ত—অলীক দর্শন (ভিস্যুয়াল হ্যালোসিনেশন), অলীক শ্রবণ (অডিও-হ্যালোসিনেশন)। অরবিন্দ ঘোষের কৃষ্ণ দর্শনের রহস্য—তাঁর সেলটা দেখেই বুঝতে হবে। তাঁর লেখা পড়ে বোঝা যাবে না। 'ডিভাইন-লাইট' কোন ভণ্ডামি নয়। মানসিক রোগের প্রলাপোক্তি! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেটা কাজে লাগায়। 'অরবিন্দ ঘোষ ভণ্ড ছিলেন'—বারীন ঘোষের এই মতের সঙ্গে এক মত হতে পারলাম না! বরং বলা যায় সেলটা দেখে মতটা পাল্টালাম। ভণ্ড নয়—মানসিক রোগী। হ্যামলেটের পিতৃদর্শন কিংবা টেম্পেস্টের ভূতের মত ব্যাপার!

'অরবিন্দ সেল' এখন মন্দির। কত গল্পই না চালু আছে অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে। পাহারাদার সিপাহী দেখে এক অরবিন্দ সেলে বন্ধ আর একজন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'বিপ্লবী' অরবিন্দ প্রচারের দৌলতে ভগবানে রূপান্তরিত! ওখান থেকে আর সামনে না গিয়ে সতীশদা পেছনে ফিরলেন। একজন নমস্কার করল। সতীশদা পরিচয় করিয়ে দিলেন—জেল-স্কুলের মাস্টারমশায়!···

জেল-স্কুল শুনেই বাবার মুখ, বাচ্চা বয়সের দামালপনা সব মনে পড়ে। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কী রকম পড়ানো হয়? কী কী পড়ান?" মাস্টার রসিক ব্যক্তি। "এখানে?" বললাম—"হ্যাঁ।" "পকেটমারকে চোর বানাই। চোরকে ডাকাত, ডাকাতকে খুনে—আর খুনেকে···" বলে মাস্টার সতীশদার দিকে চেয়ে অনুমতি নেবার স্বরে জিজ্ঞাসা—"বলব সতীশদা?" উনি মাথা নাড়লেন। সতীশদার অনুমতি পেয়ে—

মাস্টার বলেই ফেলল, "খুনেকে মন্ত্রী বানিয়ে দিই আমি!" ওর বলার ঢঙে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম। "আমার স্কুলে না পড়লে মন্ত্রী হতে পারবে না বাবা!"

মাস্টারের কথা শুনতে শুনতেই স্কুলের পেছনে ফাঁসির মঞ্চের কাছে আমরা এসে গেছি।

গভীর কুয়োর মুখ দুটো ইস্পাতের পাত দিয়ে ঢাকা। সামনে লিভার। লিভারটা ধরে টানলেই পাত দুটো দুপাশে সরে যাবে। গলায় ফাঁস লাগানো

মানুষটা ঝুলতে থাকবে কুয়োর ভেতরে। পেছনে ফাঁসিকাঠ। লম্বালম্বি পোঁতা। মাথার ওপরে লোহার বালা। ওখান থেকেই দড়িটা শক্ত করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। শুনলাম—ফাঁসিকাঠটা কেবলমাত্র ফাঁসির আগের দিন রাত্রেই পোঁতা হয়। তাই শুধু ফাঁসির মঞ্চটাই দেখলাম।

এইরকম এক মঞ্চেই সত্যেন-কানাই জীবন দিয়েছেন। এই তো আমার বয়স যখন ৫ তখন জীবন দিলেন কায়ুরের কমরেডরা। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরি। সতীশদা যখন জামাটা ধরে টেনে তুলল বুঝতে পারলাম—"মঞ্চটাতে মাথা ঠেকিয়ে আমি প্রণাম করছিলাম!" হাসতে হাসতে সতীশদা বললেন—"এটা কী করলে? এ তো মূর্তি পুজো! এখানে তো শুধু বিপ্লবীরাই ওঠেন নি, রেপ মার্ডারের আসামীদের পায়ের ধুলোও তো এখানে লেগে আছে!" এক বুক কান্না গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠছে। মনে পড়ছে—জ্ঞান হবার পর যেদিন জানতে পারলাম আমার চাচা (জ্যাঠা) দুশ্চরিত্র মাতাল সেদিন সেই ৯ বছর বয়স থেকেই আর হাজার চাবুক মেরেও আমাকে দিয়ে চাচার পায়ে হাত দিয়ে 'কদমবুসী' করাতে পারেনি কেউ! যতই মারুক আমার এক কথা—"আমি জানি লোকটা বদ, আমি ওকে সম্মান করতে পারছি না!" সেই আমি এ কী করলাম!

"এতক্ষণে চা-নাস্তা প্রস্তুত। চল ফেরা যাক"—যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই ফিরলাম। দূর থেকে টিপ্পনি ভেসে এল, 'সরকারের নতুন জামাই এসেছে রে!" টিপ্পনিকারকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তার বুকভরা ঘৃণাটা কানে ঢুকল।

বিচারের বাণী

আমাদের ওয়ার্ডের কাছাকাছি আসতেই একটা হৈ চৈ আর আর্তনাদ কানে এল। আমরা দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম। ছুটে ওয়ার্ডে ঢুকলাম। দেখি এক 'মেট' 'পেটি'র চামড়ার দিকটা হাতে ধরে পেতলের দিক দিয়ে একটা রোগা 'ফালতু' বলে পরিচিত একজনকে পেটাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে 'তিন-বিল্লা জমাদার' এবং চব্বিশ পরগণা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া এক ডাকসাইটে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। সমরেশ বসুর স্মৃতিকথার দৌলতে এঁর কু-চক্রী বুদ্ধির (বিশ্বাস করি বা না করি) সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। নেতৃত্ব দখলের জন্য ইনি সবকিছু করতে পারেন। মাঝে 'অতি' সেজে বারগেইন করে পি-সি-তে জায়গাও করে নিয়েছেন। প্রাতঃস্মরণীয় না বলে বলা যায় খুরওয়ালা অশ্বেতর জীব—যার খুরে খুরে নমস্কার করতে হয়।

জমাদার চিৎকার করছে—"বোল্ শালা বাবুকা ঘড়ি চোরাকে কাঁহা রাখা?" 'খাকী'রা কাউকে মারছে আর আজিজুল হক দাঁড়িয়ে থাকবে এ পাঠশালায় তো বাবা পড়ান নি (আজও পারি না)। পীড়ক আর পীড়িতের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লাম। মেটের বেল্টটা আমার হাতে ধরা। শ্রমিক নেতা হুঙ্কার ছাড়লেন—"ছেড়ে দাও বলছি! এখানে বিপ্লবীয়ানা দেখতে যেও না!" বিনয়ের সঙ্গেই জবাব দিলাম—"আপনার ঘড়ি আমি কিনে দেব। তবু একে মারতে দেব না। এ যদি চোর হয়, যে শাস্তি দিচ্ছে সে তো ডাকাত! ছিঃ, আপনি না শ্রমিকনেতা!" উনি তখন আমার সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত হচ্ছেন। বেঁটে। বয়সও হয়েছে। আমার গড়ন বরাবর রোগা হলে কি হবে—অবাঙালীসুলভ উচ্চতা এবং চওড়া কব্জির সুবিধাটা যে কি ডুয়েল আকাঙ্ক্ষী শ্রমিকনেতার সেটা বোধহয় জানা ছিল না। ঠিক সময়ে ওপর থেকে অশোকদা আর প্রশান্তদা নেমে না এলে একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত! ওঁরা মিটমাট করে দিলেন। ছেলেটা তখনও কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। সর্বাঙ্গে পেটির দাগ। চামড়া কেটে বসে গেছে। অশোকদা ওকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে গেলেন। আমি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। অদ্ভুত ব্যাপার! দেখলাম সতীশদা নীরব! পার্টির 'অন্নদাস' হলে এমন মেরুদণ্ড-হীন হতে হয় নাকি! নিজের মধ্যে গজ গজ করতে করতে নিজের বিছানায় বসলাম।

কে একজন এসে আমাকে সমর্থন করলেন—আজ নাম মনে করতে পারছি না। "এখানে যারা কাজ করে, তারা নিজেদের স্বার্থেই চুরি করবে না।...দা নিজেই কোথাও রেখেছে!" তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই পাহারাদার একটা ঘড়ি এনে হাজির—"এই তো বাবু! ওপরে তোশকের তলায় ছিল।" যে রাগটা ঝিমিয়ে আসছিল—সেটা আবার দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। কানে ছেলেটার আর্তনাদ ভেসে আসছে—'না বাবু! আমি চোর নই! বাবু, আমি নিই নি।' প্রতিজ্ঞা করলাম—চান্স পেলেই ওই নেতার দাঁতকটা আমি ভেঙে দেব। একগাল হাসি নিয়ে ডাঃ রাধানাথ চট্টরাজের আবির্ভাব ঘটল। "ব্যাপারটা আর কিছুই নয় হে! 'লাইফারস সিন্‌ড্রোম'!" এ রোগের লক্ষণগুলো আমি আর বললাম না। জেল ফেরত কারুর মুখ থেকে পাঠকরা শুনে নেবেন। "নাও নাস্তা করে নাও" একটা বাটিতে দুটো মাখন টোস্ট, দুটো মর্তমান কলা, একটা ডিম, একটা সন্দেশ। গ্লাসে কফি।

এখানে ইচ্ছা অনিচ্ছা সব বিসর্জন দিতে হয়। সতীশদার শিক্ষা 'দম' (হজম) খেতে পারলাম না বলেই কি উনি নিরপেক্ষ হয়ে গেলেন।

ভাবতে ভাবতেই সতীশদা এসে হাজির! ওঁকে দেখে ঘেন্না হল! আজ ভাবি সেটা ঘেন্না না অভিমান? মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। দু-চোখের জল লুকাবার চেষ্টা করলাম না। কেনই বা করব! মনুষ্যত্বের অপমানে যদি রুখে দাঁড়াতে না পারি—মানুষ হয়ে কেন জন্মালাম? মনুষ্যত্বের কষ্টে যদি হৃদয়টা হাহাকার করে ওঠে—তাতে তো লজ্জার কিছু নেই! এ জল লজ্জার নয়—ব্যর্থতার এবং গৌরবের। তাই এ জল লুকানো অন্যায়!

"বুঝলে হে, জেল হল ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এখানে নীচ লোকের নীচতা, ক্রূরতা, শতগুণ ম্যাগনিফায়েড হয়ে দেখা যায়, আবার তোমার যদি সামান্যতম সৎ গুণ থাকে সেটাও অনেক বড় হয়ে ধরা পড়ে! এখানে কেউ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।..." ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—"হ্যাঁ জানি! এরকম কি যেন একটা ঝড়ে-পড়া-জাহাজের যাত্রীদের সম্পর্কে একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন! অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকের!"

"এই ছাখো, আজকের সব কাগজেই তোমার গ্রেপ্তারের খবর বেরিয়েছে!" কাগজগুলো ওঁর হাত থেকে নিলাম। পড়তে মন বসছে না। লিড্ খবরগুলো দেখে ফেরত দিলাম।

প্রশান্তবাবু বলে গেলেন "আজ বড় কম্বল :—এজেণ্ডা—কমরেড আজিজুলের ব্যবহার!" 'বড়-কম্বল' আর 'ছোট কম্বল' কথা দুটো রাজনীতি করা জেল-বাসিন্দা-দের আবিষ্কার। জেনারেল বডি মিটিং আর গ্রুপ মিটিং-এর সমার্থক। ঠোঁটের কোণে আমার সেই বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক হাসিটা দেখা গেল! বিচার হবে! তবুও ভাল! বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে ওদিকে হাসপাতালে! আর এদিকে লক-আপ বন্ধের পর আমার কমরেডরা আমার বিচার করবেন! পাগলা ঘোড়াটা ভেতরে খুর ঠুকছে। সেই খুরের আঘাতে পাঁজরার নিচে ধুলো উড়ছে। মনে হল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

ঠিক বিপরীত দিকের জানলার রড দুটো মুঠো করে ধরে চোখ দুটোকে দেওয়ালের বাইরে মেলে ধরলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠ। আঃ সুন্দর! সত্যিই তো আর মাঠটা অত সমান, অত সবুজ নয়, ঐ মাঠে নেমে দেখেছি যে! ওর এখানে সেখানে চটলা ওঠা কত ক্ষত! দূর থেকে দেখা মাঠ সবুজই লাগে!

পঞ্চ ব্যঞ্জন নয়, পাঁচ দুগুণে দশটা ব্যঞ্জনে লাঞ্চ সারা হল। পাশেই সাধারণ বন্দীদের খাবার। একটা হাতলওয়ালা চ্যাপ্টা বাটি—নাম তার ডব্বু—ডাব্বু মাপা ভাত। ডাল নামক একটা কালো তরল পদার্থ। রাজ্যের তরকারির খোসা দেওয়া ঘ্যাঁট—ইণ্টারন্যাশানাল ঘ্যাঁট। আসল তরকারিগুলো অফিসের বাবুদের বাড়িতে। তবে কুমড়োটা পাওয়া যাবেই। জেলের প্রবাদে—'একবার যখন জেলে ঢুকেছ, আশি মন কুমড়ো না খাওয়া পর্যন্ত বার বার জেলে আসতে হবে।' পাশের ওয়ার্ডে অপেক্ষাকৃত কম-নামী-কর্মীরা ডি-আই-আর (৪৫) অর্থাৎ সমাজ-বিরোধী বলে আটকে আছেন তাঁরা এবং আমরা একই পার্টির কর্মী! তাঁরা তরকারিতে এক টুকরো আলুর জন্য মারামারি করছেন, তলার ডালটা কে নেবে তার জন্য প্রথমে কেউ থালা পেতে ভাত নিচ্ছেন না। তাঁরা লাইন দিয়ে খাবার নিচ্ছেন। আর আমরা? থরে থরে সাজানো বাটি থালা, আসনে বসে পাঁচ জন লোকের পরিবেশনায় লাঞ্চ সারছি! খেতে খেতে লজ্জা হল। 'কমরেড' কথাটার মানে কী? মন বলল—'দিন আসবে, তখন বুঝিও।' 'তখন বুঝো।' এখন 'খাও-পিও-মজতি' কর। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খালি খাও আর সমালোচনার নামে ইতরামো করে যাও। এর পরে আছে মাসের শেষে একটা করে গ্র্যাণ্ড-ফিস্ট!

খেয়ে, হাঁফিয়ে, ওপরে উঠে দেখি প্রশান্তদা একটা বিশাল স্যুটকেস নিয়ে আমার বিছানায় বসে। উনি বাড়ির কর্তা। তাই দুপুরে ওঁর খাওয়াটা একটু দেরিতে হয়। নানান ঝামেলা। মোলাকাত-এর ব্যবস্থা করা, চিঠি পাঠানো, পারিবারিক-ভাতা সংক্রান্ত আবেদনপত্রগুলো ঠিকঠাক করা, বাজার, হিসাব ইত্যাদি সব কত কাজ! সমাজকে পাল্টানোর জন্য এসব কাজের যে কী অসীম মূল্য আমার মত অর্বাচীন বুঝবে কী করে? আমি ভোক্তা। ভোগী। 'মুখ বুজে থাক, মেজাজে থাক।'

স্যুটকেস ভর্তি রাশি রাশি জামা কাপড়! ২৩৫ টাকার জামাকাপড়! সে দিনের বাজার দরে ভাবাই যায় না। জেলের দেড় বছর তো বটেই—জেলের বাইরেও বছর দুয়েক সেই জামা কাপড়েই চলেছে। সাড়ে তিন টাকার পাজামা-পাঞ্জাবিটা ব্যঙ্গ করছে। খাতার রসিদে সই করে সব কিন্তু নিয়েও নিলাম। উপায় কি! হেসে বললাম—"জামাই-ই বটে! এ তো জামাই-তত্ত্ব!" প্রশান্ত-দাও হেসে বিদায় দিলেন।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। এখন থেকে আয়ত্ত করতে হবে। না হলে সময় কাটবে কী করে। উফ্! এই ভোগের নরকে কত দিন থাকতে হবে কে জানে।

ত্যাগ-নির্লোভ আর চরিত্রবলের ওপর গড়ে ওঠা একটা পার্টি ক্রমশ 'শয়ন-স্বপন-মিথুনসর্বস্ব' একটা ভোগবাদী পার্টিতে পরিণত হতে চলেছে। ৪৮-৫১-তে জেলে বন্দী করে, গুলি করে হত্যা করে, জেলের ভেতর মহিলা কমরেডদের ধর্ষণ করিয়ে যে কাজ করতে পারেনি নেহরু-বিধান-নলিনী সরকারের গভর্নমেণ্ট, মুজফ্ফর আহমদ-বিধান রায় চুক্তি সেই কাজ করছে।

শুয়েই একটা সিগারেট ধরালাম। আর বুদ্ধির গোড়াতে ধোঁয়া মানে অনেক অস্বচ্ছ বস্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। এই কমরেডরা যদি দু বছর এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়—এদের দিয়ে কী হবে? বুঝলাম এদের তৈরি করা হচ্ছে। আগামী দিনের শাসক হিসাবে এদের গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এ রাজ্যে কংগ্রেসের দিন শেষ হয়ে আসছে। কংগ্রেস নিজেই নিজের আত্মজদের শিক্ষানবিশি করাচ্ছে। এই পাঁকেই থাকতে হবে অথচ গায়ে কাদা লাগতে দেওয়া নয়। আমার বাবা পর্যন্ত যে স্লোগান ভোলেন নি—এরা ভুলে যাচ্ছে। দ্রুত ভুলে যাচ্ছে সেই স্লোগান—'বাংলার পুর-নারী হও সাবধান/ঐ দ্যাখো মসনদে নলিনী-বিধান!' জেলে বসে কংগ্রেসের এই রেপিস্ট চরিত্র ভুলে যাচ্ছে! বিধান, নলিনী মৃত। তাদের মূল্যায়ন হচ্ছে। নতুন করে নাকি ভাবতে হবে—তারা দেশপ্রেমিক ছিল। ইতিহাসের এই বিকৃতি মানতে পারছি না। দ্রুত সরে আসছি। 'শাসন করতে পারবে কি না'—তার মূল লক্ষণ—তোমার ভোগ স্পৃহা। ত্যাগী সন্ন্যাসীকে দিয়ে শাসন কাজ চলে না। বেঁচে থাক সিগমণ্ড ফ্রয়েড! লেডি মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর এই ভোগস্পৃহা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার পরই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। মুজফ্ফর আহ্মদ-বিধান চুক্তির আসল উদ্দেশ্য জেলে বসিয়ে রেখে কিছু শাসক তৈরি করা! প্রতিকার? কনজিউমার-ইজমের ধ্বংস সাধন। আরও রক্ত, আরও ত্যাগ! পুরনো ঐতিহ্যকে উন্নত স্তরে ফিরিয়ে আনা।

কে জানত ঠিক আমার মতই দমদম জেলে বসে আমার দু-গুণ বয়সের একজন একইরকম ভাবছেন! পরে যখন দুজন, দুজনের ডায়েরি বিনিময় করলাম—আবিষ্কার করলাম এক অদ্ভুত সাদৃশ্য।

বড় কম্বল? না, কম্বল-ধোলাই!

দিবানিদ্রা পর্ব শেষ! চা, বৈকালিক ভ্রমণ। পাশের মাঠে দুপুরের খাবার হজম করার জন্য কেউ ছুটছেন, কেউ বা পায়চারি করছেন। সতীশদা আমাকে নিয়ে পুকুর পাড়ে কদম গাছটার ছায়ায় বসে নিচু গলায় বোঝাচ্ছেন—"মাথা গরম

কোরো না।" সকাল থেকেই বুড়োর ওপর মেজাজটা গরম হয়ে আছে। বিনয়ের সাথে বললাম, "আমার মাথাটা নিয়ে কী করব সেটাও আপনি বলে দেবেন নাকি? বাইবেলের 'সারমর্মে' এরকম আছে জানি—'ঈশ্বর-পুত্রের মাথার ভার এ পৃথিবী বহন করতে পারে না। পক্ষীশাবকদের মাথা গোঁজার জায়গা আছে। ঈশ্বর-পুত্রের নাই'।" উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বাতাবরণটা হাল্কা করার জন্য বললাম—"শুনুন সতীশদা, কবি মিলটন, শয়তানকে নরকে পাঠাল। সেখানে কিন্তু আর ভগবান তাকে কাঠি করতে যান নি। নরকটা ছিল শয়তানের নিজস্ব ডোমেন। তাই সে বলতে পারল আরে! স্বর্গ-নরক কী? মনটা যেখানে রাজা —সেটাই কাম্য। বলল স্বর্গের দাসত্ব থেকে নরকের রাজত্ব ভাল। আজকালকার ভগবানরা নরকে পাঠিয়েও নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না কেন বলুন তো? শয়তানকে 'কাঠি' করার জন্য আপনাদের মত দেবদূতদের পাঠায়। আপনার কমরেড-দের বলে দেবেন 'কাঠি দিলে লাঠি পাবে/হাসি দিলে বাঁশি'।" বলার ঢঙে উনি মৃদু হাসলেন। "তুমি এখনও চটে আছ! আসল সমস্যাটা বুঝছ না।" বেলা যে পড়ে এল/ভোঁ বাজল। সব বন্দীরা এবার বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু খোলা থাকবে কর্তৃপক্ষের পেয়ারের কতগুলো মেয়াদি আর 'স্বদেশী' বাবুরা। এঁরা বন্ধ হবেন রাত আটটার সময়। অবশ্য অতক্ষণ কেউ আর মাঠে থাকেন না। নম্বরে চলে এলাম। যে যার সিটে বসে অথবা শুয়ে থাকলাম। জমাদার গুনে ঘটাং ঘট লকআপ বন্ধ। অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে এটুকুই মিল!

রাজনৈতিক কর্মীর পরিচয় রাখার জন্য চোদ্দজন মুষ্টিবদ্ধ হাতে শহিদদের উদ্দেশ্যে 'মন্ত্রোচ্চারণ'—তবুও ভাল! চা-নাস্তা।

এবার বড় কম্বল। পুরানো খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর মিটিং-এর বিবরণী চোখের সামনে ভেসে উঠল। ২০/২১ বছরের টগবগে তাজা একটা তরুণ—সবেমাত্র চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে! বাইরের পরিবার-পরিজনের স্নেহ-মায়া-মমতা তখনও তার সর্বাঙ্গে আতরের সুবাস ছড়াচ্ছে। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যন্ত্রণা তখনও দগদগে। হৃদয়টা রক্তাক্ত। তাকে বিচার-সভাতে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। করছেন কারা? তাঁর কমরেডরা। পদাধিকার বলে সতীশদা সভাপতি। মুর্শিদাবাদের এক নেতা অভিযোগ করলেন—"কমরেড আজিজুল হক···দাকে ছোকরা-বাজ বলেছে। মারতে গিয়েছিল···ইত্যাদি।" এত বড় মিথ্যা যে প্রতিবাদ করার মত ভাষাও মাথায় এল না। এই কমরেডটি সকালে ঘটনার সময় ধারে কাছেও ছিলেন না। কমরেডটির পদবি বাগ। বক্তব্য বলার সময় শুধু বললাম—"আপনি কোন 'বাগ'? যদি ফারসী 'বাগ' হন (বাগান)

তাহলে বলব আপনি মরীচিকা। যদি বাংলা বাগ হন অর্থাৎ বাঘের অপভ্রংশ হন তাহলে বলব আপনি মেকুর! একটু দুধ পেলেই গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে পা চাটবেন, আর ইংরেজী 'বাগ' হলে এক্ষুণি পার্টির উচিত কিছু টিক্-২০ অর্ডার দেওয়া।" রসিক রাধানাথদা হেসে উঠলেন। বাকিরা গম্ভীর। বলা তো দূরে থাক—'ছোক্রা-বাজ' কথাটার মানেই তখন পর্যন্ত জানি না। ১০ জন মিলে সমালোচনার নামে আড়ং ধোলাই দিলেন। তিনজন নীরব। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হল! সিদ্ধান্ত হল—ওর এ নম্বরে থাকা চলবে না। সতীশদা সংশোধনী দিলেন (প্রশান্তদা অবশ্য মেনে নিয়েছিলেন)—বাইরে জানানো হোক। বাইরের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত যেমন চলছে চলুক!

'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারদিকে···

আমি যাই তারই দিন পঞ্জিকা লিখে'

১৮টা বছর লিখতে হবে, তার মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টার জন্যই দেড়খানা রিফিল শেষ! কম্ম সেরেছে! তাও শুধুই কেচ্ছা! আমি নিরুপায়। একটা বহু-নিন্দিত কিম্বা বহু-প্রশংসিত, রাজনৈতিক লাইনের উৎস সন্ধানে যেতে গেলে সেই দিনটার কথা মাথায় রাখতে হবে বৈকি? প্রথম দিনটাই সব ওলোট পালোট করে দিল।

প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই বোধ হয় এক একটা ঘটনা বা এক একটা বিশেষ দিনই নির্ধারক ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়। গড়ে দেয় তার বাকি জীবনের গতি পথ। সে পথ থেকে সত্যিই কি কেউ সরে আসতে পারে? তাই যদি পারতো—তাহলে সতীশদা অমন সাতকাহন করে অগ্নিযুগের কথা বলতে বসতেন না। দুঃখ, সংগ্রাম, ত্যাগ, নির্যাতন সহ্য করা এগুলো এত গৌরবের বস্তু বলে চিহ্নিত হত না। বিশেষ দিনে কোন একটা ঘটনা তরুণ মস্তিষ্কে যে আঁচড় কাটে সেটাই কালক্রমে গভীর থেকে গভীরতম হতে হতে কবে যে খর-স্রোতা কল্লোলিনী হয়ে যায়—ব্যক্তি মানুষ সেটা নিজেই বোঝে না।

আমার ওপর যা হলো বা প্রথমদিনই যে ব্যবহার পেলাম এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পরে বিভিন্ন জেলে আটকে থাকা আমার মত প্রতিবাদী (ওদের ভাষায় 'অতি')দের অভিজ্ঞতা শুনে আঁতকে উঠেছি। মনে হল যে কোন কারণেই হোক আমি ওঁদের তুলনায় অনেক ভালও থেকেছি। সতীশদা, অশোকদার উপস্থিতিই হোক কিম্বা প্রশান্ত শূরের পিতৃ-তান্ত্রিক (সোহাগ আর শাসন দুটোই চালাতে হবে। সোহাগ ছাড়া শাসন, কিম্বা শাসন ছাড়া সোহাগে তিনি বিশ্বাস করতেন না) মানসিকতার জনাই হোক, প্রস্তাবিত শাস্তি কার্যকর

হয়নি, আমার ওপর। আমার তো মনে হয়—প্রশান্তদা মন্ত্রী হবার পর হঠাৎ হঠাৎ যে বিচিত্র সব সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেন বা অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করে ফেলেন—সেটা তাঁর, সেই আমার দেখে-আসা-পিতৃতান্ত্রিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। উনি কোন সময় নিজেকে 'নেতা' বলে ভাবতে পারতেন না, সমস্ত পরিবারের বড়-কর্তার মানসিকতা, স্নেহ আর শাসন পাশাপাশি চালাতে গেলে যুবকদের মধ্যে শাসনটাই বড় করে রেখা ফেলে। ফল? বিদ্রোহ!

দমদমের অবস্থা অসহনীয় করে তুলেছে অফিসিয়াল নেতারা। ওখানে 'প্রতি'দের (প্রতিবাদী) খবরের কাগজও পড়তে দেয় না—সরকার নয়—কমরেডরা। ফলে তাঁদের কাগজ কিনে পড়তে হয়। আলিপুরে শৈবালদার মত একজন অসুস্থকে কেন্দ্র করে যে চরিত্র হনন শুরু হয়েছিল—বাইরে থাকতেই সেটা শুনে এসেছিলাম। ছাত্রফ্রন্টের ওপর ওদের রাগটা একটু বেশি কারণ এখানে ওরা একেবারেই পাত্তা পাচ্ছে না। নর্থবেঙ্গলে গিয়ে সভাপতি সুবিনয় ঘোষ ল্যাজে গোবরে হয়ে এসেছে। বাইরে থাকতেই শুনে এসেছিলাম শৈবালদাকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের কারণে উনি যে-কোনদিন মুক্তি পেতে পারেন। ভালই হবে। সামনে যুব-উৎসব, এবং ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক কাউন্সিল সভা। কাউন্সিলে আমরা ব্যাপক সংখ্যা-গরিষ্ঠ! তাই পদে পদে পার্টি ম্যাণ্ডেট দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে। এবারে কাউন্সিল সভাতে এই পদ্ধতিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে—'সর্বসম্মতি ক্রমে' প্যানেল পাস করাতে দেওয়া হবে না। পার্টির বাইরের ছেলেদের দিয়ে 'ম্যাণ্ডেট' নস্যাৎ করতেই হবে। মন থেকে কী করে মেনে নেব—দীনেশ মজুমদারকে! এই সে দিন পর্যন্ত ছাত্র ফ্রন্টে দীনেশ মজুমদার যোশী-লাইনের প্রবক্তা ছিলেন, ওদিকে আবার পার্টিতে প্রমোদবাবুর ঘনিষ্ঠ লোক! আমাদের শাখা সভা (পার্টি) থেকে আমরা পাঁচজনকে বহিষ্কার করার জন্য রাজ্য কমিটিকে অনেক আগেই অনুরোধ করেছিলাম, এদের মধ্যে প্রতুল লাহিড়ী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, তেজারত হোসেন, দীনেশ মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। দীনেশদা আর তেজারতদাকে নিয়েই সমস্যা। পার্টিতে এঁরা ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের সমর্থক—অর্থাৎ ভবানী সেন-সোমনাথ লাহিড়ী-যোশী লাইনের বিরোধী—যোশী লাইনের প্রবক্তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ওকালতি করতেন। ফলে সমস্ত ফ্রণ্টাল সংগঠন বিলোপ করে, জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার তত্ত্ব ফেরী করতেন। আসলে এ তত্ত্ব যোশীর নামে চালানো হয় বটে কিন্তু এটা আসলে নাম্বুদিরিপাদের তত্ত্ব। সর্বভারতীয় ছাত্রদের ব্যাপারটা পাঁচ-এর দশকেই এম এসই দেখাশোনা করতেন।

এন ইউ এস-এর তত্ত্ব তিনিই হাজির করেন। পরে ই এম এস নিজের তত্ত্ব থেকে সরেও আসেন, যোশী এটা চালু করার দায়িত্ব নেন। দীনেশদা পার্টি ফ্রন্টে ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের কট্টর সমর্থক হলেও ছাত্রফ্রন্টে 'যোশী-পুত্র' বলে কথিত হীরেন দাশগুপ্তের চেলা। যিনি ছাত্র ফেডারেশনটাকেই উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁকেই ছাত্র ফেডারেশনের নেতা বলে মেনে নিতে হবে। এটাই পার্টির নির্দেশ। কমিউনিস্ট পার্টিতে 'ইউনানিমাস' সিদ্ধান্ত মানেই যে 'ব্যাপক বিরোধিতার মুখে পড়ে ম্যাণ্ডেটে গেলানো সিদ্ধান্ত'—এটা বুঝতে পারতাম না। কারণ পার্টি সংবিধান বা মার্ক্সবাদী তত্ত্বগুলো পড়ে তো এ ধরনের ধারণা জন্মায় না বরং উল্টোটাই জন্মায়।—'দ্বন্দ্ব ছাড়া বিকাশ নেই।' 'মোর কণ্ট্রাডিকটারি আ থিং ট্রু ওয়ার ইট ইজ' 'ভুল যত ওপর থেকেই আসুক বিরোধিতা করার হিম্মত রাখো'—প্রভৃতি দার্শনিক কথাগুলো কি নিছকই আপ্তবাক্য? আজ যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির গণতন্ত্রীকরণের নামে 'গ্লাসনস্ত' অর্থাৎ বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির তত্ত্ব আমদানি করছেন, অতীতে তাঁরাই ম্যাণ্ডেট দিয়ে কাজ করিয়ে এই তত্ত্ব আমদানির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, এবং সেটা সচেতন ভাবেই করেছিলেন। মার্ক্সীয় দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে এঁরা যদি সেদিন পার্টি গণতন্ত্রকে নিশ্চিত করতেন আজ এ সমস্যা দেখা দিত না। পার্টিটা 'সাফোকেটিং কেজ' হয়ে দাঁড়াতো না। সুবিনয়দাকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তুলে এনে ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি করা হল! সেটাও 'সর্বসম্মতি' ক্রমে। বাইরে থাকতে 'পার্টি গণতন্ত্র' ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি, ব্যাপক মানুষ, ব্যাপক কাজের জায়গা, আমার মত, আমার ভাবনা প্রয়োগের ক্ষেত্রও অনেক। কিন্তু জেলে এসে মনে হল—পার্টি শৃঙ্খলা নামক বস্তুটা কতকগুলো তোষামোদখোরদের আখের গোছানোর হাতিয়ার। একটা অংশকে 'বিলাসে-ব্যসনে ভরিয়ে দাও'—তাহলে তারা আর মৌলিক মানবিক দাবি নিয়ে হৈ চৈ করবে না। 'তাদের দিয়ে বাকিদের গলা টিপে ধরো।' এরই নাম গণতন্ত্র! এই দৈত্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আবার নিজেকে রক্ষাও করতে হবে—যাতে টকের জ্বালায় পালাতে গিয়ে তেঁতুলতলায় গিয়ে না পড়ি! অসিত, নির্মল, শক্তিদা, শৈবালদা এঁদের মুখ বার বার মনে পড়ছে! এখানকার এদের যত ঘৃণা করতে শুরু করলাম। (ব্যক্তিগত ভোগাসক্তিটাই যার উৎস) ভোগবাদকে তত বেশি করেই ঘৃণা করতে লাগলাম। অদ্ভুত এক আত্মনিগ্রহের দর্শন জন্ম নিল। নিজেকে নিজে বললাম 'মন রে! ভাব সম্প্রসারণ করিস নি? উত্তম সদা চলে/অধমের সাথে/তিনিই মধ্যম/যিনি চলেন তফাতে!' ফলে প্রায়

একাহারী সাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিলাম আর কি ! বেঁচে থাক পাক-ভারত যুদ্ধ ! না হলে হয় তো আমিই অরবিন্দ ঘোষ হয়ে যেতাম !

খুনীর উপদেষ্টাই বিচারক

এর মধ্যে একদিন প্রশান্তদা এসে বললেন—"কাল তোমাকে অ্যাডভাইসারি বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে।" ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারী-লাল নন্দ শ্বেতপত্র দিয়েছে। তাতে অভিযোগ করা হয়েছে বাম-কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের মারফত দেশের স্থিতিশীলতা ভাঙার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে সরকার হস্তক্ষেপ করেছে না হলে চীন ঢুকে পড়ত ! সতীশদাকে নাম ধরেই অভিযুক্ত করা হয়েছে, উনি কুলুতে গিয়ে কিছু ছাত্রের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। উদ্দেশ্য—গেরিলা যুদ্ধ করা। উত্তর বাংলাতে 'চীনা হামলার' সময় যাদের গেরিলা-বিরোধী-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সেইরকম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু লোক ব্যাপক চা-শ্রমিক এবং কৃষককে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। একটা দলিল থেকে উদ্ধৃতিও আছে। এরই জন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি করেছে। এর ফলে ১৯৪৫ সালের ভারতরক্ষা আইন বলবৎ করার অধিকার দেওয়া হল রাজ্য সরকারগুলোকে। আইনে আছে—গ্রেপ্তার যাকে করা হবে ৯০ দিনের মধ্যে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত তিনজনের একটা কমিটির সামনে তাকে হাজির করতে হবে। এবং ছমাস পরপর প্রত্যেকটা কেস পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করে—তবেই আবার ডিটেনশনের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। না হলে 'টেকনিকালি' আগের অর্ডার বাতিল বলে গণ্য হবে। যাঁরা 'ডিটেনশন'কে 'কালাকানুন' বলেন—তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। এই যে—বিচারাধীন-বন্দী-হিসাবে বিনাবিচারে যাবজ্জীবন আটকে রাখা এর চেয়ে সেগুলো অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ! অবশ্য 'গণতন্ত্র' জিনিসটা যদি আদপেই গণতান্ত্রিক হয় তবেই আমার কথা সত্য। 'গণতন্ত্রটাই' 'গণতান্ত্রিক' কিনা এ প্রশ্ন করা যেতে পারে, করা উচিতও।

পরের দিন ন'টা বাজতেই স্লিপ হাতে 'আইটর' বাবু (লেখা-পড়া জানা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—যাদের দিয়ে কেরানীর সমস্ত কাজ করানো হয়, কথাটা রাইটার। 'র'-'অ'-এ রূপান্তরিত) এসে হাজির। চা-খেয়ে প্রস্তুতই ছিলাম। প্রথম দিনের পর সেই যে আমার সকালে জল-খাবার খাওয়ার বন্ধ

অভ্যাসটা দূর হয়ে গেছে আজ প্রয়োজনের তাগিদেও খেতে পারি না। গা-গুলিয়ে ওঠে। একটা প্রাইভেট কার। সাদা পোশাকের জনা চারেক গোয়েন্দা অফিসার—আমাকে মাঝখানে বসিয়ে নিয়ে চললেন। সামনে ওয়্যারলেস ভ্যান। বুঝলাম গন্তব্যস্থল—রাইটার্স বিল্ডিং। 'রাইটার্সের' একটা ঘরে 'অ্যাড-ভাইসারি বোর্ডে'র অফিস। প্রশ্ন জাগলো—এঁরা কার অ্যাডভাইসার? শ্রীমতীকে সন্তুষ্ট করার পর তিনি তো 'প্লিজড' হয়ে আটক করার নির্দেশ দিয়েছেন—এখন তাঁর আবার কী 'অ্যাডভাইস' দরকার পড়ল? 'আটক'টা 'কনফারম' করা হলো নির্দেশ পাবার পর বুঝলাম। উনি তাহলে অ্যাডভাইসারদের মারফৎ নিশ্চিত হলেন! অর্থাৎ নিশ্চিত হবার আগেই খুন করে—খুনটা যে যথার্থ সেটার সপক্ষে যুক্তি হাজির করানোর জন্য বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার। হলে ঢুকে দেখি একটা টেবিলের এক পারে শামলা গায়ে তিনজন। মাঝের জন সভাপতি, শামলা গায়ে তিন ক্লাউনকে দেখে কমলাকান্তর 'প্রসন্ন গোয়ালিনীর' কথা মনে পড়ে গেল। এঁরা কি 'লম্বা-লম্বি ক্রস' করবেন? না, আড়াআড়ি? হাসি চাপতে পারলাম না। নমস্কার বিনিময়ের পর এপারে একটা চেয়ারে বসতে বললেন। বসলাম। মাঝের জন গম্ভীর মুখে একটা ফাইলের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। আমার হাসির শব্দে মুখ তুলে আবার পড়াতেই 'মনোনিবেশ করিলেন।'

মিনিট পাঁচেক পরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলুদ হয়ে যাওয়া শিবাজী মার্ক খাতার পাতা থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি :—

৩ জুন : ১৯৬৫ :—

বিচারপতি : আপনার নাম ?

আমি : নাম না জেনেই ডেকে পাঠিয়েছেন নাকি?

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি : আপনি প্রশ্ন করতে পারেন না। উনি যা জিজ্ঞাসা করছেন শুধু তার উত্তর দিতে পারেন।

আমি : আমি কি বাধ্য?

বিচারপতি : না, না, আপনি বাধ্য নন। আমরা আপনাকে আটক করাটা বৈধ কিনা জানার জন্যই কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। ইচ্ছা হলে উত্তর দেবেন। না হলে বলবেন 'বলবো না।' আচ্ছা নাম আপনাকে বলতে হবে না। আপনি কি মনে করেন না চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল?

আমি : এটা কি 'লিডিং কোশ্চেন' হয়ে গেল না? লিডিং কোশ্চেন করাটা কি বে-আইনী নয়? তবুও বলছি। না, মনে করি না। ভারতকে দখল করার কোনও সদিচ্ছাই চীনের ছিল না বা নেই। উল্টে আমেরিকার চাপে নেহরুই

ভারতীয় ফৌজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'চীনা চৌকিগুলো দখল করে নাও'। এর আগে থেকেই রণনীতিগতভাবে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, চীনেরই একটা প্রদেশ তিব্বতে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছিল নেহরু।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আপনি মনে করেন তা হলে তিব্বত চীনেরই রাজ্য।

আমি : আপনি তো দেখছি ভারত সরকারের ঘোষণাটাই জানেন না। ৫৪ সালে নেহরুই বলেছেন তিব্বত চীনের অঙ্গ-রাজ্য।

তৃতীয় ব্যক্তি : কিন্তু 'বমডিলা' পর্যন্ত ঢুকলো কেন? 'বমডিলা' তো প্রশ্নাতীতভাবেই ভারতের।

আমি : আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়লে আপনি তাকে বড় রাস্তা পার করে দিয়ে আসবেন না কি? চীনপন্থী কমিউনিস্ট বলে যাঁকে কোন কালেই চিহ্নিত করা যাবে না—সেই রাসেল তো বমডিলা পতনের পরই নিশ্চিত হলেন চীন আক্রমণকারী নয়। তাঁর ভাষায় : 'বমডিলা পতনের পর সমগ্র পূর্ব ভারত যখন চীনা বাহিনীর কাছে খোলা (কেকের ভিতর ছুরি চালানোর মত), তখনই তারা এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। পৃথিবীতে কোন বিজয়ী বাহিনীকে এই রকম কাজ করতে দেখা গেছে? এর দ্বারাই আমার কাছে পরিষ্কার হল চীনের ভারত দখল করার কোন মতলব ছিল না।'

বিচারপতি : কোথায় বলেছেন?

আমি : 'আন আর্মড্' ভিক্টরি বইয়ে।

দ্বিতীয় : ওটা তো বেআইনী বই!

আমি : সেই জন্যই তো ওটা থেকেই উদ্ধৃতি দিলাম।

তৃতীয় জন : চীনের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে?

আমি : হ্যাঁ, প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে। দুঘণ্টা করে মাও সে তুঙ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি!

বিচারপতি : (হেসে) : য়্যু আর টু ইনটেলিজেন্ট! পরীক্ষাটা দেবেন?

আমি : জেল থেকে বিজ্ঞান কী করে দেওয়া যায়?

বিচারপতি : সে ব্যবস্থা আমরা করব।

আমি : ভেবে দেখব।

বিচারপতি : আপনি এবার যেতে পারেন, পরশুদিন আমাদের সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন।

বিচারপতি তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনদিন পরে এস-বি অফিসের একজন এসে একটা চোথা ধরিয়ে গেলেন। কেস রিভিউ করার পর অ্যাডভাইসারি

বোর্ডের পরামর্শ মত রাজ্যপাল (অশেষ) আনন্দিত হয়ে ডিটেনশনকে আরও ছ' মাসের জন্য নিশ্চিত করলেন। চাকরি পাকা হল।

স্বাস্থ্যের কারণে শৈবালদা মুক্তি পেয়ে গেছেন। যাক ভালই হল। ওঁর চিকিৎসাটা একান্তই দরকার। খবরের কাগজগুলো থেকেই জানতে পারলাম যুব-উৎসবে বাম-কমিউনিস্টদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়েছে। তখনও 'যুব সংঘ' ভাগ হয়নি। ডাঙ্গে-পন্থীরা যুব-উৎসবকে 'বিউটি-শো' আর 'স্লিপিং বিউটি'তে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বাম-কমিউনিস্টদের একটা উগ্র অংশ ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে হামলা চালিয়ে 'রাজবন্দীদের মুক্তির শ্লোগান তোলেন'। এর নেতৃত্ব দেন উৎপল দত্ত, শৈবাল মিত্র প্রমুখ। 'আনন্দবাজার' গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বুঝতে পারলাম শৈবালদা আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও দানা বাঁধলো। আবার ওকে গ্রেপ্তার হতে হবে। এই দম বন্ধ করা আবহাওয়ার মধ্যে এটা এক ঝলক মুক্ত হাওয়া। বাইরে ওরা আমাদের ভুলে যায়নি। কে বলে আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইণ্ড! আবার আমরা সংগঠিত হচ্ছি, দু-মুখো লড়াই। নিজের পার্টির বিরুদ্ধে, বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে। এ লড়াইতে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি খাচ্ছি আর ঘুমুচ্ছি। কথা বলা যায় এমন একটাও লোক নেই। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেল থেকে কয়েকজন ট্রান্সফার হয়ে এলেন, এঁদের মধ্যে সমর মুখার্জি, বিজয় পাল, যামিনী মজুমদার আছেন। সমরদা এসেই পার্টি ক্লাস চালু করলেন। 'বামপন্থী কমিউনিজম বিপজ্জনক ঝোঁক!' অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করলাম—৬২-৬৩তে আত্মগোপন করে থাকার সময় উনিই যে সব কথা বলতেন এখন সে গুলোকেই অস্বীকার করে চলেছেন। মূল-আক্রমণটা আমাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত। জলপাইগুড়ি জেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চারু মজুমদারকে পি জি হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন সমরদা বিচিত্র এক মন্তব্য করে বসলেন—এরা সব 'সিয়ার' লোক। যামিনী মজুমদার (এক পা খোঁড়া) ভীষণ খেপে গেলেন। 'ও-সব বলবেন না! চারুদাকে আমি চিনি, আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি! ভুল তিনি করতে পারেন, সিয়া-ফিয়া বলবেন না!' 'প্রফুল্ল সেন ছেড়ে দিচ্ছে কেন? তা হলেই তো সিয়া'র লোক!' সমরদার এই যুক্তি আজও সি পি এম বয়ে চলেছে। একদিন আমার সঙ্গে অবধারিতভাবে ঠোকাঠুকি লাগল। মনে হল লোকটা হয় শয়তানী করছে

না হয় লেখাপড়া জানে না। নেহরু এবং জাতীয় বুর্জোয়া নিয়ে উনি সারগর্ভ বক্তৃতা করে চলেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম। "ভারতবর্ষে কে কে জাতীয় বুর্জোয়া? নাম বলুন? জাতীয় বুর্জোয়া কথাটার মানে কী? ভারতীয় হলেই কি জাতীয় হবে? না কি যে বুর্জোয়া জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধিতা করবে সেই জাতীয় বুর্জোয়া? এরকম একজনের নাম করুন!" ওঁর সুন্দর লাল মুখটা আরও লাল হয়ে গেল। ওঁকে বিড়ম্বিত করার জন্যই বললাম— "জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, মীরজাফররা তো আপনার বিশ্লেষণ অনুযায়ী দেশপ্রেমিক ছিল। কারণ, নবাবের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা পুঁজির পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। 'নবাবের' তুলনায় 'পুঁজি' সে যুগে তো প্রগতিশীল ছিল!" বাকিরা চুপ, অনেকদিনের চাপা ক্ষোভ ফেটে পড়ল। "ইংরেজ-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ইত্যাদি ভারতবর্ষে ইতিহাসের গতিকে শুদ্ধ করে দিয়েছে। ঐতিহাসিক নিয়মেই এখানে অচলায়তন ভাঙত। জাতীয় বুর্জোয়ারা বেড়ে উঠল সামন্ত প্রভুদের ধ্বংস করে। ইংরেজ এসে সেই বিকাশ শুদ্ধ করে কিছু বণিক সৃষ্টি করেছে। জগৎ শেঠ, রাসমণি, কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফররা এরই জন্য বেইমান! তারা ইতিহাসের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। ইতিহাসকে এক জায়গায় আটকে দিয়েছে।"…"জাতীয় বুর্জোয়া ঠিক হবে সামন্তবাদ বিরোধী লড়াই করে। সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে যে বুর্জোয়া এসে পাশে দাঁড়াবে, মদত দেবে সেই হবে জাতীয় বুর্জোয়া। পুঁজির লগ্নী আর হিসাব কষে বোঝা যায় না কে জাতীয়? আর কে বিজাতীয়? এই তো শুনলাম 'মহেন্দ্র অ্যাণ্ড মহেন্দ্র' কোম্পানি নাকি জাতীয় বুর্জোয়া। কি প্যাঁদানিটাই না তার হাতে খেলাম! তখন আপনারা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তার গাঁট-ছড়া-বাঁধা আছে আমেরিকার সঙ্গে। এটা ভুল নয়। এটা শয়তানি। আরে বাবা! লেফট ইনফেনটাইলিজমের বিরুদ্ধে এত বলছেন, কই, রাইট-সেনিলিটির বিরুদ্ধে একটা কথাও নেই কেন?…"

যখন খেয়াল হল বুঝতে পারলাম—মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছি। প্রত্যেকেই গুম। বুঝলাম একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছি। কি যে হত জানি না। সেদিন ওঁদের মূল তাত্ত্বিক নেতাকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলাম তাতে জেলেই আমার জীবন সেদিনই শেষ হয়ে যাবার কথা!

৩

কে বলে যুদ্ধ শুধু বুর্জোয়াদের কাছে আশীর্বাদ? সন্ধ্যার মাইকে বেতার সংবাদ। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আঁতকে উঠলাম। এর মানে তো এ দেশে

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! দাঙ্গার বীভৎস চিত্রটা ভেসে উঠল চোখের ওপর। বর্তমানে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-নেতা। গুণ্ডা-মস্তানের সাহায্যে তাঁরই পার্টি কর্মী এক মুসলমানকে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে পেটাচ্ছেন। কপালে তাঁর সিঁদুরের টিপ। মুখে বুলি "মেরে ফ্যাল্ শালা কাটুয়াকে!" হৈ-চৈ শুনে আমাদের কমরেডরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে তিনি ফ্যালার বাপের (ফঃ বঃ) পার্টি করেন এবং এক সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার একনম্বর আসনটার 'উপ' হয়ে কাটিয়ে দেন। 'উপ' আর 'অপ' দুটো প্রত্যয়ই দু-নম্বরীদের 'এ্যাফিক্স?" ইনিও উপ-মন্ত্রী! আবার মনে মনে আনন্দিত হলাম, যুদ্ধ মানে জনগণকে কামানের খোরাক বানানো। আরও সঙ্কটের বোঝা চাপানো। বিদ্রোহ! বাইরের যুদ্ধের উন্মাদনায় নেতারা অর্বাচীনকে ভুলে গেলেন। আশঙ্কা? যে কজন আছেন, এবার ঝেঁটিয়ে তুলে আনবে। আনন্দ হ'ল আমার নিজস্ব কিছু কমরেডকে পাব। হালিম-সাহেব এবং জ্যোতিবাবু বাইরে আছেন। পার্টি কী বলবে জানতামই। 'দেশ-আক্রান্ত!' রক্ত দাও। পয়সা দাও! মোটামুটি ৬২ সালের নির্বাচনে পঃ বঃ পার্টি যখন বিকল্প সরকারের স্লোগান (তখনও ভাগ হয় নি। পঃ বঃ রাজ্য কমিটিতে প্রমোদবাবুরা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ!) হাজির করে তখন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এরা মন্ত্রী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এম এল এ হবার আকাঙ্ক্ষা এমনই তীব্র হয়ে ওঠে যে মাঝে মাঝে পার্টি মিটিংগুলোতেও কিছু কমরেড 'কমরেড সভাপতি'র জায়গায় 'মিঃ স্পিকার স্যার!' বলে ফেলতেন। তাই বর্তমানে এঁরা যা করছেন, তাতে অনেক পুরনো কমরেড দুঃখ পান, আমি পাই না। তাঁদেরই একজনকে কালকেই বলছিলাম (১৯।৪।৮৯) জ্যোতি বসু ওয়াজ গ্রুমড্ ফর সি এম বাই ডঃ রায়। এ দেশে দেশপ্রেমকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে আগে বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে পেটি-বুর্জোয়ারা গ্রহণ করবে না। এটা তো জানা কথা, কৃষকপ্রধান দেশ মানেই পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতার আধিপত্য। ঠিক ভাবনামতই জ্যোতিবাবুর বিবৃতি প্রকাশিত হল। 'কংগ্রেস সরকার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে গাফিলতি দেখাচ্ছে। দেশকে রক্ষা করতে হবে।' জ্যোতিবাবুর এ বিবৃতি আমাকে বাঁচিয়ে দিল। উগ্র-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আমরা এক-কাট্টা হয়ে গেলাম! দু-চার জন নেতা খুঁত খুঁত করতে থাকলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে মনে শাস্ত্রীজীর—"জয় জওয়ান/জয় কিষাণ" তিনবার আওড়ে নিলাম। বেঁচে থাক—যুদ্ধ!

জেলের পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেল উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার গ্রেপ্তার হয়ে আসার পর। এঁরা তখন 'অতি' বলে 'পেছনে' নিন্দিত, কিন্তু

নির্বাচনে জিততে গেলে উৎপল, জোছন অবশ্যম্ভাবী। গোটা পার্টি উৎপল দত্তের পেছনে ছুটত। উৎপল দত্ত পার্টির কিছুই তোয়াক্কা করতেন না, পরে সি পি আই এম-এল গড়ার যুগে ওঁর এই 'ইগো'কেই আমরা হাতুড়ি পেটা করে ছারখার করে দিই। উনি তখন আবার 'কমরেড বাসু'র কোলে ভেড়েন। শিল্পীদের 'ইগো' সমস্যাটা না বোঝার ফলেই ওঁকে আমরা হারাই। উৎপলদা পরিচিত হয়েই নাটকীয় ঢঙে বললেন (যেন 'ওথেলো' আওড়ালেন!)—"তুমিই আজিজুল হক! আমি ভেবেছিলাম একটা খান টান হবে, এ তো দেখছি পাক্তি প্রেমিক প্রেমিক বাঙালী!" পার্টির অফিসিয়াল লাইনকে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে তছনছ করতে শুরু করলেন। অপেক্ষাকৃত হাল্কা মেজাজের লোক জোছনদার বিখ্যাত আওয়াজ—"দাবরালু! দাবরালু!" অর্থহীন এই আওয়াজ নেতাদের ঘুম কেড়ে নিল। হঠাৎ মাঝরাতে জোছনদা হয়তো আওয়াজ তুললেন—"কমরেড-অমুকদার আমাদের প্রতিধ্বনি 'দাবরালু! দাবরালু!' সেই দাদা বুঝে গেলেন আগামী এক সপ্তাহ তিনি টার্গেট। জোছনদার প্ররোচনায় পড়ে প্রশান্তদাকে হাসাতে আমার কবিত্ব শক্তির পরিচয় রাখলাম—

"প্রশান্ত অশান্ত কেন
শান্ত তুমি হও!
তর্জন গর্জন বাবা
একটু কমাও!"

আজ প্রশান্তদা মন্ত্রী। মন্ত্রী হিসাবেই সেদিন যখন তাদের হাতেই বন্দীকে দেখতে এসেছিলেন দু-জনেই হেসে ফেললাম। পুরনো স্মৃতি মিনিট খানেকের জন্য ভুলিয়ে দিল রাজা বনাম রাজদ্রোহীর দ্বন্দ্ব। নিজেদের অজান্তেই দু-জনেই লক্ষ্য করলাম কখন যেন দু-জনেরই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে! বর্তমান অতীতকে পরাজিত করল! বাস্তব মুছে নিল স্মৃতি। উৎপল দত্ত তাঁর নিজস্ব কায়দায় 'গুজু-গুজু-ঢঙে' কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—'বিপ্লবের দিন এসে গেছে নর্থ বেঙ্গলে বিশাল ক্রিয়াকাণ্ড চলছে। চীনে, চলছে উলট পালট!' নর্থ-বেঙ্গল থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রগুলোর কথা বললেন (পরে সেগুলোই চারু মজুমদারের বিখ্যাত আট-দলিল বলে খ্যাতি লাভ করে)। খুব উৎসবে এ শালা বেইমান বসুর দল (বিমানদাকে উনি তাই বলতেন তখন!) রাজবন্দীদের তালিকাতে তোমার নামই রাখে নি, তাই নিয়ে ঝামেলা হল হল। "শোন তবে একটা গল্প! এরা কেমন কমিউনিস্ট শোন! যুদ্ধ তো বেধেছে। হঠাৎ একদিন প্রেসিডেন্সি জেলের পাঁচিলে পাক-বোমা!! দেওয়াল ভেঙে গেছে। গোটা জেল ফাঁকা!

সাংবাদিকরা এসেছেন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন সাত-খাতার পাশের মাঠটাতে জনা কুড়ি লোক বসে ঘোর তর্ক-বিতর্ক করছে। কৌতূহলী সাংবাদিকরা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা কারা? গোটা জেল ফাঁকা। পালাবার এমন সুযোগ পেয়েও আপনারা পালাননি কেন?' এক-জন উঠে বললেন—'আমরা রাজবন্দী। মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি পালানো উচিত কি না। এতে কতখানি হঠকারিতা হবে'?" আমি হেসে ফেললাম, উৎপল দত্ত সেদিন কি জানতেন তিনি কী বললেন এবং কাকে বললেন! এর স্বাদ পেল '৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঐ প্রেসিডেন্সি জেলেরই বন্দীরা। ২০ মিনিটের জন্য গেট খোলা। ৪৫ জন পালাল। শুধু পালালেন না একজনও রাজবন্দী।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শেষ হল। তাসখন্দে শাস্ত্রীজী মারা গেলেন। যুদ্ধ তার অনিবার্য প্রভাব ফেলে গেল। চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই। কাঁচকলা খাবার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনকিছুরই অভাব নেই শুধু রাজবন্দীদের। পাশের ফাইল (নম্বর) গুলোতে খাবার পরিমাণ আরও কমে গেল। ঠিক এক-মুঠো ভাত। ওজন ঠিক রাখার জন্য রাঙা-আলু চালু হলো। 'আমাদের তাতে কী? ওদের লড়াই ওরা লড়ুক!' ভেতরেই যখন এই অবস্থা, বাইরে কী চলছে বুঝতেই পারলাম। প্রতিদিন রেডিওতে 'সিকিম সীমান্তে' চীনাদের উঁকি-ঝুঁকি মারার গল্প দেবদুলালের 'খেটারী গলায়' গম গম করতে লাগল। বাইরের জন্য ভেতরটা ছটফট করছে। আবার 'ডিপ্রেসন' শুরু হল!

বসিরহাটের একটা গ্রামে মানুষগুলো তেলের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ পুলিসের গুলি চালানোয় নুরুল বলে এক ছাত্র মারা গেল। যুদ্ধ যে বারুদের স্তূপ জমা করে গিয়েছিল, তাতে আগুন দিল নুরুলের রক্ত। গ্রাম বাংলা জ্বলতে শুরু করল। কৃষ্ণনগরে আনন্দরা শহিদ হলেন। হুগলিতে ট্রেন লাইন লোপাট। কলকাতা কাঁপতে শুরু করল। '৫৯ সালের আন্দোলনের সঙ্গে এর ফারাক ছিল। '৫৯ সালে গ্রামের লোককে শহরে এনে ঝাড় খাইয়ে টেম্পো তোলার চেষ্টা হয়েছিল। এবারে গ্রামগঞ্জের লড়াই শহরকে কাঁপিয়ে দিল। এ লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতি দেখতে দেখতে মনে হল অনেক দিনের জমে থাকা একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চলেছি। একটা অস্বচ্ছ তত্ত্ব পরিষ্কার হতে চলেছে।—'৫৯ সালে শহরের বুকে গ্রামের ৮০ জন মানুষ খুন হল অথচ গ্রামগুলোতে সেরকম সাড়া জাগানো গেল না। এবারে গ্রামে একজন খুন হতেই শহর জেগে উঠল! জ্বলছে কলকাতা! জেলের পাঁচিল কি এই আঁচ ঠেকিয়ে রাখতে পারে?

গাছের গোড়া ধরে নাড়া দিলে ডাল-পালা তো নড়বেই। যে-গাছের গোড়া যত সরু তার ডাল-পালাগুলো ততই বেশি আন্দোলিত হয়। আতঙ্কিত প্রফুল্ল সেন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছে। নিজেই বলছে—'কৃষ্ণনগর ডুবু ডুবু/কোন্নগর ভেসে যায় যে…।' বেহায়া আর কাকে বলে? গ্রেপ্তার হলেন জ্যোতিবাবু, হালিম সাহেব, যতীন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মুখার্জি, বিমান মিত্র, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য সহ সব দলের প্রায় সব প্রথম এবং দ্বিতীয় সারির নেতা। অসিত, নির্মল, হরপ্রসাদ, শ্যামল চক্রবর্তীরা গ্রেপ্তার বরণ করে ডি-আই-আর খেল। নির্মলকে জিজ্ঞাসা করলাম "গ্রেপ্তার হতে গেলি কেন? এখন কাগজটার কী হবে?" ঝাঁকের কই নির্মল তখন জোছনদা-উৎপলদার চ্যালা ব'নে ঝাঁকে ভিড়ে গেছে। বলল, "দুশ্ শালার কাগজ। ম্যাণ্ডেট দিয়ে আমাকে তুলিয়ে তো দিল কাগজটা দখল করার জন্যই"। সেদিন অনিলের লেখাতে নির্মলের কথার যথার্থতা দেখলাম। শৈবালদা আবার গ্রেপ্তার হয়ে এলেন। এবার সকলেই প্রেসি-ডেন্সিতে! কী মজা! আজ কমরেডরা গ্রেপ্তার হলে আমি কাঁদি! সেদিন যে কি আনন্দ হয়য়ছিল। 'অতি' দের নরক গুলজার।

শৈবালদার কাছ থেকে বেলঘরিয়া কাউন্সিল মিটিং-এর বিবরণ শুনলাম, "দুটো মত, দুটো পথের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। ছাত্রদের কাজ কী? শুধুই ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ছাত্রদের জন্য আন্দোলন করা, না, ব্যাপক মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিপ্লবের কোকিল হওয়া। আমাদের হাতিয়ার ৪ মে-র আন্দোলন সম্পর্কে মাওয়ের লেখাটা, আর লেনিনের 'যুবকদের প্রতি' ওদের হাতিয়ার ম্যাণ্ডেট। 'ব্যাটারা এতই নীচ যে রাজবন্দীর তালিকায় তোমার নামই দেয়নি, উঃ বঙ্গের ছাত্ররা দারুণ কাজ করছেন। চারুদার সঙ্গে কথা হল, উনি বললেন—তোমরা যে চীনের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে এটা অস্বীকার করছ কেন? পরিষ্কার বল আপনারা মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করলে দোষের হয় না, আমরা চীন পার্টিকে নেতা মানি তাই চীনের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।' মন খারাপ কর না। 'নতুন কাগজ বার করব আমরা।' 'বুঝলে চারুদার কলকাতার প্রথম ক্যাডার আমি!' অর্থাৎ 'তুমি আর বাদ থাক কেন?' চমৎকার অবস্থা। ওদিবে শাস্ত্রীজী মারা যাবার পর ইন্দিরাকে নিয়ে কংগ্রেস ভাঙছে। শাসক-গোষ্ঠী ভাঙছে। এই তো সময় আঘাত করার! পার্টি আবার বেইমানি করল। যা-অবস্থা হয়েছিল—একটা ডাক দিলে কলকাতা দখল হয়ে যেত! ইতিমধ্যে নয় নয় করে প্রায় দেড়টা বছর ভেতরে কাটাতে চলেছি। অসিত খুব চিন্তায় পড়েছে। চারুদার ৫ নং এবং ৭ নং দলিলটা পুলিস

ওর কাছে পেয়ে গেছে। আমি বললাম—"নন্দাজী তোর আগেই পেয়ে গেছে! অত ভাবিস না। চারুদা ভদ্দর লোকের মত পার্টিকে জমা দিয়েছিলেন তো? দেশ-প্রেমিক পার্টি মন্ত্রগুপ্তির শপথ অনুযায়ী সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে।"

ওদের ওপর হিংসা হতে শুরু করল! ইস! আমি দেড় বছর পিছিয়ে। বাইরে বেরতে পারলে দ্রুত গ্যাপটা মেক-আপ করতে হবে। তবে আর ছাত্র রাজনীতি নয়, কৃষক। যাদের দেশ তাদের পাশে থেকে লড়ব। শৈবালদার হৃদয় যথারীতি বিগড়ে বসল। ওঁকে কেন্দ্র করে নিউ ওয়ার্ড বলে একটা ব্লকে আমি, বিজয়দা (পাল), রাধানাথ দা চলে এলাম। ওটা হল হাসপাতাল ওয়ার্ড। (রাজবন্দীদের জন্য)।

অ্যাসবেসটাসের ছাঁউনি—তলায় সিলিং করা। প্রচুর গাছগাছালি-ভরা ওয়ার্ড। উল্টো দিকে সাংবাদিক জীবনলাল এবং হরিদাস মুন্দ্রা থাকেন। মাঝে মাঝে তাদের জুয়ো খেলার ঝগড়া ছাড়া এখানে কেউ আমাদের শান্তিতে বাদ সাধতে আসত না। এত সুখ কি কপালে সয়?

সাক্ষাৎকার না চার্জশিট?

হাসপাতালে এসে একদিন প্রশান্তদা বলে গেলেন আজ বিকেলে জ্যোতিবাবু আর হালিম সাহেব আসবেন তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? এমনি, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তুমি অসুস্থ তো! সন্ধ্যার পর ওঁরা এলেন, জ্যোতিবাবুই শুরু করলেন—'কেমন আছ'?—'ভাল'।—'নিন হালিম সাহেব আপনারা কথা বলুন—আমি একটু লতিফের সঙ্গে দেখা করে আসি।' লতিফ সাহেব তখন 'গোরা ডিগ্রী'তে একা একা থাকেন। স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছেন, যাতে মতান্তর মনান্তরে পরিণত না হয়। হালিম সাহেব কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের নেতা। সুতরাং প্রশ্ন কী হবে বুঝতেই পারলাম। স্নেহপ্রবণ নেতা কিন্তু আমাকে হতাশ করলেন। বৃথাই ছায়ার সঙ্গে লড়লাম। সারাটা দিন শুধু শুধু 'ক্রড' করে গেলাম।

হালিম সাহেব: কেমন আছ?

আমি: ভালই তো?

উনি: কণ্ট্রোল কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তোমাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।

আমি : সিদ্ধান্ত যখন, তখন আর কী বলার আছে! তবে কে কাকে বহিষ্কার করে?

উনি : বাইরে বেরিয়ে কি করবে?

আমি : কৃষক আন্দোলন।

উনি : ভাল। আরে যাও সে তুং কেও তো ছ'বার বার করে দেওয়া হয়েছিল—তাতে কী হয়েছে? আবার চলে আসবে।

আমি : ওসব নিয়ে ভাবছি না।

উনি : ...এর সঙ্গে তোমার 'রিলেশন' কী রকম ছিল? শি ইজ আ প্রফেশনাল ডিটার?

আমি : কোন মহিলা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। ওসব ভুল-ভাল কথা বলবেন না।

উনি : জানই তো শিগগিরই আমরা মুক্তি পাচ্ছি। জ্যোতিবাবু দু-একদিনের মধ্যে বেরিয়েই দিল্লী যাবেন। ইন্দিরার সঙ্গে কথা হবে। এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই সকলে বেরিয়ে যাবে।

হালিম সাহেব উঠে গেলেন। শৈবালদাকে বললাম। বললেন—জানি। আমাকে হয়ত বাইরে বেরিয়ে শোনাবেন। তাহলে প্রথম বলিটা তুমিই হলে! মনে হল নারকীয় দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলাম।

সত্যিই, খাদ্য আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বন্দীমুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। জনরোষের চাপে লোহার কপাট খুলে গেল ১৯৬৬-র অক্টোবর মাসে।

উপসংহার

নরকের প্রথম স্বাদ শেষ করে আজ সম্পূর্ণ নারকীয় বাতাবরণে চোখ থেকে লালা ঝরা শয়তানদের দ্বারা ঘেরাও। দেবতারা সকলে মিলে সেদিন যে শয়তানের সৃষ্টি করল আজ সে 'আনডনটেড'। সে সব কথা পরে হবে।...'বললাম ওদের, চল জঙ্গল পেরলেই সেই আলোর দেশ', ওরা এল। বলল 'তুমি নেতা, পথ দেখাও,' চললাম অরণ্যের পথে। কাঁটায় পা ক্ষত-বিক্ষত। জঙ্গল কাটতে কাটতে হাতে পড়ল কড়া। পথের আর শেষ নেই। অনুগামীরা বলল—'আর কতদূর?' 'ঐ তো চল না, ভয় কী,' ওদের আশ্বাস দিলাম। ক্রমে জঙ্গল ঘন হল; রাত নামল জঙ্গলের পথে। হিংস্র পশুদের আক্রমণে কিছু সাথী প্রাণ হারালেন। বাকিরা

বলল—“আর কতদূর ?” ‘ঐ তো দিগন্ত ! ভয় কী !’ কে একজন বলল—‘ব্যাটা ভাঁওতাবাজ !’ ‘এত অন্ধকার আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি না যে !’ নিজের হাতে উপড়ে নিলাম নিজের কলজে, তুলে ধরলাম মাথার ওপর। কলজের আলোতে জঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার হল। কিন্তু খালি হয়ে গেল বুক ! কলজে বিহীন বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস ! কে একজন পেছন থেকে ধাক্কা মারল, মুখ থুবড়ে পড়লাম। হাত থেকে ছিটকে গেল কলজেটা। টুকরো টুকরো হয়ে গেল সে। ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র জঙ্গলের রাজত্বে। সে আলোতে জোর নেই তবে তারা জ্বলছে। সমগ্র জঙ্গলময় জ্বলছে। তারা জোনাকি হয়ে জ্বলছে ! (গোর্কি অবলম্বনে) এতদ্বারা প্রথম নরক-স্বাদ শেষ।

। দ্বিতীয় পর্ব।

বন্ধুর পথে সময়ের রথ

জেল থেকে বেরবার পর দেখি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। জেলে ঢোকবার সময় যেটা ছিল 'সম্ভাবনা' সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সমস্ত জেলার প্রত্যেকটা পার্টি ইউনিটে 'বিদ্রোহী'রা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কলকাতা তো বটেই, হুগলি, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, সব জেলা থেকেই ডাক আসছে। 'মিটিং করতে হবে।' কেবল মাত্র ছাত্রদের মধ্যেই নয়, জনগণের মধ্য থেকেও দাবি উঠছে বক্তা হিসাবে শৈবাল মিত্র, আজিজুল হককে চাই। মঞ্চ-বক্তা হিসাবে আমি চিরকালই অপটু। এই সময়েই শৈবালদা গণ-বক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। উৎপল দত্ত, শৈবাল মিত্র ছাড়া কোন জনসভা সে সময় কল্পনা করাও যেত না। বিপক্ষে হরেকৃষ্ণ কোঙার-জ্যোতি বসু। গ্রুপ মিটিং বা বৈঠক সভাগুলোতে আমার উপস্থিতি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠল।

কলকাতার একটা নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম—অভিজাত কলেজগুলোতেও বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাঁচজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে সেখানেও বিক্ষোভ! এটা আমরা দেখে যাইনি। প্রেসিডেন্সি, সেণ্ট জেভিয়ার্স, গোয়েঙ্কা কলেজের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের এই সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য করল—'এই কলেজগুলোতেও শাসক শ্রেণী আর কিছুই দিতে পারছে না। ওদের দেবার ক্ষমতা শেষ!' অফিসিয়ালরা অভিজাত-ছাত্রদের দখল করে তাদের দিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনটা জিততে চাইলেন। অভিজাতদের আভিজাত্যকে কাজে লাগানোর চিরাচরিত দুর্বলতা! তারাও চলতে লাগলেন দু-নৌকায় পা দিয়ে। এক দিকে পার্টি সদস্য-পদের জন্য দরখাস্ত (যখন আমরা ছেড়ে দিচ্ছি!) অন্যদিকে আমাদের জঙ্গীপনাকে কাজে লাগিয়ে অভিজাতরা কূটবুদ্ধির আভিজাত্য দেখাতে লাগলেন। ওঁদের ভাষায় 'টুপি পরানো'।

যাক্ সে সব কথা। নিজেদের কথাতেই আসি। নতুন এ পরিস্থিতি আমাদের ভাবাতে শুরু করল, ছাত্ররা কি শুধু ছাত্র আন্দোলনই করবেন। সাধারণ মানুষ কিন্তু তা চান না। তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের পাশে ছাত্রদের পেতে চান। সুতরাং ছাত্র-আন্দোলনও যে সাধারণ-বিদ্রোহের অংশ, ছাত্ররাও বিপ্লবী স্রোতের

অংশ এটা ঘোষণা করা একান্তই দরকার। এই 'পার্থক্য রেখা টানা'র কাজটা সুষ্ঠুভাবে করার জন্যই 'ছাত্র-ফৌজে'র জন্ম।

যদিও পার্টির সর্বস্তরে বিপ্লবীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি বিপ্লবীদের সব থেকে বড় অসুবিধা ছিল, তাদের কোন কেন্দ্র ছিল না। অফিসিয়ালরা বস্তাপচা তত্ত্ব, বুড়ো-হাবড়া নেতৃত্ব আর কিছু তোষামোদে'দের নিয়েই যে আঘাতটা হানতে পারল তার কারণ এটাই। কেন্দ্র-বিহীন ছোট-ছোট গ্রুপ, বা ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে একটা কেন্দ্রীভূত পার্টির সংগ্রাম (তা সে যত দেউলিয়াই হোক)। হাওড়া-হিতৈষীকে রাতারাতি 'দেশ হিতৈষী' বানানোর পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, মোহিতদার মৃত্যুর পর সে সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে শুরু করেছে। যদিও সুশীতলদা, সরোজদা ছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা পার্টি শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলবদ্ধ জীব। রাত্রের অন্ধকারে, গোপনে যোগাযোগ করতে হয়। অসিত সেন, প্রমোদ সেনগুপ্তদের মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট ইনস্টিটিউটই তখন একমাত্র ভরসা। দেশ-হিতৈষী করার সময় যাঁরা 'ওয়েজ'টা মাসের এক তারিখে পাবার গ্যারান্টি চেয়েছিলেন—তাঁরাই হলেন 'দেশ-হিতৈষী'র হর্তাকর্তা। অদ্ভুত দুটো চরিত্র দেখেছি! মোহিত মৈত্র। পার্টি-বহির্ভূত-সমর্থক। তাঁকে দেখেছি 'দেশ-হিতৈষী' থেকে পয়সা তো নিতেনই না, উল্টে নিজের অধ্যাপনার পয়সা খরচ করে আমাদের আপ্যায়ন করতেন, আবার দেখেছি 'দেশ-হিতৈষী'র পরবর্তী কোন দাশগুপ্তকে ওয়েজ এক তারিখের পরিবর্তে দু-তারিখ হলেই তাঁর 'কলম' ফাঁকা! তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী! তাঁর সংসারও ওয়েজ-নির্ভর ছিল না। স্ত্রী চাকরি করতেন! এই প্রসঙ্গে মাথায় রাখতে হবে মোহিতদা নিজে ছিলেন ক্যান্সারের রোগী, তাঁর স্ত্রী টি-বি আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী, আর তখন একজন অধ্যাপকের মাইনেই বা ক টাকা! একজন পাক্তি বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে একজন পেশাদার বিপ্লবীর তুলনা করে অবাক হতাম! প্রশ্ন জাগত কে বেশি বিপ্লবী? কে বেশি পার্টিজান? সে সব প্রশ্ন আজও তো আছে। কেউ কেউ ভুলতে পারে—সকলে পারে না।

দেশ-হিতৈষীতে তখন ধারাবাহিক ভাবে অশোক মুখার্জি নাম দিয়ে সমর মুখার্জি 'বামপন্থী কমিউনিজমের' আদ্য-শ্রাদ্ধ করে চলেছেন। সমস্ত লেখাটার সারাংশ হল 'শাসক শ্রেণী সমীপে' দাসখতের বয়ান। পুজো সংখ্যাতে প্রমোদবাবু শৈবাল-আজিজুল-লতিফের নাম ধরে প্রবন্ধের নামে খেউড় করেছেন। এর প্রতিবাদে আমরা বিভক্ত। অতএব নিজস্ব কাগজ চাই। 'ছাত্র-ফৌজ' হল সেই কাগজ। নামেই 'ছাত্র'। কাজে বাধা-বন্ধনহীন একটা কাগজ। তবে নৈরাজ্যবাদ

চলবে না। প্রত্যেকেরই স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা আছে। কেন্দ্র-বিহীন বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন তত্ত্ব-আমদানি করছে। সুশীতলদাদের 'চিন্তা', সূর্য সেন নামে একজনের একটা গ্রুপ, দক্ষিণ দেশ, কমিউন, ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্রুপের ছেলেরাই 'ছাত্র-ফৌজে'র ছিলেন। যে যে গ্রুপই করুন, 'ছাত্র-ফৌজে'র ব্যাপারে সকলেই এক। প্রথম সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিল সাতজন, শৈবাল মিত্র, নির্মল ব্রহ্মচারী, বীরেশ ভট্টাচার্য, প্রলয়েশ মিশ্র, প্রদ্যুৎ রায়, দিলীপ পাইন, আজিজুল হক। খাদ্য আন্দোলনের স্মৃতি তখনও মুছে যায় নি। প্রথম সংখ্যা লাল-হেডিং-এ 'মানুষ কেড়ে খাবে না কেন?' আট পৃষ্ঠার সব কটা পাতাতেই খাদ্য-আন্দোলনের স্মৃতিচারণ! শৈবাল মিত্র প্রধান লেখক।

৬২ সালে উগ্র জাতীয়তাবাদের হাতে আমরা যারা চরম লাঞ্ছিত হয়েছিলাম এই কাগজকে ঘিরেই পাল্টা মার দেবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। প্রায় প্রতিটি সম্পাদকীয়তেই জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ করা হত। সাত-এর দশকে 'চীনের চেয়ারম্যানের…' স্লোগানটা যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার একটা কারণ তো এটা বটেই। ৬২-র বদলা হিসাবেই চীন পুজা শুরু হয়েছিল। যে-যতই গালাগালি করুন—আমি এখনও চীন-পুজো'র পক্ষে। কারণ ৬২'র মার এখনও আমার কাছে দুঃস্বপ্ন! 'ছাত্র-ফৌজ'কে তত্ত্বগতভাবে আক্রমণ করতে গিয়ে কোন কোন বোদ্ধা তাকে স্টুডেন্ট্‌স পাওয়ারের প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন, সেই বোদ্ধারা কেবলমাত্র নামটা দেখেই আক্রমণ করেন। ভেতরের কিছু পড়েন নি। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও বুঝতে পারেন নি।

হাজার মত পার্থক্য থাকলেও এক সঙ্গে কাজ করা যায়—'ছাত্র-ফৌজ' তারই নিদর্শন। এরই জন্য 'দেশব্রতী' প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত 'ছাত্র-ফৌজ' ছিল বিপ্লবী-ক্যাডার এবং মানুষেরই মুখপত্র। এর গ্রাহক লিস্ট অন্ততপক্ষে সেই কথাটাই প্রমাণ করে। শিলিগুড়িতে মূল-গ্রাহক এক সাংস্কৃতিক সংস্থা। বর্ধমানে এক অধ্যাপক, মুর্শিদাবাদেও তাই। নদীয়াতে পার্টির দুই সর্বক্ষণের কর্মী: এজেন্ট বললেও এঁরা। বিক্রেতা বললেও এঁরাই।

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রথম মিটিং হয় দীপক প্রিন্টার্সের পেছনের মাঠে। দ্বিতীয় মিটিংটা নানান কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এটা হয় ডাফরিন হাসপাতালের উল্টোদিকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে—বাচ্চুদের বাড়িতে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়:

১। ছাত্র-ফেডারেশন যে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা-সংগঠন সেটা বলিষ্ঠ-ভাবে ঘোষণা করতে হবে। আর জিন্না, সুভাষ, নেহরু ভাঙিয়ে খাওয়া চলবে না।

২। কলেজে পার্টি করব আর পাড়ায় 'গুড্ডী'। এটা ভাঙতে হবে। প্রত্যেককে নিজের নিজের পাড়ার সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

৩। ছাত্র আন্দোলনে অর্থনীতিবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করতে হবে। ছাত্রদের সামাজিক দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে হবে।

৪। এর জন্য মাও সে তুং-এর ৪ মে-র আন্দোলনের ওপর এবং লেনিনের 'যুবক'দের প্রতি লেখা দুটোকে গাইড লাইন করতে হবে। এগুলোর থেকেও বড় কথা হল এই মিটিং থেকেই সিদ্ধান্ত হয় কৃষক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য 'কমরেড আজিজুল হক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবেন।' এবং নিয়মিত কাগজে রিপোর্ট পাঠাবেন। এর আগেই উত্তর বাংলার ছাত্ররা কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার কাজে লেগে গেছেন। কমরেড শৈবাল মিত্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়: 'তাঁদের রিপোর্ট সংগ্রহ করার'। এই সিদ্ধান্তের ফলে 'ছাত্র-ফৌজে'র ৪র্থ, ৫ম, ৭ম সংখ্যায় চারু মজুমদারের বিখ্যাত তিনটি দলিল প্রকাশ করা হয়। (১নং, ৫নং এবং ৭নং দলিল) এক কথায় বলা যায় দক্ষিণ বাংলাতে 'ছাত্র-ফৌজ'-কে কেন্দ্র করেই 'আন্তঃ পার্টি সংশোধন বাদ' বিরোধী কমিটি গড়ে ওঠে। (যদিও তখন এ নামকরণ হয়নি)। এটাই সি পি আই এম এল-এর ভ্রূণ। 'ছাত্র-ফৌজের' এই গৌরবোজ্জল ভূমিকার জন্যই আজও 'ছাত্র-ফৌজ' সি পি এম এবং সরকারি নকশাল—সকলেরই আতঙ্ক। প্রায় প্রতি মাসেই 'গণশক্তি' যে আজিজুল-শৈবালের ভূত দেখে আজও চিৎকার করে, তার কারণও ঐ 'ছাত্র-ফৌজ'। সে ওদের তল-পেটে লাথি কষিয়েছিল। ছাত্র-আন্দোলনের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। নামী-দামী নকশাল নেতারা আর একটু চালাক। তাঁদের অবস্থা 'খেত-মজুর বাবার সিভিল-সার্ভেন্ট-ছেলের' মত। বাবাকে বাগানের মালী বলে বন্ধুদের কাছে পরিচয় করাতে চান। ভদ্রদার তো ভুলে যাওয়া উচিত নয়—তিনি যখন 'আন্তঃ পার্টি সংশোধনবাদ' বিরোধী কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে দক্ষিণ বাংলায় আসেন তখন 'ছাত্র-ফৌজে'র মারফতেই ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিটিং করেন। 'ছাত্র-ফৌজে'র নির্দেশেই ছাত্ররা গ্রামে যাবার পদক্ষেপ নেন এটা তিনি ভুলে যান কী করে? কারণ 'সাতগাছিয়া' কৃষক সম্মেলনে, তিনি আমি সহ উঃ বঙ্গের এবং হাওড়ার কৃষক প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে গিয়েছিলাম। হরেকৃষ্ণ কোঙার আমাদের রিসিভ করে ওঁকে কী বলেছিলেন, ওঁর মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে। হরেকৃষ্ণ কোঙার আমার দিকে চোখ রেখে ওঁকে বললেন—'এই যে! ভদ্রবাবু! তোমাকে তো পাওয়াই যাচ্ছে না! আমি ভাবলাম তুমি বোধ হয় আবার তিন-বিপ্লবীর মত হিমালয় অতিক্রম করেছ!'

এসব নকশাল-বাড়ির ঘটনা ঘটার আগে, এবং 'দেশব্রতী' প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত 'ছাত্র-ফৌজই ছিল দক্ষিণ বাংলায় সংশোধনবাদ বিরোধী প্লাটফরম। অন্তত পক্ষে মূল স্রোত তো বটেই।

আমি চলে যাবার পর (যতদূর মনে পড়ছে) সম্পাদক মণ্ডলীতে অশোক দাশগুপ্ত, অশোক ঘোষ এবং ভাস্কর (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) আসে। এগুলোর জন্য আত্মশ্লাঘা বোধ করছি না। আমাদের সময়ে যদি অন্য কেউ জন্মাতেন তাঁরাও এগুলো করতে বাধ্য হতেন। (অবশ্যই যদি সততা থেকে থাকত।) ভদ্র-দা যে সব ছাত্রদের প্রথম গ্রামে যাবার কৃতিত্ব দিয়েছেন, তারা তখনও 'ক্যাণ্ডিডেট মেম্বরশিপটা', 'ফুল-মেম্বরশিপে' পরিণত করার জন্য তদ্বির তদারকে ব্যস্ত। এরা যে পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যান, তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে দীনেশ-বিমানদের। ওঁরা যদি একটু 'র‍্যাশনাল' হ'তেন, এরা আমাদের সঙ্গে ভিড়ত না। মেডিকেল কলেজ ছাত্র ফেডারেশনের ক্ষেত্রে যে উদারতা পার্টি দেখিয়েছিল ('অটোনমাস বডি'। এমন কি মাদার সংগঠনকে গালাগালি করার অধিকার সহ বিচ্ছিন্ন সংস্থা মানে বিশেষ সংস্থা!) তার সিকিভাগ উদারতা দেখালে এরা আসত না। তার কারণ বোধহয় ওদের (এম সি এস এফ) নেতা ছিলেন নৃপেনদার ভাইপো।

ছাত্র আন্দোলনে মার্কসবাদ লেনিনবাদের এই প্রয়োগের বিকল্পে আমদানি হল এক দিকে ইয়ুং-ফ্রাম স্কিনারের তত্ত্ব, অন্য দিক থেকে আক্রমণ হানল মার-কুইজ, দেব্রের দর্শন। 'গিয়াপ' আর 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান'-কে ছাত্রদের বাইবেল হিসাবে গেলানোর চেষ্টা চলতে থাকে। 'আজকের দিনে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কারণ তাদের হারাবার অনেক কিছু মজুত আছে। তাই আজ বিপ্লবের নেতা যুবক সম্প্রদায় এবং লুম্পেন বাহিনী। কারণ ছাত্র-যুবকদের সামনে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর লুম্পেনরা এই ব্যবস্থার সব থেকে বড় শিকার, এদের হারাবার কিছুই নেই। এরা বিপ্লবের স্বাভাবিক নেতা।' আমাদের মত একটা নড়বড়ে দেশের ছাত্রদের আকৃষ্ট করার পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট নয় কি? এর সঙ্গে উল্টো দিক এসে মিশল, 'যৌন-মুক্তি' আর 'গাঁজা'। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে আমরা ভেসে তো যাবই। এগুলোর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে আমরা ওয়েজ-শোষণ, ভারতের রাষ্ট্র-চরিত্র প্রভৃতি প্রশ্ন হাজির করলাম। আমাদের এই সংগ্রাম ডান-বাম, সরকারি পার্টি সব মহল থেকেই

আক্রমণের সামনে পড়ল। এটাকেই কোন কোন বোদ্ধা তত্ত্বের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের কিছু নেতাও এই মেকি জঙ্গীপনার ফাঁদে পড়লেন। আজও তাঁরা সেই ফাঁদ কেটে বেরতে পারছেন না। ফলে ঘটছে ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং তথ্য -বিকৃতি। কলকাতার বুকে ছাত্রদের মধ্যে আমাদের প্রভাব কমে যাবার আরও দুটো কারণ আছে—১। দক্ষিণ কলকাতার কয়েকজন বাদে প্রায় প্রত্যেককেই পার্টি গড়ার কাজে লেগে গেছেন ফলে ছাত্রদের নতুন প্রজন্মের দিকে নজর দেবার সময় কমে গেছে। ২। ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান তিনটে বড় কলেজের ছাত্রদের 'নিম্নবর্গী' মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাল অভিজাত ছাত্ররা। 'নিম্নবর্গী' মানসিকতার দুটো দিক। একটা বিদ্রোহ, অন্যটা আপস। অভিজাতদের যেমন তারা ঘৃণাও করে, অভিজাত হবার জন্য একটা লালসাও থাকে। আমাদের মত একটা দেশে, শ' কেন হাজার বছরের পরাধীনতা ক্লিষ্ট একটা দেশে গোটা জাতিটাই এই মানসিকতায় ভোগে। নামী দামী কমিউনিস্ট নেতাকেও দেখেছি সগর্বে উচ্চারণ করেন—'আমার অমুক পুরুষ ছিল রায়-বাহাদুর!' ছাত্ররাই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন?

অভিজাত-ছাত্ররা, নতুন প্রজন্মের মানসিকতাটা আমাদের থেকে অনেক বেশি ভাল বুঝেছিলেন। শুকনো, সুদূর প্রসারী ফলের চেয়ে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার আগুনে উত্তপ্ত হতে চান এঁরা। এটা তাঁরা ভাল বুঝেছিলেন। আমাদের নেতারা চিরায়ত মার্কসবাদী তত্ত্বে এতই বুঁদ ছিলেন যে তাঁরা এটা ধরতে পারলেন না। আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করলেন। ওঁরা সব সময়ই ছাত্রদের সামনে কিছু না কিছু কর্মসূচী রাখতেন। তা সে 'তোলা'-ওঠানোই হোক আর 'মাস্টার পেটাই' করাই হোক! ওরা যত বেশি এ সব করেন, আমাদের নেতারা ততই নাক সিঁট্কাতে থাকেন, আর বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। তখনই স্লোগান ওঠে-'ঘটনা ঘটাও। ফয়দা ওঠাও'। কিন্তু সব ঘটনাই যে খারাপ এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা তো রীতিমত প্রশংসার দাবি রাখে। আসলে ভুল মতাদর্শের জন্য ওঁরা স্বতঃস্ফূর্ততার পূজারী হয়ে গেল।

কাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল নতুন প্রজন্মের এই জঙ্গীপনার সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের মতাদর্শের মেল-বন্ধন ঘটা। মফস্বল কলেজগুলোতে কিন্তু ছাত্র-ফৌজের প্রভাব এতটুকু কমেনি। বরং বেড়েই যেতে লাগল। ঢাকুরিয়া কনভেনশনে বার'শো ছাত্র প্রতিনিধির উপস্থিতিই তার প্রমাণ। ডান, বাম, মধ্য, সব দিক থেকে 'ছাত্র-ফৌজে'র ওপর যে আক্রমণ নেমে এসেছিল—সেটাই তার জনপ্রিয়তার

প্রমাণ। আমরা নিজেরা মেরে না ফেললে সে মরত না। এই মেরে ফেলার সিদ্ধান্তটা নেওয়া হল এমন সময়ে—যখন 'ফৌজ' সব থেকে টগবগে, যখন সবে সে যৌবনে পদার্পণ করে নিজেকে বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করছে। - 'বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের' কর্মসূচী যখন পিকিং রেডিও থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হচ্ছে (ছাত্র-ফৌজে প্রকাশিত)। সেই সময়েই আমরা তাকে হত্যা করলাম এবং এতদ্দ্বারা নিজেদেরই নাকচ করে বসলাম। তার খেসারত আজও দিয়ে চলেছি। এটা বললাম কারণ—দীপাঞ্জনের লেখা থেকে জানলাম উনি নাকি আমার কাছ থেকেই স্কুল কলেজ পোড়ানো এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আঘাত হানার কথা প্রথম শোনেন। দীপাঞ্জন বয়সে তো আমার থেকে ছোট হবারই কথা, ওঁর এই বয়সে স্মৃতিভ্রম হল কেন ? কৃতিত্বটা নিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু দুঃখিত, অন্যের ভালটা নিজের বলে চালাতে পারলাম না। দীর্ঘ দিনের সংশোধনবাদী প্রয়োগ বিধির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই ওগুলো এসেছিল। কার মুখ থেকে কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল সে সব তর্কে নাইবা গেলাম। যখন ঐক্যের খাতিরে 'ছাত্র-ফৌজ' বন্ধ করা হচ্ছে,—তখনকার একটা চিত্র তুলে ধরা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৬৭টা কলেজের মধ্যে ১৩৭টা কলেজ ইউনিয়ন এস-এফ এর দখলে। এর মধ্যে ১২৫টারও বেশি একেবারে আমাদের দখলে। এর থেকে এটা পরিষ্কার স্কুল কলেজ ভাঙার রাজনীতির প্রবক্তারা এতগুলো কলেজ ইউনিয়ন দখল করত না। জেলের কথা বলতে বসে এত সব 'কাহানী' শুনালাম। কারণ এই ডামাডোলের বাজারে ইতিমধ্যে আবার একবছর জামাই আদরে ডিটেনশন খাটা হয়ে গেছে। মুক্তি পাবার তিনদিনের মধ্যেই আবার রেইড্ ! সুতরাং চিরতরে বনবাস, বন তো বন ! বনের রাজা সুন্দরবনে চলে গেলাম। ওখান থেকেই একটা কম্বিং অপারেশনে গোটা গ্রাম সমেত গ্রেপ্তার হলাম। শুরু হল সত্যিকারের জেল খাটা। এর আগে পর্যন্ত যতবার জেলে গেছি—হলেও-হতে-পারি মন্ত্রী হয়ে! সি পি আই (এম এল) হয়ে যাবার পর পুলিস এবং প্রশাসন বুঝে ফেলল এরা অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতে আর যাই হোক মন্ত্রী হচ্ছে না। সুতরাং তাদের আসল-রূপে তারা হাজির হল। 'স্যার' থেকে 'শুয়োরের বাচ্চা' হয়ে গেলাম !

ধরা পড়ার পর বেশ গুল মেরে চলছিল। পাকিস্তানের (তখন বাংলাদেশ হয়নি) উদ্বাস্তু বলে। আই বি অফিসারটা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। কারণ আমি যে

গ্রামের নাম বলেছিলাম সেটা ওনার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম। সুতরাং চেনা জানা লোকের নাম করে উনি প্রশ্ন করলেন আমিও উত্তর দিয়ে গেলাম। উনি নিশ্চিত হলেন আমি 'নকশাল' নই। মজুরি খাটতে এসেছি। হাতে পায়ের হাজা সেটা আরও প্রমাণ করে দিল। ওনার শুধু একটাই কথা সাহেবকে একবার দেখিয়েই তোকে ছেড়ে দেব। বসিরহাট চ। কে জানত ছাই ওনার সাহেব আমাদেরই এক প্রাক্তন সহকর্মী। সুতরাং বসিরহাটে সাহেব তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললেন। ব্যাস! আই বি-র তখন পাঁয়তারা দেখে কে!

অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যতবারই আমি ধরা পড়েছি অ্যাকসিডেণ্ট! ইন্‌সিডেণ্ট মাত্র একবার! নিজের কৃতিত্বে পুলিস কোন সময়ই ধরতে পারে নি। ধরার পর আবিষ্কার করেছে, যাক! বাইরে থাকতেই জেল-সম্পর্কে পার্টির সার্কুলার পড়ে এসেছিলাম। (জুনের সার্কুলার)। জেলা-সম্মেলনের পর সরোজদাকে পাকড়াও করে (কালী রায়চৌধুরীর উপস্থিতিতে) জিজ্ঞাসা করলাম—"এ সার্কুলারের বিরোধিতা হয়নি?" সরোজদা বললেন—"না"। "সার্কুলার রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কি জেল খেটেছেন?" সরোজদা ক্ষুব্ধ হলেন। শুধু বললেন—"ঐকমত্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত"। "ঠিক আছে! আমি যতদিন বাঁচব—সার্কুলারকে মান্যতা দিয়ে যাব। কিন্তু এর রচয়িতা যাঁরা তাঁরা একজনও এটা মানতে পারবেন না। আপনারা আবার ৪৯ সালের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সার্কুলারটাকেই কবর খুঁড়ে তুলে আনলেন!" কালীদা থেপে গেলেন। উনি তখন আর সি এস। উনি সার্কুলারের প্রতি জোরালো সমর্থন জানালেন। আশ্চর্য! এই কালীদাই ধরা না পড়তে পড়তেই ভীষণ বিরোধী হয়ে গেলেন। সব নেতাদের ক্ষেত্রেই (যাঁরা শহিদ হয়ে গেলেন তাঁদের কথা অবশ্যই ধরছি না) এই একই কথা প্রযোজ্য। সার্কুলার রচয়িতারা ধরা পড়েন আর সার্কুলারের বাপান্ত করে সরে পড়েন। আমরা যারা বিরোধী ছিলাম আমরা আজও সেটাকেই মান্যতা দিয়ে যাচ্ছি। কারণ? ভুল হোক, সঠিক হোক এর জন্য অনেক রক্ত গেছে। রক্ত দিয়েই এই ভুল শুধরোক! এই আশাতেই ওটা মেনে নিলাম, 'ধরা পড়লে পুলিসকে ছবি তুলতে দেবেন না, হাতে লেখা দেবেন না।' এসব চলে না। হাত-পা বাঁধা একটা লোক—'ছবি তুলতে দেব না' বললেই 'ছবি তোলা বন্ধ হয়ে যায় না।' কৃষক ধরা পড়ে জামিন নেবেন না এটা হতে পারে না। কৃষকের মাটির টান, গ্রামের টান কী বস্তু সেটা যাঁরা জানেন তাঁরা এক কথাতেই বলবেন মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যিকারের কোন কৃষক একদিনও থাকতে পারেন না। সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যাবেন—মাটির টানে। এটাই

কৃষককে বিপ্লবে ঠেলে দেয়। আবার এরই জন্ম তাঁরা বিপ্লবে-বিরোধী হয়ে যান। সুতরাং জামিনের সুযোগ থাকলে কৃষক জামিন নেবেন না এটা হয় না। পরে অবশ্য স্বয়ং চারু মজুমদার আমাদের এই মত সমর্থন করেন—'শ্রমিক-কৃষক জামিনই নিক আর বণ্ডই দিক, তবু তাঁরা বিপ্লবী কারণ তাঁদের জীবনে লড়াই ছাড়া অন্ত পথ খোলা নেই!' এর পর তাহলে জামিন না নেওয়ার ব্যাপারটা কেবলমাত্র, মধ্যবিত্তদের জন্মই পড়ে থাকে, মধ্যবিত্ত ক্যাডার বিশেষ করে যাঁরা গ্রাম থেকে কৃষকের সঙ্গে ধরা পড়েছেন—তাঁদের জামিনে বেরনোর বিরোধী আমিও। কারণ, শহরের ছেলে গ্রামে গিয়ে ধরা পড়লে সম্পন্ন বলে বাবার পয়সায় বেরিয়ে গেলো আর তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে গিয়ে যে কৃষকটা ধরা পড়লেন তিনি জেলে পচবেন এটা চলতে পারে না। তাহলে একটাই পথ খোলা থাকে—পার্টি প্রত্যেককে আইনী উপায়ে বার করুক। অভ্যুত্থানের সময় যখন হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হন তখন একটা সত্যিকারের গোপন পার্টির পক্ষে এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। পার্টিটাই তাহলে আবার উকিল মোক্তারদের পার্টি হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের সামনে পথ তো একটাই। জেল ভাঙা বা পালানো। ৪৮-৪৯ এর সঙ্গে এখনেই ফারাক। সে সময় ছিল বাইরে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্ম জেলের ভেতরে সংগ্রাম গড়ে তোলার লাইন। যার অনিবার্য ফল—জেল দখল। এই কাজ করতে গিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ৪৯ সালের ৮ জুন একজন শহিদ হন, ঐ বছরের জুন মাসের ১০ তারিখে দমদমে তিনজন শহিদ হন। জেল থেকে বিপ্লবী কায়দায় বেরিয়ে আসার লাইন ছিল না। উল্টে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির নামে প্রচারিত এক সার্কুলারে বলা হল "এ সময়ে কমরেডদের কোনক্রমেই বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত নয়…" (জুন-৪৯)। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন-কামী যে কোন পার্টির কাছেই 'জেল-পালানো' ব্যাপারটা সংগ্রামের একটা অংশ। সাতের দশকে যে ভুলটা হয়েছিল তা হল এটাকেই 'একমাত্র' কাজ হিসাবে দেখা। ৪৮-৪৯ এর সঙ্গে সাত-এর দশকের জেল লাইনের মিলও আছে, অমিলও আছে কিন্তু অমিলের কথাগুলো এত অস্পষ্ট ছিল, এত বেশি অ্যামবিগুইটিতে ভরা ছিল যে অসচেতন কর্মীদের চোখ এড়িয়েই থেকে গেল। জেলে আসার পর এসব নিয়ে সরোজদাকে আমি পর পর কয়েকটা চিঠি দিই। তার উত্তরে দূত মারফত মৌখিক এবং লিখিত দুটো চিঠি দেন তিনি। একেবারে ব্যক্তিগত বা স্থানিক সমস্যার প্রশ্নের জবাবে লেখা চিঠি দুটোকেই আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলাম পার্টির লাইন বলে চালানো হল। পরিপ্রেক্ষিত বিহীনভাবে সেই চিঠি দুটো থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি ব্যবহার করে সেগুলোকেও বিকৃত করা হল।

ধরা পড়ার পর বিচ্ছিন্ন করে আমাকে প্রেসিডেন্সিতে ঢোকানো হল। হাত-পা ভেঙে জেলে ঢুকলাম। দু-দিন হাসপাতালে থেকে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলাম। শ' নয়, হাজার হাজার ছেলে, আমি যখন আসি তখনই নকশালবন্দী বলে প্রায় দেড়হাজার ছেলে জেলে আছে। কংগ্রেসী আমলে কিন্তু আমাদের মত কয়েকজনকে ধরার পরেই পি-পি (সরকারি উকিল) নিজের থেকেই স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে 'রাজনৈতিক বন্দী'র মর্যাদা দিয়েছে। এ নিয়ে আমাদের বলতেও হয়নি। নিশীথদা, আমি, অনন্ত সিং ডাকাতি মামলার কয়েকজন ডিভিশন প্রাপ্ত ! বাকি বেশিরভাগ কমরেড সাধারণ বন্দী ! আমার সি পি আই-এর আমল মনে পড়ল। নিশীথদা-কে বললাম, "নিশীথদা, এ ডিভিশন মানে ডিভিশনই, কমরেড-দের মধ্যে 'ডিভিশন' তৈরির চক্রান্ত এটা। এটা ছাড়তে হবে।" সচেতন দায়িত্ব-শীল নিশীথদার প্রশ্নটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না। উনি রাজি হলেন। অনন্ত সিং-গ্রুপের ছেলেরা তখন পার্টির কাছে আত্মসমালোচনা করে পার্টিতে এসেছে। ওদের মধ্যে কাজল পাল ছাড়া আর প্রত্যেককেই 'ওল্ড গার্ড', মানসিক-ভাবে 'ডাকাত' বানিয়ে দিয়েছিল। কাজলও রাজি হল। কিন্তু ওর গ্রুপের অনেকেই তখন রাজি হল না। প্রেসিডেন্সির ছেলেরা তো এক কথাতেই রাজি। সংখ্যায় কম হলেও একটা বিরোধিতা ছিল। আমার মাথায় ষাটের দশকের 'ভোগবাদী' বীভৎস রূপটা আছে। এর বিপরীতে আমি যে আত্ম-নিগ্রহের দর্শনটা চালু করেছিলাম—তার কুফলটাও জানি। তাছাড়া এরকম একটা মৌলিক প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়। এসব ভেবে নিশীথদাকে প্রস্তাব দিলাম, "সকলে মিলে একসঙ্গে থাকলে কেমন হয় ?" 'ডিভিশন', 'নন-ডিভিশন', "সকলে মিলে একসঙ্গে থেকে, নিজেদের খাবার সকলে মিলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাব। নিজেরাই রান্না করে নেব।" নিশীথদা প্রস্তাবটাতে নিম-রাজি, ভবদেব মণ্ডল প্রচণ্ড উৎসাহী। ইতিমধ্যে নব-কংগ্রেসী এবং যুব-কংগ্রেসীরা জেলগুলোতে এজেন্ট ফিট করে ছেলেদের রিক্রুট করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা আরও ভাবিয়ে তুলল। যারা গ্রেপ্তার হয়ে আসছে তাদের মধ্যে শতকরা আশিজনই কিশোর, বাকিরা যুবক। এরা মরতে জানে, মারতে জানে, কিন্তু কেন মরবে, কেনই-বা মারবে—এসব প্রশ্নের উত্তর জানে না। একটা সার্ভে করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, শতকরা সত্তরজনই জানে না, 'পার্টির নাম কী ?' অভ্যুত্থানের যুগে এটা ঘটতে বাধ্য। দলে দলে মানুষ নানান কারণে অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। বেশির-ভাগ মানুষই ব্যক্তিগত কারণেই অভ্যুত্থানে অংশ নেন। অভিজ্ঞতাটা শুধু আমার নয়, স্বয়ং, গোর্কিরও। এইসময় আমার মনে হল জেলকে সত্যি সত্যিই বিপ্লবী

তত্ত্ব এবং প্রয়োগের বিশ্ববিদ্যালয় করা যায়। আমরা যে-কয়েকজন পুরনো এবং রাজনীতি-সচেতন লোক আছি, আমাদেরই এদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেদিক থেকেও একসঙ্গে থাকাটা অনিবার্য ব্যাপার। তৃতীয়ত, যে প্রচণ্ড মেজাজ নিয়ে এক একজন জেলে ঢুকছে, জেলে ঢুকেই সে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। সেই মেজাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে। কংগ্রেসী-পেটাই, মাকু-পেটাই, চামচা-পেটাই চলছে। ফলে যে কোন সময়েই বেশ বড় একটা 'পাগলি' হয়ে যেতে পারে। 'পাগলি' মানে অহেতুক মৃত্যু। এই প্রশ্নটা শুনে খোকন ভট্টাচার্য (অনন্ত সিং-গ্রুপের ওঁর কথাতে পরে আসছি, পরে শহিদ হয়ে যান) বলল, "অত্যাচার তো ভাল, চেয়ারম্যান বলেছেন, যেখানেই অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ !" মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল "এই না হলে ডাকাত !" ওকে বললাম, "কথাটা অর্ধসত্য।" 'কথাটা তখনই পুরো সত্য যখন একটা পার্টি এবং পার্টির নেতৃত্বে একটা ফৌজ অত্যাচারের বদলা নেবার জন্য মজুত থাকে। তা না হলে অত্যাচার হতাশা ডেকে আনে।' আমার এই কথাটা নিয়ে উনি ফিস্-ফিস্ করে প্রচার চালাতে লাগলেন, 'আজিজুল হক চেয়ারম্যান বিরোধী !' থাক সে-সব। উনি তো নিজের প্রাণ দিয়েই প্রমাণ করে গেছেন। নিজের কথার মূল্য (তা সে যত ভুলই হোক) মেটাতে নিজের প্রাণটাই দিয়েছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল এক সঙ্গে থাকা হবে। জেল কর্তৃপক্ষ যে এটা মেনে নেবে তা জানতামই। কারণ ওরা আপাতত ঝামেলা এড়াতে চাইবে। কলকাতার বুকের ওপর একটা জেলে দুম করে হত্যাকাণ্ড চালাবার ঝুঁকি ওরা নেবে না। তবে আমাদেরও সাবধানে থাকতে হবে। ওদের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। ১৪-১৬-১৮ নং এর তিনটে বিশাল হলঘর নিয়ে আমাদের 'নকশাল' ফাইল (জেলের ভাষায়) খোলা হল। ১১০ জন।

৪

ওখানে এসেই সমস্যা। পার্টির ছেলেরা দাবি করল অনন্ত সিং-এর ছেলেদের (ডাকাতদের—ওঁরা বলেছিলেন) নেওয়া যাবে না। ভবদেবদাও (মেদিনীপুরের) ওদের সঙ্গে একমত, আমি এবং নিশীথদা বেঁকে বসলাম, 'তা কী করে হয় ? ওরা যখন পার্টিতে এসেছে ওদের নিতেই হবে এবং দায়িত্ব দিয়েই নিতে হবে।' পি-জি-এস-এফ থেকে আসা দুই সুব্রতর (মুখার্জি এবং সেনগুপ্ত) আপত্তির কারণ অবশ্য অন্য। ওদের কথা 'গ্রুপ মানসিকতা' কী বস্তু তুমি জানো না আজিজুলদা। আমরা এখনও ভুগছি। ওরা এসেই গ্রুপ করবে। ইতিমধ্যেই ওরা তোমার

বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে! এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত, অসীমের পি-জি-এস-এফ-এর ছেলেরা পার্টির মধ্যে একমাত্র আমাকেই একটু সমীহ করত। যে-কোন কারণেই হোক, আমার প্রতি ওদের একটু দুর্বলতা ছিল বা এখনও আছে। শৈবাল মিত্র, নির্মল ব্রহ্মচারী, অসিত সিন্‌হার প্রতি ওরা যত রূঢ় এবং নির্মম ছিল, আমার ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। সুব্রতদের বললাম—"কোনদিন কোন মা-কে বাচ্চাকে স্নান করাতে দেখেছিস? বুকে চেপে পিঠে ঝামা ঘষেন! ওদের ভুলগুলোকে খোসা দিয়ে নির্মমভাবে তুলতে হবে, কিন্তু চেপে রাখতে হবে। না হলে ছিটকে যাবে।" সুব্রতরা রাজি হল। ভবদেবদাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হল না। ওদের আনা হল। কাজলকেই করা হল নেতা। পার্টির নয়, গোটা ফাইলের নেতা হল কাজল।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলের ঘটনা ঘটে গেল। ১৬ ডিসেম্বর ওঁরা সেই জেল-দখলের রাজনীতি আমদানি করতে গিয়ে কয়েক'শ লোককে বলি দিলেন। আমাদের জেলে পি-জি-এস-এফ আগতরা স্লোগান তুলল,—'বাইরে কর্তৃত্ব চারু মজুমদার, জেলের কর্তৃত্ব মেঘনাদ (কি এক দাশগুপ্ত যেন নাম)!' দুই সুব্রতই এর মোকাবিলা করল—'এ হচ্ছে কাকার বাঁদরামো!' 'দেশব্রতী'তে সি এম-এর এই 'হত্যাকাণ্ডের জবাব দিন' লেখাটা বেরল, সঙ্গে সঙ্গে সরোজদার চিরকুট—'পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করার' নীতি পরিহার করার আহ্বান।

এতগুলো জঙ্গী অথচ রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যুবককে সামলানো যে কী দায়! সাত থেকে দশজনের এক-একটা গ্রুপ করে দেওয়া হল। একজন নেতা, একজন সহকারী। প্রতি সপ্তাহে এক একটা গ্রুপ রান্না থেকে স্যানিটেশনের দেখ-ভাল করবেন। কোন 'ফালতু' (সাধারণ বন্দী) খাটানো চলবে না। সন্ধ্যার পর প্রত্যেকটা গ্রুপই রাজনৈতিক আলোচনা করবেন। (১) পার্টির ইতিহাস এবং কর্মসূচী; (২) মৌলিক রচনাবলী; (২) কৃষক সমস্যা—মূলত এই তিনটেই হবে গ্রুপ আলোচনার বিষয়বস্তু। সপ্তাহান্তে গ্রুপ লিডারদের বৈঠক। সেখানে লিখিতভাবে রিপোর্ট রাখতে হবে। মাঝে মাঝে অর্থাৎ মাসান্তে একটা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিজেরাই গান, নাটক, কবিতা লিখে অনুষ্ঠান করা। শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচী—সত্যিই খুব ভাল ফল দিচ্ছিল। তবে আগের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছিলাম কর্তৃপক্ষ এটা বেশিদিন চালাতে দেবে না। ওরা এখন দেখছে ঝামেলাবাজ ছেলেগুলো ভাল এবং আপাত শান্ত হয়েছে তাই একটু স্বস্তিতে আছে কিন্তু এ শান্ত থাকাটা যে ওদের কবর খোঁড়ার প্রস্তুতি এটা ওরা

অচিরেই বুঝতে পারবে। এবং এই 'কনসেনট্রেশনে'র ওপর আঘাত হানবে, কারণ আমরা নিজেদের ফাইলে চলে আসার পর কংগ্রেসী রিক্রুট একেবারেই শূন্য হয়ে গেছে।

এর ওপর এল বাঁদিক থেকে আক্রমণ। অনন্ত সিং-এর গ্রুপ থেকে আসা ছেলেরা যখন দেখল এই শতাধিক যুবকের মধ্যে কোনরকমেই ফাটল ধরাতে পারছে না, ওরা পালের গোদা আমাকেই আক্রমণ করে বসল। সেই ফিস্ ফিস্, সেই ষড়যন্ত্র! একদিন সুব্রত মুখার্জি আর ভোম্বল এসে দাবি করল, 'খোকনকে তাড়াতে হবে! ও বলে বেড়াচ্ছে তুমি নাকি সি এম বিরোধী, জেল ভাঙার বিরোধী!' ওদের শান্ত করে খোকনের সঙ্গে বসলাম। কথা ঘোরাতে না পেরে এবার ও সরাসরি চার্জ করল—"তুমি এই সব তত্ত্বকথা পড়াচ্ছ কেন ছেলেদের? সি এম বলেছেন, শুধু তিনটি লেখা আর রেডবুক পড়তে!" অবাক হয়ে ওকে দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—'রেডবুকে'র একটা উদ্ধৃতিও তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে? যেখান থেকে উদ্ধৃতিটা নেওয়া হয়েছে সেটা না পড়ে একটা উদ্ধৃতিও বুঝতে পারবে? সি-এম-এর কথাটা যে পড়ার অভ্যাস তৈরি করার জন্য এবং আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এটা না বোঝার মত বোকা তো তুমি নও বাপু! কী চাইছ বল তো?

ও চুপ করে থেকে বলল, "জেল পালাতে হবে।"

আমি: একশবার। তোমার পরিকল্পনা শুনি।

খোকন: কিচেনের পেছনের পুরনো টিন বাক্সের যে গুদাম ঘরটা আছে ওখান থেকে টানেল করেই পালাতে হবে।

আমি: ধরেই নিলাম দিন দুপুরে সকলের চোখ এড়িয়ে তুমি এই দু'শ গজ টানেল করলে। তারপর ১১০ জন একে একে পালাতে কত সময় লাগবে? ততক্ষণও কি কেউ দেখবে না ভাবছ? কম করে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। সেটা হিসাব করেছ?

খোকন: সকলকে নেবার দরকার কি? জনা দশেক important কমরেড গেলেই হবে।

হোঁচট খেলাম! বলে কি! "বাকিরা?" আমার আর্তনাদ। "বিপ্লবের জন্য এসেছে, মরবে!" ওর নির্বিকার উত্তর।

শান্ত গলায় বললাম, "তুমি তোমার দশজন important কমরেড নিয়ে পালাতে চাও তো পালাও, আমি বাকিদের সাথে থেকেই মরব। কাউকে জেনে বুঝে মরার জন্য রেখে যেতে পারি না আমি।"

ওর গলা ধরে গেল, বললে, "দেখ, আমরা ডাকাতি করে এসেছি। আমি বাইরে গিয়ে বিপ্লব করতে চাই।" ব্যক্তিগত আবেগ মানুষকে কেমন নির্মম করে দেয় সেদিন খোকনকে দেখে শিখলাম। সমস্ত আলোচনার নোট বাইরে সরোজদার কাছে পাঠালাম। পরে শুনেছি, খোকনরা পালাবার পর সরোজদা এই কারণেই নাকি ওদের পার্টিতে ঢুকতে দেননি দীর্ঘসময়। সাধনবাবুর বদান্যতায় পরে ওরা পার্টিতে আসে।

এরই জন্য, জেলের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি অনেকের মত সরোজদাকে কোন সময়েই দায়ী করতে পারিনি। উনি সমস্যাগুলো বুঝতেন। ওঁর শহিদ হয়ে যাবার পর তো যিনি দায়িত্বে এলেন গ্রেপ্তার হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আগুন খেতেন, আগুন ছাড়তেন। তিনিই আমাদের ঐক্যতে প্রথম ফাটল ধরালেন। তাঁর স্নেহভাজন কয়েকজনকে তিনি বাইরে থেকে লিখে পাঠালেন, 'কারা সেই শুয়োরের বাচ্চা? যারা জেল বিদ্রোহকে, শ্রদ্ধেয় নেতার লাইনকে আক্রমণ করেছে', ভাগ্যের পরিহাস! রিটায়ার্ড বনেদী জজসাহেবের মত টসটসে চেহারা নিয়ে জেলে ঢুকে প্রথম দিনই তিনি ঘোষণা করলেন, "আমাকে ডিভিশন দিতে হবে! এ-সব গু-গোবর আমি খেতে পারব না।" সরোজদার সঙ্গে ওদের ফারাকটা এইখানেই। সরোজদা নিজে যেটা পারবেন না বলে মনে করতেন, সেটা অন্যকে করতে বলতেন না। তাই সরোজদার শহিদ হবার খবর শুনে তাঁর শেষ কথাটাই বার বার মাথার ভেতর হাতুড়ি পেটা করেছিল—'লড়াইয়ে শুধু বাহিনীই মরবে তা কী করে হয়? সেনাপতিদেরও দু-চারজনকে মরতে হয়!' ঠিক এখানটাতেই আবার সরোজদা আর চারুদার ফারাক। সুন্দর-বনাঞ্চলে কাজ করার সময় আমাদের তিনজন কমরেডের হত্যার ঘটনায় আমি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যে একটা মারাত্মক আত্মহননকারী অ্যাকশনের পরিকল্পনা নিই। আমি নিজেই সেই অ্যাকশনের স্ব-নিয়োজিত কমাণ্ডার হয়ে যাই। সি-এম সেই পরিকল্পনার কথা কোনরকমে জেনে যান। ওর দূত এসে জানালেন, সি-এম বলেছেন, 'বিপ্লবের স্বার্থে আমরা যেমন কমরেডদের আত্মত্যাগের কথা বলি, বিপ্লবের প্রয়োজনে তাঁদের রক্ষার কথাও ভাবি, ওকে (অর্থাৎ আমাকে) এ-সময় হারানোর ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' থাক ওসব কথা। অফ দ্য রেকর্ড কথার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু? যদি বলি সরোজদা আমাকে জামিনে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন কে বিশ্বাস করবে সে কথা? সরোজদার ভক্তরাই—'চারু-সরোজে'র যে ইমেজ তৈরি করেছে এবং শাসক-ঐতিহাসিকরাও সেই ইমেজটা-কেই কাজে, লাগাচ্ছে তা হল ঐ দুজন লোক 'খালি রক্ত খেত।' শবসাধক দুই

তান্ত্রিক। তাঁদের উদ্বেগ-হাসি, চোখের জল এই ইমেজের কাছে অনৈতিহাসিক উপাদান। কিন্তু আমার মত জীবিতদের কাছে তাঁদের ইতিহাস আর একরকম। বোধহয় এটাই অন্যতম কারণ যার জন্য সরোজদা, সি-এমের ঘনিষ্ঠ লোকরা পরবর্তী চারু মজুমদার পন্থীদের সঙ্গে মিলতে পারলেন না। এটাই ওঁদের ট্র্যাজেডি। অবশ্যই এর শুরু মার্কস থেকেই। বৃদ্ধ নাস্তিক ইহুদিটা যখন বলেন "ভগবান রক্ষা করেছেন! আমি মার্কস, মার্কসপন্থী নই"—তখন এই সমস্ত চিন্তাবিদদের চিন্তার আর একটা দিক সম্বন্ধে ভাবতে হবে বৈকি!

৫

আমার আশঙ্কা যে সত্য, সেটা প্রমাণ করার জন্যই বোধহয় জেলরবাবু একদিন এসে অনুরোধ করলেন—"হোম থেকে গোপন নির্দেশ এসেছে আপনাদের বিভিন্ন ফাইলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে হবে।" হাসতে হাসতে জেলরকে বললাম (ছাত্র আন্দোলনের সুবাদে পরিচিত বলে ওকে তুমিই বলতাম)—"তোমার হোম আর বিপ্লবীরা দেখছি একই রকম চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। আমাদের তথাকথিত বিপ্লবীরাও একই রকম নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে। কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে আমার একটু অন্যরকম ধারণা আছে। তাই উভয় পক্ষকেই আমি হতাশ করতে বাধ্য হলাম। যেমন আছে সে রকমটিই থাকবে।"

যেহেতু নির্দেশটা 'হোমে'র সুতরাং আজ হোক কাল হোক জেল কর্তৃপক্ষ 'কনসেনট্রেশন'টাকে আঘাত করবেই। করতে বাধ্য। এরকম অবস্থায় আক্রমণই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সময়ই সরোজদার চিঠিটা এল, তাতে তিনি বললেন—সামাজিক মর্যাদা ওরা সকলকে দেয় না, আমরা ওদের দিতে বাধ্য করব। আর এই বাধ্য করার সংগ্রামের ভেতর দিয়েই আমরা বিপ্লবী থাকতে পারি। প্রত্যেকটা গ্রুপ লিডারকে ডেকে এই কথাটার ব্যাখ্যা দেওয়া হল। ব্যতিক্রম-হীনভাবে প্রত্যেকেই বললেন—"যারা ধরা পড়ছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবির সংগ্রাম।" সেইমত কর্তৃপক্ষকে নোটিস দিয়ে অনশনের পথে নামা হল। আমার মাথায় বদবুদ্ধি—ওদের এই সব প্রশ্নে ব্যতি-ব্যস্ত করে তুললে—আর যাই হোক কনসেনট্রেশনটাতে আপাতত ওরা আক্রমণ করবে না। জেল-ভাঙার জন্যও এটা দরকার। 'পালানো' আসে পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে। গ্রুপ এবং ব্যক্তি স্বার্থের চিন্তা এর উৎস। শতাধিক বন্দীকে নিয়ে পালানো যায় না, জেল ভাঙতেই হয়। আমরা (আমি সহ—আলাপ-আলোচনার জন্য আমাকে বাদ রাখা হল) জনা ছয়েক শুশ্রূষাকারী বাদ দিয়ে

শতাধিক বন্দীর এই অনশন কর্তৃপক্ষকে পাগল করে দিল। দুদিন পর আমারও পাগল হবার যোগাড়। রাজনৈতিকভাবে খুব দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী ছাড়া অনশনের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া রীতিমত কষ্টকর। দুদিন পরই পাঁচজন সাতজন করে অনশন থেকে নাম প্রত্যাহার করছে। কর্তৃপক্ষ জানতে পারলে ভোগান্তির সময়টা আরও বেড়ে যাবে—এই ভেবে ওদের জন্য চুপি চুপি খাবার কিনে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হল। এবার আক্রমণ এল একেবারে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে। অনন্ত সিং গ্রুপের কয়েকজন (কাজল বাদে) এবং পি জি এস একের একজন হঠাৎ ওই সমস্ত ছেলেদের মধ্যে প্রচার চালাতে শুরু করল—'আজিজুল হক গান্ধীবাদী রাজনীতির আমদানি করছে। কমরেডদের দুর্বল করে দিচ্ছে যাতে তারা না জেল ভাঙতে পারে'। ভোম্বল, শ্যামল (কসবার) তো ওদের পেটাবেই ঠিক করে ফেলল। ওদের শান্ত করলাম। প্রচারকারীদের সঙ্গে একে একে বসে দেখালাম কেন জেলে 'অনশন'ও লড়াইয়ের একটা ধরন, এবং সশস্ত্র সংগ্রামেরই অংশ। দেশব্রতীতে আরাফতের পি এল ও-দের 'অনশনে'র খবর এবং ছবি বেরিয়েছিল সেটাও দেখালাম। সরোজদার সম্পাদকীয় মন্তব্যটাও পড়ালাম। ওরা চুপ করে গেলেন। কিন্তু সত্যিই গ্রুপ মানসিকতা বড় সাংঘাতিক বস্তু। সি পি আই এম-এলের আজ এই অবস্থার অন্যতম কারণ—গ্রুপগুলোকে পার্টির মধ্যে আনা। এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ৭৭-৮২র পরও আমরা যে আবার ছিন্ন ভিন্ন হলাম তারও কারণ এটাই। ৭০-৭২-এ, এ ভুল করেছিলেন সরোজদা, ৭৭-৮২তে সেই ভুলই করলাম আমি। এ ব্যাপারে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কারণ ওরা আমাদের প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। খোকনরা নেতিবাচক আক্রমণ করে ওদের উত্তেজিত করে 'কতদূর এগিয়েছি' সেটাই বার করতে চাইছিল। পরে ওদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সব জেনে-শুনে তোরা ছ'জন পালাতে গিয়ে আমাদের একশ জনের পালানোটা ছ'বছর পেছিয়ে দিলি কেন?" খুব অনাবিল উত্তর: "পার্টির নেতৃত্বে জেল-ভাঙা হলে আমাদের কথা তো প্রচার হত না। তাই আমরা পার্টিকে ব্যবহার করে তোমাদের হেয় করলাম।" কিছু বলার নেই। সি পি আই এম-এল ঘোষণার পর বিভিন্ন গ্রুপগুলো বেনো-জলের মত পার্টিতে ঢুকে পার্টিকে তার সাধারণ স্রোত থেকেই সরিয়ে দিল। মূল স্রোতটাই অন্য খাতে বইতে শুরু করল। ঠিক দুঃসময়ে গ্রুপের 'বাবাজী'রা স্ব-মূর্তি ধারণ করে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর অভিসম্পাত করতে করতে সরেও পড়লেন। তাঁদের গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। নষ্টের ওপর ঘেন্না হয় এটাই ভেবে যে ৭০-এর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও

মনের প্রসার দেখিয়ে ৭৭-এ একই ভুল করলাম। ওই সমস্ত বেনোজলদের আবার আপ্যায়ন করে প্রতিষ্ঠা করলাম। না অনুশোচনা নেই। আবারও সেই ভুল করতে রাজিও আছি। দেখি কত দিনে ওরা নিজেরা নিজেদের না-পাপ্টে রাখতে পারে?

যাই হোক ছ'দিন পর প্রয়াত এম পি ভূপেশ গুপ্তের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হয়। তখন রাজ্যপাল শাসন। ঠিক হয়—যাঁরা ধরা পড়বেন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মীর মর্যাদা ওরা দেবে, তবে নতুন যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য পৃথক একটা 'ফাইল' খোলা হবে। ১৬-১৮ নং এ আর ওরা ভিড় বাড়াতে দেবে না। এরকমভাবে দুঃশাসনদের কাছ থেকে রাজনৈতিক মর্যাদা আদায় তো করলাম কিন্তু আমার মাথায় আসছে ৬৪-৬৬-র সেই বীভৎস জীবনযাপন পদ্ধতি! ভোগ সর্বস্বতা! একবার ওই পাঁকে পড়লে এই বাচ্চা ছেলেদের টেনে তোলা মুশকিল! কমরেডদের বোঝালাম মর্যাদা জিনিসটা খাওয়া-পরার মধ্যে লুকিয়ে থাকে না। আমরা সাধারণ বন্দীদের খাবারটাই খাব। তবে যাতে অথর্ব না হয়ে যাই তার জন্য নিজেরা খেটে নিজেদের খাবারটা বানিয়ে নেব। অন্যের পরিশ্রম ভোগ করব কেন? সুতরাং জেল-ইতিহাসে ডিভিশনবিহীন রাজনৈতিক বন্দীর আবির্ভাব ঘটল। এর একটা পৃথক গভীরতা, পৃথক মর্যাদা সৃষ্টি হল। সাধারণবন্দী—সিপাই এমন কি অফিসাররা পর্যন্ত নতুন এই বন্দীদের দেখে সম্ভ্রমে মাথা নিচু করে কথা বলতে শুরু করলেন।

এই অনশন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত করে দিল। আমি বুঝলাম:

১। 'মাস হাঙ্গার স্ট্রাইক' টোকেন করা যায়—কখনই অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় না। একজনের দুর্বলতা কম বেশি গোটা দলটাকেই দুর্বল করে দিতে পা'র। দুর্বলতা এবং ভয় বস্তুটা ভীষণ ছোঁয়াচে।

২। অনির্দিষ্টকালের জন্য 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করতে গেলে ব্যক্তি কিংবা ছোট গ্রুপই ভাল। ব্যক্তিদের বাইরে রাখ।

৩। কখনও অন্য কারও সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ো না। তোমার হাজার ইচ্ছা এবং দৃঢ়তা থাকলেও ঠিকমত প্রতিরোধ দিতে পারবে না। অবশ্যই যদি তুমি অতিমানব বা শয়তান হও তবে পৃথক ব্যাপার।

দুই সুব্রতকে দিয়ে নিউ-ওয়ার্ডে নতুন ফাইল খোলা হল। অনন্ত সিং গ্রুপের ছেলেরা কোন সময়েই পার্টির কাছে মন খোলেনি। তারা পার্টিকে এমন একটা প্লাটফরম হিসাবেই দেখেছে—যেখানে থাকলে কিছু সুযোগ পাওয়া যায়, মর্যাদা পাওয়া যায়। পি জি এস এফ থেকে ছেলেদের মধ্যে একজন বাদে

প্রত্যেকেই কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পার্টিতে ছিল। এই একজন (তার সঙ্গে নাকি কাকার হট লাইনে যোগাযোগ) বার-বার মেদিনীপুরের জেল-দখলের লাইন ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন। যাই হোক সুব্রত এবং নিশীথদা ওকে সামলে রেখেছিল, বাইরে 'নকশাল' করে মানে মার দাঙ্গা করে ধরা পড়ার পর জেলে এসেই বেরুবার জন্য ছটফট করত যারা সেই সমস্ত ছেলেদের একটা বড় অংশ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লাইন করতে শুরু করল। (কং) সুব্রত মুখার্জির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এরা একটা আলাদা ফাইল খুলে বসল। 'রাজনীতি' বিহীন—জঙ্গীপনার করুণ পরিণতি দেখেছিলাম সেদিন। ঘটনা ঘটিয়ে নিজের ফায়দা ওঠানো যায় এটা হয়ত সত্য কিন্তু অরাজনৈতিক ঘটনা—অংশগ্রহণকারীদের পাঁকেই ঠেলে দেয়। ইতিহাসের গতি মাঝপথে সাময়িক ভাবে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কোন সারথির পক্ষেই তখন আর সম্ভব নয় সেই রথকে রাস্তা না সারিয়ে ঐ গর্ত-খোঁড়া রাস্তা দিয়ে নিয়ে যান। সময়ের অপেক্ষায় এই রথকে হোঁচট খেতে খেতেই এগোতে হবে। অন্য কোন পথ নেই। এটা নির্মম সত্য।

প্রথম পাগলি

ভোম্বল ওরফে অজয় দে। বেলঘরিয়ার ছেলে। ভিলাই-এর চাকরি ছেড়ে চলে আসে। বিহারে কিছুদিন সত্যনারায়ণ সিংয়ের তত্ত্বাবধানে থাকার পর ফিরে এসে ইনু মিত্রের রাহাজানি আর মস্তানির বিরুদ্ধে বেলঘরিয়ার মানুষদের সংগঠিত করে। প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে তোলে। মাথাটা একটু মোটা, কিন্তু জানতে এবং বুঝতে চাইত। এক ডাকাতি কেসে ফেঁসে যায়। ফলে ভীষণ হীনম্মন্যতায় ভুগত। একদিন হঠাৎ ভোম্বল উত্তেজিত ভাবে এসে বলল নির্মল সেপাই সি-এম আর পার্টির মা-বাবা তুলে গালাগালি করছে। আমারও মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, "তা, শুনে এসেছো তো? এখন বলছো কেন?" রাতের বেলাতেই ভোম্বল-শ্যামল-বিপ্লব-হালিম হাজির। ওরা স্কোয়াড তৈরি করেছে—নির্মলকে মারবে। প্রমাদ গুনলাম। নিশীথদা তো শুনে ফায়ার। কলকাতা জেলা কমিটির আরও তিনজন আছেন। কলকাতা জেলা কমিটির ৪ জন এবং আমি—এই হচ্ছে পার্টি সেল। নিশীথদা বাদে বাকি তিনজন তিন অবতার। ওঁদের একজন তো একদিন বলেই বসলেন—"ময়দানের লেনিন মূর্তিটা আমাদের ভেঙে ফেলা উচিত। ওটা সংশোধনবাদীদের লেনিন।" শুনে নিশীথদাকে বললাম—"ও দাদা, এ কা'দের

নিয়ে পার্টি করছেন?" স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নিশীথদা হেসে উঠলেন। "এখন আমার পার্টি। এই মাল সব রেখেই তো গ্রামে পালিয়ে গেলে? তুমিই সামলাও!" সামলাবো কি তাঁদের তখন। কলকাতার আগুন-খেকো সম্পাদকের সাথে হট্‌-লাইনে তাঁদের যোগাযোগ। সেই সম্পাদক তখন বিচিত্র সব ফরমান জারী করে চলেছেন। শুনি আর আঁতকে উঠি। একবার উনি ফরমান দিলেন 'দু-হাজার টাকার বেশি মাইনে যারা পায়—সকলেই শ্রেণী শত্রু!' সি-এম সেটা রুখলেন। তারপর ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন এক সি পি এম নেতার মেয়ে ওখানে পড়ে তাকে কিডন্যাপ করতে হবে। তবুও চেষ্টা করলাম। বললাম—"দাদা, রাশিয়াতেও বিপ্লবের আগে এবং পরে এইরকম প্রশ্ন উঠেছিল। একদল দাবি করেছিল বুর্জোয়া-রেললাইন উপড়ে ফেলো। বুর্জোয়া-ভাষা ধ্বংস করে সর্বহারা ভাষা চালু কর। স্বয়ং স্তালিনকে এ প্রশ্নের মোকাবিলা করে—ভাষা সমস্যার বই লিখতে হয়েছিল!" ওঁদের উত্তর আরও বিচিত্র—'ও সব স্তালিন ফালিন এ যুগে চলবে না। তিনটে লেখা আর রেড বুকই যথেষ্ট! এস-এস তাই বলেছেন!' বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—'হায়! চারুদা!' 'শত্রুর নির্যাতনের মুখে এরা এক একজন বীর কিন্তু এ বীরত্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কী কাজে লাগবে? চিন্তার জগতে এঁরা কোথায় পড়ে আছেন!' পার্টি কমিটির এ হেন কমরেডরা ভোম্বলদের প্রস্তাব শুনেই লাফিয়ে উঠে সায় দিয়ে দিলেন। ভোম্বলদের মাথাতেও নির্মলকে মারার ব্যাপারটা ছিল না। আমার তখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে। এই প্রথম দেখলাম নিশীথদা খেপে গেলেন—"গালাগালি করেছে তো কী হয়েছে? শত্রু গালাগালি করবে না তো চুমু খাবে? গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে? নির্মলকে মারা মানে পাগলি ঘন্টিকে আমন্ত্রণ জানানো। এতে আসল কাজটা এগুবে?" কে শোনে কার কথা? পার্টি সেলের মিটিং সেরে ভোম্বলদের বললাম। ঠিক আছে! তবে তোমরা নির্মলকে মেরেই হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে যেও। কিশোরীকে বলবে গেটে তালা মেরে চাবিটা ভেতরে ছুঁড়ে দিতে। ওদের চোখ চকচক করে উঠল। উপোসীরা খাবার পেয়েছে। দ্বিতীয় কাজ হল সব গ্রুপ নেতাদের ডেকে বলে দিলাম সকাল থেকে কেউ কোথাও যাবে না। ওরা অবাক হয়ে আমাকে দেখল। কারণ আজিজুলদার এ রকম কণ্ঠস্বর ওরা শুনতে অভ্যস্ত নয়। গলার স্বরেই বোধ হয় কিছু একটা ছিল কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। খোকন আর কাজলকে পৃথক ভাবে ডেকে বসলাম। মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করছিল। ওরা ভিন্ন গ্রুপের ছেলে যদি ওদের কিছু হয়ে যায়—নিজের কাছে কোনও

কৈফিয়ত দিতে পারব না। এই প্রথম খোকন যা বলল—আমার মনের কথা। অর্থাৎ মানসিক ভাবে দুজনে এক জায়গায় মিললাম। কিন্তু আমি নাচার। আমাকে তখন পার্টির সিদ্ধান্তগুলোই বলতে হচ্ছে। ওকে বোঝালাম—কেন নির্মলকে মারাটা ঠিক। বিশ্বাস করছি না অথচ বলতে হচ্ছে। কি যন্ত্রণা, কি-যন্ত্রণা! 'এই প্রভোকেশনকে কেন্দ্র করে ওরা যদি ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়?' খোকনের প্রশ্নের জবাবে একটা উকিলী যুক্তি হাজির করে দেখলাম তাই তো ব্যাপারটা ঠিক এই রকমই হবে! "দেখ, সাধারণ সিপাইরা না-জেনে খুন করতেই এখানে আসবে। কিন্তু জেলার-সুপার এ ঝুঁকি নেবে না। কারণ বহুত বড় বড় আমলার সবেধন নীলমণিরা এখানে আছে। সিপাইরা তো গড়পড়তা মারবে, ওদিকে জেলার সুপারকে কৈফিয়তে কৈফিয়তে জেরবার হতে হবে। তাই ওরা এবারটা হজম করে নেবে। তবে তক্কে তক্কে থাকবে। বিচ্ছিন্ন করে পেটাবে।"

খোকনদের তো ভরসা দিলাম, কিন্তু নিজের মনের মধ্যে ভরসা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়? আমাদের 'পাহারা'টা ছিল খুবই ভাল। আসানসোল অঞ্চলের লোক, কোলিয়ারীতে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ঝামেলায় মার্ডার করে যাবজ্জীবন খাটছে। শ্রমিকসুলভ গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়নি। কাজলের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিল। খোকনদের বিদায় দিয়ে পাহারাকে নিয়ে পড়লাম। আমি, কাজল আর নিশীথদা। নিশীথদা নিজস্ব কায়দায় খুব ক্যাজুয়ালি পাহারাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, পাগলি হ'লে বাঁচার সব থেকে ভাল রাস্তা কী?" সে বেচারাও ভাল মানুষের মত বলে দিল—"সেপাই তোলা। সেপাইকে আটকে পাগলি ফোর্সকে ফিরে যেতে বলা!" ওর কথা শুনে আমরা তিন জনে তিন জনের দিকে তাকালাম। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"হোস্টেজ! দ্য আইডিয়া!"

সাত-এর দশকে, জেলের সাধারণ সিপাহী বা বন্দীদের দিয়ে আমাদের মোকাবিলা করানো যায়নি। অন্তত পক্ষে যে সমস্ত জেলে আমরা রাজনৈতিক কাজ করেছি, সেখানে তো যায়ই নি। প্রেসিডেন্সিতে তো তিনশ সেপাইয়ের মধ্যে ২৫০ জনই আমাদের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। এরই জন্য অন্যান্য জেলে যখন সিপাহী আর নকশাল দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে, প্রেসিডেন্সিতে সিপাহী ইউনিয়নের তরফে নোটিস দিয়ে—'নকশাল বন্দীদের আত্মীয়-স্বজন-মা-বোনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন। তাদের বসার এবং বিশ্রামের দিকে নজর দিন।' এইরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য এটা আমাদেরই নির্দেশ মত হয়েছিল। সুতরাং সাধারণ সিপাহী বা বন্দীদের থেকে কোন হামলার আশঙ্কা ছিল না।

আমরা যদি কোন সিপাহী বা বন্দীকে মারি—সাধারণ সিপাহী বা বন্দীরা ধরেই নেবে—লোকটা খুবই বদ। মার খাবার কাজ করেছে বলেই মার খেয়েছে। এইরকম অবস্থা দেখে সেই প্রথম জেলে সরাসরি ডি সি ডি ডি এবং ডি সি এস বি-র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কেস টেবিল রিজার্ভ পুলিস (সি আর পি) বলে একটা বাহিনী গড়ে ওঠে। এদের কোনও ডিউটি করতে হত না। ৫০/৬০ জনের এই বাহিনীর বেশিরভাগ লোকই অবাঙালী। বাঙালীরা হল কংগ্রেসী সুব্রত-লক্ষ্মীর সুপারিশে ভর্তি হওয়া লোকাল মস্তান। এই প্রসঙ্গে পরের একটা কথা আগে বলে নিই। এবারে দেখছি এরাই সব বামফ্রন্ট সরকারের দুই পার্টিরই ইউনিয়নের নেতা। এই সি আর পি-র কাজ ছিল সারাদিন কুস্তি করা। এদের জন্য জেল হাসপাতালের আলাদা ডায়েট ছিল। ৫০০ গ্রাম মাংস, ২০০ গ্রাম মাঁছ, ৮টা ডিম, ২ লিটার দুধ, ৪টে কলা, ২০০ গ্রাম আপেল, ১ পাউণ্ড রুটি। কাজ? সকালে-বিকেলে মাসল দেখাতে দেখাতে জেলে ঢোকা। বিভিন্ন ফাইলে হামলা চালিয়ে ছিনতাই করা। প্রেসিডেন্সির সি আর পি ইনচার্জ বোম্বাইয়া তো বেশ মজার ব্যবসা চালু করেছিল। সকালে বিভিন্ন ফাইলে করে 'গাঁজা' (থাম) উদ্ধার করত। তারপর সেগুলো বিক্রি করত বিকেলে। আবার সকালে কেড়ে নিত। বিনা পুঁজির ব্যবসা। —সুতরাং মোকাবিলা করতে হ'লে এই পোষা গুণ্ডাবাহিনীটারই মোকাবিলা করতে হবে।

কাজল স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিল ডিউটি-সেপাই তিনজনকে ওপরে তুলে আনবে। সকাল থেকেই 'চৌকা'র (কিচেনের) সরঞ্জাম লুকিয়ে লুকিয়ে ওপরে তুলতে হবে। খুন্তি, বঁটি এইগুলোই শেষ অস্ত্র। নিশীথদার ওপর দায়িত্ব থাকল কোন কমরেড যেন বন্দী সেপাইদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে সেদিকে নজর রাখা। কারণ ওদের অবস্থা 'বাদুড়ের গোলাম ছুঁচো/ছুঁচোর গোলাম চামচিকে/তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।' বন্দীদের বন্দী। মজার খেলা! ষড়যন্ত্র করে যখন শুতে যাচ্ছি রাত তিনটে। কাজল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। ওর মুখের দিকে তাকালাম। "দেখ আজিজুলদা, যারা প্রায় ম্যাণ্ডেট দিয়ে তোমাকে ময়দানে নামাল তারা কেমন নিশ্চিন্তে নির্বিকার ঘুমুচ্ছে!" তাকিয়ে দেখি—তিন নেতা তিনটে বিছানায় গভীর ঘুমে! ওকে বললাম—"এটা তো কম পাওয়া নয়। কত বিশ্বাস বল্?" "বিশ্বাস না ছাই! দেখবে এরাই সবচেয়ে আগে বণ্ড দিয়ে বেরুবে। তুমি একটা নির্বোধ পাঁঠা!" ও প্রায় ভগবানের মত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সেদিন। আসলে কাজলটা সত্যিই আমাকে ভালবাসত। এরই জন্য খোকনের সাথে ওর দ্বন্দ্বও ছিল।—"খোকন

ঠিক তোমাকে বুঝতে পারছে না। তুমিই যে ওকে পার্টিতে টিকিয়ে রেখেছ এটা ও বুঝছে না। ওর ধারণা ওর পার্টিতে আসার ব্যাপারে তুমিই বাগড়া দিচ্ছ।" থাক সে সব কথা। আমিই কি ছাই খোকনকে বুঝতাম? বুঝতাম কিছু একটা করার জন্য ও ছটফট করছে? নিজের কৃত-পাপটা মুছে ফেলে ও কমিউনিস্ট, বিপ্লবী হতে চাইছে? আমিও ভাবতাম—'ও নিজের আর নিজের গ্রুপের কথাটাই বড় বেশি ভাবে, নিজের ইমেজ গড়ার জন্য একশ জন বাচ্চা ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতেও ওর দ্বিধা নেই। ও স্বার্থপর। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, কিন্তু মরে গিয়ে স্বার্থপরের মত ও বাঁচতে চায়! এ কি ধান্দাবাজি! দায় নেই দায়িত্ব নেই মরে গেলেই হল?' কাজলকে বললাম—"দেখ্ কাল যদি সত্যিই কিছু হয় কে থাকব, কে থাকব না তা তো জানি না, তাই আজ আর কোন বিতর্ক নয়।" ও থামিয়ে দিল, "চুপ কর তো তুমি! তোমার ঐ তিন নেতা ঠিকই থাকবেন আর বলে বেড়াবেন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আজিজুল হকই দায়ী! পাঁঠা কোথাকার! একটু স্বাভাবিক হও। পৃথিবীটা এত সরল নয়!" মাঝে মাঝে ছোটদের শাসনও মেনে নিতে হয়। চুপই করে গেলাম।

রাত প্রায় শেষ। ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে শরীরটা জুড়িয়ে দিচ্ছে। মনটা উত্তপ্ত। হলঘরটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চোখ বুলিয়ে নিলাম। আঃ ছেলেগুলো কি নিশ্চিন্তেই না ঘুমুচ্ছে। অদ্ভুত নিশ্চয়তা বোধ না থাকলে জেলে এরকম ঘুমানো যায় না। কোথা থেকে ওরা এত নিশ্চিত হ'ল?' পার্টির ওপর ভরসা? কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলতা? না, না, বিপ্লব হবে— এই স্বপ্নেই ওরা বিভোর। এ বিশ্বাসের কি কোন মূল্য নেই? এরকম বিশ্বাস কোনদিন কি বিফল হ'তে পারে? এরা কি জানে—বিপ্লব বস্তুটা অনেক উত্থান-পতনের সমষ্টি? পতনের মুখেও এ বিশ্বাস কি থাকবে? কেবলমাত্র 'বিশ্বাসের জন্যই বিশ্বাস'—কি টিকবে? ওদের এই চরম নিশ্চিন্ত বিশ্বাস দেখে নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেল। ক্যাডাররা কেবলমাত্র নেতার সৃষ্টি নয়, নেতার স্রষ্টাও বটে। আমার বিশ্বাস যাই হোক—এতগুলো ছেলের বিশ্বাস আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। এদের বাঁচাতে হবে। বোঝার সময় দিতে হবে। আচ্ছা! স্তালিন কি কেবলমাত্র লেনিনের ছাত্রই ছিলেন? লেনিন কি কোনদিন স্তালিনের কাছ থেকে কিছুই শেখেন নি? কিরভ কতখানি স্তালিনের সৃষ্টি, কতখানি স্তালিনের স্রষ্টা? এ সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে নিজের রক্ত ঝরিয়ে এটুকু বুঝেছি, পেছনে

দাঁড়িয়ে দশজন দৃঢ়চেতা সিংহহৃদয় লোক যদি বলেন—'তুমি লড়ে যাও, আমরাও আছি'—তা হ'লে অতি বড় ভীরুও বীরের আখ্যা পেতে পারেন। অমর-বীর গাথার নায়ক হতে পারেন। আবার দারুণ দৃঢ়চেতা লোক যদি দেখেন—সকলে তাঁর দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করছে—আকুতি জানাচ্ছে—'তোমার দৃঢ়তা মানে আমাদের ওপর নির্যাতন, আমাদের মৃত্যু। আমাদের বাঁচতে দাও' তখন তাঁর দৃঢ়তা কর্পূরের মত উবে যায়। কে কার স্রষ্টা? নেতা ক্যাডারের, না, ক্যাডাররা নেতাদের? না কি উভয়ে উভয়েরই! এক দামী নেতা ৭০ সালেই আমাদের তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "তোমার পতনের কারণ হবে তোমার এই 'মা, মা' মানসিকতা। কৃষকপ্রধান দেশ মানেই পাতি-বুর্জোয়া চিন্তার প্রাধান্য। প্রত্যেকেই তোমার এই সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করবে। পেছনে গিয়ে বলবে শালাকে কেমন টুপি পরালাম বল্ তো?" অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ সেই নেতার সাবধান বাণী মানতে পারিনি। বোঝাতেও পারিনি—কসাই হওয়ার চেয়ে 'মা' হওয়া অনেক ভাল। তাতে পতন হ'লে ভাবব—নিজের দোষেই মরেছি। কসাই হয়ে উত্থান হ'লেও সেটা হবে অন্যের রক্তের বিনিময়ে।

কাজলের বিছানাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। কাজল আর খোকন ধাক্কা মেরে তুলল। "এই ওঠো! ওদিকে সর্বনাশ হয়েছে!" হতভম্ব হয়ে বললাম—"কী হয়েছে?" "অমর দাদু আর রামদার ডিউটি। যদি হস্টেজ করতে হয়? যদি একান্তই কিছু করতে হয়…?" হেসে ফেললাম। দুজনই বেচারা-সিপাই। ভীষণ পেটুক। খাবার লোভেই 'লায়েন্স'কে পয়সা দিয়ে আমাদের এখানে ডিউটিতে আসে। অমর দাদুকে তো কাজলের ভাষায়—একটা 'বাটার টোস্ট' দেখিয়ে গেট খুলিয়ে নেওয়া যায়। মাসের মাইনে পেলে মিষ্টির দোকানে বসে অর্ধেক টাকার মিষ্টি খেয়ে নিত বলে ওর বউ জেলরবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন—তিনি এসে মাইনে নিয়ে যাবেন। আর রামদা তো নিপাট ভাল মানুষ।

দুজনের মুখ মনে পড়তেই হেসে ফেললাম। ওরা বিরক্ত হল। "তুমি হাসছ?" গম্ভীর হয়ে আবার একটা ছাত্র নেতাদের মত 'লুজ কমেণ্ট' করে বসলাম। "যাও, বলছি তো কিছু হবে না। পাগলির বাঁশি শুনলেই ওদের তুলে নাও।" 'কমেণ্ট' বা 'কমাণ্ড' যাই হোক-না-কেন করেই ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলাম, অবশ্যই বরাবরই দেখেছি আমার 'লুজ কমেণ্ট'গুলোই সত্যি হয়েছে। সিরিয়াস চিন্তাগুলো বিফলে গেছে। চটুল লেখাগুলোই সমাদৃত হয়েছে। গুরু-গম্ভীর লেখাগুলো হয় পুলিসে জমা হয়েছে না হয় দিনের আলোই দেখেনি। অবশ্য এটা শুধু আমারই সমস্যা নয়—রজনীপাম দত্তের সঙ্গে দাদু বার্নার্ড শ-র একটা কথোপকথন পড়ে-

ছিলাম। তাতে দেখেছিলাম সমস্তটা তাঁদেরও। 'লেবর মান্থলী' কাগজের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে—

'শ (পাম দত্তকে) : তোমার কাগজের বিক্রি কত ?

পাম দত্ত : তিন হাজার।

'শ : আমার একটা নাটকের একটা সংস্করণের বিক্রি জান ? তিরিশ লাখ! আর দেখ রানীর বেডরুম থেকে শ্রমিকের টেবিলে সর্বত্রই তার সমান যাতায়াত!

পাম দত্ত অবাক! ওঁকে অবাক হ'তে দেখে শ-র উত্তর : 'তোমাদের কথা-বার্তা লোকের কাছে ল্যাটিন ভাষার মতই! আমি একটু ভুসি মিশিয়ে সেই কথাই বলি, লোকে কেমন গেলে দেখ!' সুতরাং চটুলতা দিয়েই জীবনটা শেষ করে দিলে কেমন হয়? তাকিয়ে দেখলাম—নিশীথদা যথারীতি তাসের আসর জমিয়ে বসেছে। নির্বিকার।

সব গ্রুপ নেতাদের ডেকে বলে দিলাম দশটার সময় যে যার গ্রুপ নিয়ে নম্বরে চলে আসবে। অবাক হ'লেও কেউ প্রশ্ন করল না। শুধু বললাম—ঝামেলা হতে পারে। ঝামেলার কথা শুনেই সকলে খুশি! আমার হাসিও পাচ্ছে কান্নাও পাচ্ছে। পরিচালিত হওয়া কত সুখের। নিশ্চিন্তে প্রাণটা অন্যের হাতে সঁপে দেওয়া যায়। এবার বুঝুক সে ব্যাটা। 'প্রাণের মালিকানা পেয়ে সেই প্রাণগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহার যারা করে—তারা ভাড়াটে বাহিনীর সেনাপতির পদবাচ্য হতে পারে, কদাপি জনগণের বাহিনীর সেনাপতি নহে,—তারা কসাই।' চারু মজুমদার-সরোজ দত্তের সান্নিধ্যে এটুকুই শিখেছি। এটাই আমার গর্ব। 'আবার যদি প্রাণগুলোকে তুলোর প্যাকে আতুপুতু করে তুলে রাখা হয়—সেই প্রাণগুলো প্রাণহীন হয়ে যাবে। সেটাও হত্যা করার শামিল।' অফ মুডে, অফ-দ্য-রেকর্ড চারুদার এই কথাগুলোর সঙ্গে 'শ্রদ্ধেয় নেতা' হয়ে যাওয়া চারু মজুমদারের শিষ্যদের কাছ থেকে চারু মজুমদারের ব্যাখ্যা শুনে মিল খুঁজে পাই না। ফলে হয় তাঁরা আমাদের বুঝতে পারেন না, না হয় আমরা তাঁদের বুঝতে পারি না। আমাদের যুগের সঙ্গে 'চারু-পন্থী'দের যুগের ফারাকটা এখানেই। যাক কদিন আগেই 'দেশব্রতী' এসেছিল। জেলে হয়ত কোন কোন মাসের চারটে সংখ্যাই এক সঙ্গে চলে আসে। তাতে সি-এম '৭৫ সালে ভারতীয় জনগণ মুক্তির মহাকাব্য রচনা করবেন!' লেখাটা ছিল। তার সঙ্গেই ছিল অসীমদের আর সি (রিজিওনাল কমিটির)-র রিপোর্ট। অসীম ভাগ ভাগ করে সাব হেডিং দিয়ে সেই রিপোর্ট লিখেছিল। একটার সাব হেডিং ছিল—'চারু মজুমদারকে মানা মানেই জয়। না-মানা মানেই পরাজয়।'

আর একটা লাইন ছিল—'চারু মজুমদারকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে।' দুটো লেখা নিয়েই তুমুল তর্ক হয়ে গেছে—পার্টি কমিটিতে। আমার এবং নিশীথদার বক্তব্য: '৭৫টা আক্ষরিক অর্থে নয়—ইন্-বিটুইন দ্য লাইন বুঝতে হবে। যেটা অব্যক্ত সেটাই বুঝতে হবে। এটা একটা সাধারণ আহ্বান। পার্টি কমিটির বাকি তিনজনের বক্তব্য: 'কাকার থেকে কি আপনারা সি এম-কে বেশি ভাল বোঝেন? কাকা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। তাই করতে হবে।' চটে গিয়ে ওদের বললাম—"হিঁদুর ছেলে মোছলমান হ'লে গরু খাবার যম হয়। আপনাদের কাকার তাই হয়েছে। ছিল পার্টি বিরোধী—ডিজরাপশনিস্ট! এখন এক্কেবারে একশ আশি ডিগ্রি ডিগবাজি। স্তালিনের আমলে খ্রুশ্চভও তাই করেছিল। বলেছিল—'আমার যদি একটাই পিতা এবং একটাই শিক্ষক থাকে, তিনি হ'লেন স্তালিন।' আপনারা, আপনাদের কাকা সহ, কাকা-ভাতিজা সকলে মিলেই সি এম-কে খিস্তি শুরু করলেন ব'লে। ইতিহাস তাই বলে। বছর তিনেক বাদে দেখা হ'লে, যদি ভুল হয়—যা শাস্তি দেবেন মেনে নেব!" রাগের মাথায় এক ঐতিহাসিক সত্য কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

ভোম্বলরা তৈরি। বলল, "যাই?" নিশীথদার চোখটা জলে ভরে গেছে। কোনটা বেশি যন্ত্রণাদায়ক? নিজে মরা বা মার খাওয়াটা, না অন্যকে মরতে পাঠানো, বা মার খেতে পাঠানো? হেসে বললাম, "যা। সাবধানে। নির্মলের ডিউটি কোথায়?"

শ্যামল বলল—"হাসপাতাল গেটে!"

"তবে আর কি! প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতাল গেট!"

"ঐতিহাসিক ব্যাপার! নরেন গোঁসাইকে মেরে সত্যেন-কানাই ইতিহাস হয়েছেন ওখানেই! যাই হোক তোমাদের ওকে মেরে ফেলতে হবে না। ও তো আর নরেন গোঁসাই নয়। দু-চার ঘা মেরে তোমরা হাসপাতালের কোন ওয়ার্ডে ঢুকে যেও।" বিপ্লব একটু ম্লান। বুঝলাম, ও ব্যাপারটা এখন আর মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। ব্যাপারটা ওর কাছে এখন প্রেস্টিজ ইস্যু।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। নিচের দিকে পা বাড়ালাম। আয়রন কাঠের খাড়া নব্বুই ডিগ্রি সিঁড়ি। পাশাপাশি দুজনের বেশি ওঠা নামা করা যায় না। এটা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক একটা দিক। দু'টো বিশাল আঁশবটি আছে। আছে প্রায় তিন হাত লম্বা লোহার খুন্তি আর উনুন খোঁচানোর রড। কয়লা ভাঙা

হাতুড়ি। কিছু কয়লার চাঙড় তুলে নিতে হবে যদি খুবই খারাপ অবস্থা হয় বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করা তো যাবে।

প্রথম সিঁড়িতে পা দিতেই মন চলে গেল ৪৯ সালে। ২৫ এপ্রিল ৪৯ সাল। পার্টি বলল—'ফাইনাল বিড্ ফর পাওয়ার!' 'মাও-সে-তুং আসলে কৃষক! গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা ওসব চলবে না। ওসব সংশোধনবাদী আপসকামী চিন্তা।' গ্রাম এবং শহরে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান করতে হবে। তৈরি কর—'শক্-ব্রিগেড'। পাঁচ থেকে দশ জনের 'শক্-ব্রিগেড' শহরে দখল করে নাও কারখানা।' টালিগঞ্জে অ্যালানবেরি কারখানার গুদাম দখল করে নিলেন শ্রমিকরা। উড়ল লাল পতাকা। বেঙ্গল পটারিতে খতম হল সিকিউরিটি অফিসার।' কারখানা দখল করে রাখলেন শ্রমিকরা। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেসী মন্ত্রীর সভাতে হামলা করা হল। মন্ত্রীদের বাড়ি বাড়ি মার 'মার বোমা, মার বোমা!' কাঁপছে কলকাতা! জেলে কি বন্দীরা শুধু বসে থাকবেন? 'ওখানেও ব্যতিব্যস্ত রাখ ওদের!'—নির্দেশ দিল পার্টি। কমরেডরা বললেন—"লক আপে ঢুকব না।" যথারীতি ফোর্স এল। দেড় হাজার রাইফেল বনাম ১২০ জন নিরস্ত্র লোক। এই ষোল নম্বরের গেটে তৈরি করা হল অবরোধ। রাত একটা পর্যন্ত পুলিস-মিলিটারি সে অবরোধ ভাঙতে পারল না। বিল্ডিংয়ের শেষ প্রান্ত দিয়ে মিলিটারি ছাদে উঠল। পিয়ার্সিং টিয়ার-গ্যাস সেল বাহিনী গোটা ছাদ দখল করে নিল। একদল উঠল 'কিচেনে'র ছাদে অর্থাৎ ১৬ নম্বরের দরজার সামনাসামনি। ছাদের ভেন্টিলেটারগুলো দিয়ে বৃষ্টির মত টিয়ার গ্যাস সেল আর সামনের ছাদ দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চলতে লাগল। ব্যারিকেড রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন যিনি, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। শহিদ হলেন। অন্ধকার হলে অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণায় ছটফট করছেন কমরেডরা। এক কোণে সকলকে তাড়িয়ে জড়ো করা হল। রাত তিনটের সময় অবরোধ ভাঙলে প্রায় প্রত্যেকেই গুরুতর আহত। একজন মৃত। 'নলিনী-বিধানের সরকারি রিপোর্ট বেরল।' ডি সি রঞ্জিত গুপ্তের নেতৃত্বে হায়দার দারোগার বাহিনী উন্মত্ত হয়ে ছুটল মহিলা ওয়ার্ডের দিকে। ভেঙে ফেলল দরজা। চুলের মুঠি ধরে মেয়েদের মেঝেতে পেড়ে ফেলল জানোয়ারগুলো। চরম লাঞ্ছিতা হলেন মা বোনেরা। বাংলার চারণ-কবি পথে-ঘাটে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন, "বাংলার কুল-নারী হও গো সাবধান / ঐ দেখো মসনদে নলিনী-বিধান।"

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আশ্চর্য! মাও সে তুং মুর্দাবাদ বলে যে লাইন চালু হয়েছিল, মাও সে তুং জিন্দাবাদ বলে সে লাইন এল কোথা থেকে?" সিঁড়ির সুবিধাটা তাহলে মন্দের-ভাল।

নিচে নেমে দেখি কাজল এবং কলেজ স্ট্রিটের কয়েকজন অমর দাদুকে ঘিরে গল্প করছে। সামনে বাটিতে মাখন-রুটি-কলা-মামলেট। প্রচণ্ড হাসি পেল। বেচারা অমর দাদু! মেজাজে খাচ্ছে আর হেঁ হেঁ করে বিগলিত। একটু দূরে খোকন তার দলবল নিয়ে রামদার সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। বুঝলাম এখন শুধু শ্যামের বাঁশি বাজার অপেক্ষা। দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম। 'পিঁ পিঁ পিঁ', 'ঢং ঢং ঢং', 'আঁ আঁ আঁ'। বাঁশি, ঘণ্টা আর সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেলভিডিয়ার অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অভিজাতদের ব্রেকফাস্টের শান্তি ভঙ্গ করল। নম্বরে উঠে জেল গেটের দিকে তাকালাম। দেখলাম 'লাল পতাকা' উড়ছে। অর্থাৎ 'রেড-অ্যালার্ম'। সাঙ্ঘাতিক পাগলি। সুব্রতকে বললাম, "স্লোগান ওঠা।"

বলিষ্ঠ তরুণ কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, "নকশালবাড়ি লাল সেলাম।" শতাধিক কণ্ঠ সে আওয়াজের উত্তর দিল। "রক্ত দিয়ে, রক্ত নিয়ে সমস্ত নির্যাতন অপমান রুখছি রুখব···।" কাজল আর খোকন দুই সিপাইবাবুকে প্রায় পাঁজাকোলা করে উপরে উঠিয়ে এনেছে। গেটটা ঠেলে বন্ধ করে পায়খানার বিশাল ড্রামদুটো দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হল। দুই সিপাইবাবুকে গেটের দুপাশে দাঁড় করিয়ে চক-চকে দুটি বঁটি তাদের ঘাড়ের কাছে ধরে আছে কাজল আর খোকন। কাজল খুব ক্যাজুয়াল। খোকনের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। কাজল তখনও অমর দাদুকে বলে চলেছে—"আপনাগো কোন ভয় নাই···" কে তার অভয়বাণী শোনে? নকশালদের হাতে বঁটি—সিপাহীর ঘাড় তার লক্ষ্য। সেখানে কি আর কোনো সান্ত্বনা কাজ করে? হাতের মুঠোয় বন্ধ শালিকের বাচ্চার মতো ওরা কাঁপছে। এই বোধহয় টিপে মারল··· নিচের একতলা দিয়ে ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি আছে। ওটা আগেই কাঠের পাটাতন দিয়ে কর্তৃপক্ষই সিল্ড করে গেছে। তবুও যদি এ পাটাতন ভেঙে ওরা ঢোকার চেষ্টা করে তাই ওখানে হাওড়ার অসিত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কলেজ স্ট্রিটের ছেলেরা খুন্তি রড ইত্যাদি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ফোর্স ঢুকছে···। উল্টো দিকের জানালা দিয়ে ফোর্স ঢোকা দেখছি। সুব্রতকে ইঙ্গিত করলাম—"আত্মদান, অভ্যুত্থান, জেল বিদ্রোহ চলছে চলবে।" একটা ঘরে বন্ধ শতাধিক তরুণ কণ্ঠ তাতে সম্মতি জানিয়ে গর্জে উঠল। বন্ধ তারুণ্যের এই নিনাদ যে কোন বাহিনীরই হৃৎকম্প ঘটাতে পারে। সপক্ষে অতিবড় ভীরুকেও সাহসী করে তুলতে পারে। জলন্ত কামানের মধ্যে ঢুকে যাওয়া তখন তার পক্ষে কোন সমস্যাই নয়। জেল গেট দিয়ে ঢুকেই ফোর্স থমকে গেল সেই আওয়াজে। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডে 'H' লেখাটা পাল্টে '১৬-১৮' লেখা হল। অর্থাৎ 'প্লেস অব

অকারেন্স' 'হাসপাতালে'র জায়গায় ১৬-১৮ নং ওয়ার্ড। বুঝলাম ওরা তিনজনে বেঁচে গেল। সুব্রত চিৎকার করে চলেছে "ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে বিপ্লবীদের মোকাবিলা করা যায় নি যাবে না·· যায় নি যাবে না"। "নকশাল বন্দী-সিপাই ঐক্য··· জিন্দাবাদ।" পেছন ফিরে দেখলাম দুই সিপাইবাবুর মাঝখানে ঠিক দরজাটার মুখোমুখি নিশীথদা দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ ওরা যদি দরজা দিয়ে গুলি করে, করবে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। এটাই সিদ্ধান্ত। যদি একান্তই ওরা হত্যাকাণ্ড চালায় আমাকে এবং নিশীথদাকে মরে পড়ে থাকতে দেখলে স্তব্ধ হয়ে যাবে। এক ঝলকে মনু বৌদি আর বাচ্চাটার মুখ মাথায় উঁকি মারল। আমি তো ল্যাংটা, আমার হারাবার কিছুই নেই—আমি কি করে ওঁকে ঠেলে দিতে পারি? নিশীথদাকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি অসিতদার সঙ্গে আপনার কলেজ স্ট্রিট সামলান। শান্তি-অশোক-নিমু মিত্রকে সামলানো অসিতদার কম্মো নয়, ওরা যেন ঢিল ফিল না-ছুঁড়ে বসে!" চালাকিটা নিশীথদা ধরতে পারলেন—"আমার থেকে ওরা তোমাকে বেশি মানে। তুমিই যাও না বাপু! এটা পার্টির সিদ্ধান্ত! এবং পার্টির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো আমাদের উচিত।" এবার নেতাগিরি ফলালাম—"যুদ্ধক্ষেত্রে ফিল্ড কমাণ্ডারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত! যান বলছি!" ওকে সরিয়ে সেই জায়গায় নিজে দাঁড়ালাম।

৪

নকশাল মারতে হবে শুনলে পোষা গুণ্ডাবাহিনীগুলোর চোখে-মুখে যে 'কিলার ইনষ্টিংক্ট' ফুটে উঠত, সাতের দশকের সে-সব-মুখ যারা না দেখেছে তাদের বোঝানো যাবে না। খোলা তলোয়ার, লাঠি, রড, বেয়োনেট লাগানো মাস্কেট নিয়ে হুড়মুড় করে খুনিবাহিনী ঢুকছে। উল্লাসে তারা চিৎকার করছে—"জয় বজরংবলী কি জয়।" এদিকে চিৎকার—"রক্ত দিয়ে, রক্ত নিয়ে, নয়া ভারত গড়ছি গড়ব।" সূর্যের আলোয় কিরিচ আর বেয়োনেটগুলো ঝিলিক মারছে। মাস্কেট থেকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার হল। নিচের চাতালে খিস্তির সঙ্গে লাঠিপেটার আওয়াজ। কানের কাছে ঘণ্টি আর সাইরেনের যুগপৎ কান-ফাটানো আর্তনাদ! ওপর দিয়েই দেখতে পেলাম, ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাঠে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেছে। দুজন মাস্কেটধারী রক্ত পানের উল্লাসে হুড়মুড় করে ওপরে উঠে এল। উঠেই হঠাৎ বঁটি এবং দুই সিপাই দেখেই যে স্পিডে উঠেছিল তার ডবল স্পিডে ছুটে নেমে গেল। কাজল, খোকন আর আমি ওদের এই বীরের মত পালাতে দেখে হেসে ফেললাম। ওরা সকলেই সিঁড়ির গোড়াতে জমা হয়েছে। কেকের ভেতরে ছুরি চালানোর

মত ওরা খুন করে সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে ভেবেছিল—এখন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ওদের উল্লাস এখন বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয়েছে। পাশবিক চিৎকারটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় অমর দাদুর করুণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে: "তোমরা চইল্যা যাও গিয়া। আমরা ভাল আছি। আমাগো ডিম-সন্দেশ-কলা খাওয়াইয়াছে ইনারা। তোমরা ওঠোনের চিষ্টা করলে আমাগো কাইট্যা রান্না কইর‍্যা ফেলব—তোমরা চইল্যা যাও···।" বেচারা অমর দাদু! সত্যিই খেতে ভালবাসে! না হলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও 'রান্না' 'খাওয়া' এসব শব্দগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওর মুখ দিয়ে বেরত না! কাজল কমিউন ইনচার্জ। ও সুব্রতকে বলল—"দুটো বাটিতে করে 'ইনটারভিউ'তে আসা বিস্কুট, কলা, সন্দেশ আর চকোলেট নিয়ে আয় তো!" সেই দুটো বাটি দুজনের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। রামদা তো ধরতেই পারছে না। অমর দাদু দারুণ খুশি, নিচের ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করছে—"এই দ্যাহো! সন্দেশ কলা খাইতেছি। তোমরা চইল্যা যাও!" ঘাড়ের কাছে যে অত বড় বঁটি ধরা আছে ওদিকে ওর খেয়ালই নেই।

নিচের ওরা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—"জয় বজরংবলী কি জয়! সাঁই বাবা কা জয়! বালক ব্রহ্মচারী কা জয়!" খোকন তোতলা ব'লে কথা এবং হাসা দুটোই ওর কম। খোকনও হেসে ফেলল। "শ-শ-শালারা ভয় পেয়েছে। ঠা··· ঠা···কুর ডাকছে।" আসলে ভয় নয়। জেলর-সুপারকে দেখে একটু উৎসাহিত হয়েছে ওরা।

ফোর্সকে পেছনে রেখে জেলর-সুপার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল···কথাবার্তা জেলরই বলল।

প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর—"এ কী করছেন! ফোর্সকে আটকে রাখা কত বড় বেআইনী কাজ জানেন?"

বললাম—"জানি।"

জেলর—"ছেড়ে দিন।"

আমি—"আমাদের তিনজনকে ফেরত দিন। পাগলি বন্ধ করে ক্লিয়ারেন্স দিন। ফোর্স হটান। তবেই ছাড়ব।"

সুপার—"মিঃ হক, আপনি বুঝতে পারছেন না! ই. এফ. আর, সি. আর. পি. গোটা জেল ঘিরে ফেলেছে। অফিসে ডি এম স্বয়ং বসে আছেন। ওরা টেকওভার করে নেবে।"

আমি—"পাগলি বন্ধ করুন, ফোর্স হঠান।"

জেলর—"আমি হাসপাতালে ওদের দেখে এসেছি। এই দেখুন নিজের হাতে

ওদের চাবি দিয়ে, চাবি নিয়ে এসেছি। আপনি তো আমাকে চেনেন আজিজুলদা ! বিশ্বাস করুন আমি খুন করতে চাই না। প্লিজ, সেন্সিবল হোন।"

আমি—"আমি কমলকে চিনি। জেলর কমল ব্যানার্জিকে চিনি না। বেশ বিশ্বাস করলাম। তাহলে পাগলিটা বন্ধ কর।" রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। দুই বাহিনী, দুই সেনাপতি মুখোমুখি। যে-কোন এক তরফের সামান্যতম প্ররোচনা মানেই প্রাণের দৈত্যাকার অপচয়। ভেতরটা কাঁপছে—বাইরে ঠাণ্ডা। গম্ভীর। সুপার একটু মেজাজ নেবার চেষ্টা করল, "ঠিক আছে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। পাঁচ মিনিট পরে আমরা জেল, পুলিসের হাতে তুলে দেব।" সুব্রতর দিকে তাকালাম। ও স্লোগান তুলল···"রক্ত দিয়ে, রক্ত নিয়ে, নয়া ভারত গড়ছি, গড়ব।" সুপার দু-কানে হাত চাপা দিল। বললাম—"কী হল ? হাতটা সরিয়ে শুনুন ওরা কী বলছে ?" এমন সময় কে একজন এসে পেছন দিক থেকে সুপারের কানে কানে কী বলল। সুপারের মুখটা ফ্যাকাসে আর জেলরের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দুজনেই হন্তদন্ত হয়ে নেমে অফিসের দিকে ছুটল। অমর দাদু আর রামদা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নিচের ফোর্স হতোদ্যম হয়ে জেলর-সুপারের মা-মাসীদের গর্ভসঞ্চার করতে লাগল। আমাদের ছেলেদের উৎসাহ বেড়ে গেল। প্রায় মিনিট দু-তিন পরে হঠাৎ ঘণ্টির ঢং ঢং আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এক মিনিটের মাথাতেই সাইরেনের "আঁ···আঁ···" বন্ধ হয়ে "ভোঁও···ও" আওয়াজ জানিয়ে দিল 'অল ক্লিয়ার !' ফোর্স ফিরে যাচ্ছে। আমি হতবাক। 'কী মতলব ?' উল্টোদিকের জানালা দিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—'সাদা পতাকা উড়ছে।' কাজল, খোকন, নিশীথদা, সুব্রত প্রত্যেকেই হতবাক ! সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। বললাম—"সতর্কতা নষ্ট কোর না, ওদের ঢপ হতে পারে।"

কিছুক্ষণ পরে একা জেলর, ভোম্বল, শ্যামল, বিপ্লবকে নিয়ে এসে বলল, "এই যে নিন আপনার কমরেডদের ! এবার বিশ্বাস হল ! দিন এবার আমার কমরেডদের ছেড়ে দিন।"

নিশীথদা, কাজলদের বঁটি নামিয়ে নিতে বললেন। বেচারারা বঁটি নামিয়েই হাত দুটো ঝাঁকিয়ে নিল। এতক্ষণ বঁটিটা তুলে রাখা ! ব্যারিকেড তুলে গেট খুলে দিতেই জেলর ঢুকল—পেছনে ওরা তিনজন। ওদের তো রাজকীয় সংবর্ধনা জানালেন কমরেডরা। অমর দাদু আর রামদা ? দে-ছুট, দে-ছুট। জেলর সুদ্ধ হেসে ফেলল। জেলর মেঝেতেই বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—"এক গ্লাস জল খাওয়ান তো !" জল খেয়েই প্রথম কথা—"আপনি খুব চালাক !" আমিও কম হতভম্ব হইনি। তবে সেটা বুঝতে দিচ্ছি না—"তা একটু হতেই হবে !"

ওর কথা থেকে যা বুঝলাম তা হল—প্রায় শ' দুই-তিন মহিলা জেল গেটে হাজির হয়েছেন। তাঁরা আমাদের দেখতে চান। তাঁরা শুনেছেন আমাদের নাকি খুন করে ফেলা হয়েছে। এম পি ভূপেশ গুপ্ত গেটে এসে হাজির। বুঝলাম কাক-তালীয় এই ব্যাপারটার কৃতিত্ব আমার ঘাড়ে চাপছে। "আপনারা তো কেউ এখন নিশ্চয় গেটে যেতে চাইবেন না? আমি হলেও চাইতাম না। কী করেই বা বিশ্বাস করবেন আমাদের? একটু লিখে দিন—" জেলরের মিনতি।

একটা কাগজে লিখে দিলাম "আমরা নিরাপদেই আছি। আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন!"

জেলর চলে গেল। এটুকু লিখতে লিখতেই দু-চোখ জলে ভরে গেছে। মানুষের এই ভালবাসা—এর মূল্য কি কম? সেদিন ভেবেছিলাম তা হলে ৪৯ সালে ওরা এরকম মার খেলেন কেন? এত মানুষ যখন চান তাহলে কেন ৭৫ না হোক ৭০-এর দশক মুক্তির দশক হবে না? কে কাকে বাঁচায়? বাইরের সংগ্রাম ভেতরে কী প্রভাব ফেলে সেদিন সেটা আঁচ করেছিলাম। ৪৯-এর ব্যর্থতাটা আবার জল জল করে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বিনা মেঘে বজ্র

'প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্স অ্যাক্ট' চালু হয়েছে। স্টেটসম্যান লিখল—এতে সরকার অযথা নিজের বদনাম কিনছে। যে কোন নিবর্তন আটকের মেয়াদ সীমিত। অথচ দেশের প্রচলিত আইন দিয়েই যে কোন লোককে যাবজ্জীবন জেলে আটকে রাখাও যায় আবার বিনা বিচারে আটকে রাখার বদনামও হয় না। অর্থাৎ বর্তমানে জ্যোতিবাবুরা যে লাইন চালাচ্ছেন, সেদিনই স্টেটসম্যানে অসীম রায় সেই লাইন হাজির করেছিলেন। বিচারাধীন করে যাবজ্জীবন আটকে রাখার লাইন। কিন্তু পশ্চিমবাংলা সরকারের শিরে সংক্রান্তি। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা জটিল হচ্ছে। ওখানে প্যারাট্রুপার এবং এজেন্ট পাঠিয়ে গণ্ডগোল পাকাবার কেন্দ্র বানাতে হবে কলকাতাকে। সেই কলকাতা যদি জ্বলতে থাকে তাহ'লে তো মুশকিল। পেছনে শত্রু রেখে কে আর এগুতে চায়? সুতরাং সরকারের হাতে যা আছে সব প্রয়োগ করতে শুরু করল। হত্যা, ধ্বংস, ষড়যন্ত্র, নিবর্তন সব অস্ত্রই ওরা ওদের ভাঁড়ার থেকে বের করল। সমস্ত পার্টিই এ কাজে সমান উৎসাহী। নকশাল খুন করতে হবে শুনলে সব পার্টির পতাকাই এক হয়ে যায়। লাল, তে-রঙা-সবুজ-হলুদ সব পতাকা মিলেমিশেই তৈরি হল 'খুন-খারাবি পতাকা।' কাশীপুর বরানগরে এটা স্পষ্ট হল।

দলে দলে লোক জেল ভরে দিচ্ছে। সব পেশার, সব বয়সের লোকে জেল গমগম করছে। ন'শ লোকের জেলে সাতাশ শ' থেকে তিন হাজার লক আপ। তিনজনের বরাদ্দ একটা কম্বল, একটা বাটি, একটা থালা।

আমাদের নম্বরে আর লোক বাড়াবেন না এটা ওদের পলিসিই ছিল। নিউ-ওয়ার্ডের চারটে হলঘরই ভরে গেল। বাইরের পার্টির সঙ্গে আমরা যারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম, আমাদের কাজ গেল বেড়ে। জেলরের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করা হল। আমাদের কয়েকজন মাঝে মাঝে নিউ-ওয়ার্ডে গিয়ে থাকতে পারবে। দুই সুব্রত নিউ-ওয়ার্ডের চার্জে। ওরা একদিন বলল ওদের ওখানে জামিন এবং ডিভিশন নেওয়া, না নেওয়াকে কেন্দ্র করে পার্টি টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অবাক কাণ্ড বটে! এরকম টেকনিকাল কারণে পার্টি ভেঙে যাবে? ভাবতেই পারছিলাম না। এরা কোথায় আছে সব? ওকে বললাম "শোন্, গল্পটা আমার শোনা, সরোজদার চুটকি। এক নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম···" দা, সরোজদার মত লোক থাকতে জুনের সার্কুলার নেওয়া হ'ল কী করে?" তার উত্তরে তিনি সরোজদার গল্পটা বলেন। তাঁর কথা অনুযায়ী এটা তাঁরও অবাক লেগেছিল। তাই তিনি সরাসরি সরোজদাকেই প্রশ্নটা করেন। তাতে সরোজদা গল্পটা শোনান।··· "বুঝলে একদিন এক বন্ধু-ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছি, সাধারণ সর্দি, কাশি নিয়ে এক রুগী এসে হাজির। ডাক্তার সব দেখে শুনে, প্রেসক্রিপশন লিখে দিল। যাবার সময় রুগী জিজ্ঞাসা করল—'ডাক্তারবাবু ডাব খাওয়া যাবে তো?' ডাক্তার তো হাঁ, হাঁ করে উঠল। 'খবরদার ওসব খাবেন না।' আমিও অবাক। রুগী চলে যাবার পর আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'সে কি হে! তুমি ওকে ডাব খেতে বারণ করলে কেন?' ডাক্তার স্মার্টলি বলল 'ওসব আপনি বুঝবেন না, সরোজদা, এই ব্যাটা রুগীদের ডাব খেতে বললে ঝুনো খেতে শুরু করবে'।" গল্পটা বলে সরোজদা ব্যাখ্যা করেন। মধ্যবিত্ত ক্যাডাররা আমরা বললেও জামিন নেবে, ডিভিশন নেবে, না বললেও নেবে। কিন্তু আমরা যদি একবার এটা আইন করে দিই, পুরো দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। পার্টিটা তখন উকিল-মোক্তার আর ব্যারিস্টারে ভরে যাবে। গল্পটা শুনিয়ে সুব্রতকে বললাম—"সুতরাং এটা কোন ইস্যু নয়। যাঁরা জামিন নিচ্ছেন তাঁদেরও কমরেড এবং সমর্থক হিসাবেই ট্রিট করো।" ওর নিজেরই দ্বিধা আছে। ও নিজেই কট্টর-জামিন-বিরোধী ছিল। মুখে বলল—"যাই হোক! কাল দুপুরে, তুমি আর ভোম্বলদা একবার এসো।"

রাতের বেলা ভোম্বল এসে বলল—"খোকনদের মতি গতি ভাল ঠেকছে না। ওরা কিছু একটা করবে।" ওকে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিলাম। গভীর রাতে খোকনকে বললাম—"খোকন, ছ'টা মাস সময় দে। সকলকে বার করে নিয়ে যাব। এরমধ্যে যদি দু ডজন সংগঠক তৈরি করে নিতে পারি, তারা হবে অ্যাসেট। এমন সংগঠক চাই—যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে আর প্রয়োগ করতে পারবে। বাস্তব অবস্থা বুঝবে।

"মতাদর্শগতভাবে দৃঢ় হবে। এক কথায় আমাদের ফিলজফিটা বোঝার চেষ্টা করবে।" ও চুপ করে থাকল। ওর হাত ধরে অনুরোধ করলাম—"দেখ খোকন! নিজে কত বড় বিপ্লবী সেটা প্রমাণ দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় কাজ ১০০ জন বলশেভিক তৈরি করা। জেল আমাদের সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। ছ'টা মাস পরে আমরা ১০ জন করে—১০০ জনকে বাইরে পাঠাতে পারব। আজ দেখ এত ছেলের মধ্যে হাতে গুনে মাত্র চারজনের বেশি সংগঠক পাচ্ছিস না।" ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বকে চললাম—"আয় না, এই ছ'মাস অন্যান্য কাজের সঙ্গে, আমরা দাঁতে দাঁত দিয়ে চেষ্টা করি যাতে এই তিনশ ছেলের মধ্যে ১০০টা বলশেভিক তৈরি করতে পারি!" ওকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বুঝলাম—ও সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। কিছু করার নেই। সাবধান বা সতর্ক হবারও সময় নেই। 'যা হয় হবে' ভেবে হাল ছেড়ে দিলাম।

২

৪ ফেব্রুয়ারি ৭১। বিকেলে নিউ-ওয়ার্ডে সুব্রতদের সমস্যা নিয়ে কথা বললাম। ওরা যে-যার গোঁ ধরে আছে। জামিন-পন্থীদের গায়ে ঝপাঝপ স্ট্যাম্প পড়ছে। সুব্রতকে ধমক দিলাম—"তুমি আধসের চালের ভাত খাও তাই বলে আমি যদি নাও পারি, আমাকেও আধসের চাল খেতে হবে। এ কেমন কথা? তুমি আমাকে কখনই বলতে পার না—হয় আধসের খাও, না হ'লে শুকিয়ে থাক। তুমি বড় জোর বলতে পার—'আধসের না-খেলে তুমি দুর্বল হ'য়ে যাবে ইত্যাদি'! ওঁরা জেলে থাকতে পারছেন না—বেরিয়ে যেতে চান। বেরিয়ে গিয়ে কিছু না করুক তোমাদের খেতে দিতেও পারেন। আবার বাইরের জোয়ারে লড়াইও করতে পারেন। এটা ওঁরা মনে করছেন। আমি এটা মানি না। তবুও ওঁরা যখন চাইছেন—যান। আমরা শুধু শুধু ওঁদের স্ট্যাম্পড় করতে যাচ্ছি কেন? পার্টিটা কি এত খেলো জায়গা নাকি?" ওর সঙ্গে কথা শেষ হ'তে না-হতেই বিকট দু'টো

বোমের আওয়াজ। আধ মিনিট পরেই 'পিঁ-পিঁ-পিঁ', 'আঁ-আঁ-আঁ'…, 'ঢং-ঢং-ঢং' —অর্থাৎ পাগলি। পাগলি ঘন্টি শুনেই চকিতে ভোম্বলের দিকে চেয়ে সাত খাতার (১৬ নং ওয়ার্ডের) দিকে ছুট লাগালাম। বুঝতে দেরি হ'ল না কী হ'য়েছে। মাঝ পথেই এক সিপাই আটকে দিলেন…"নিউ-ওয়ার্ডে ফিরে যান। সাতখাতা থেকে পালিয়েছে!" গেট বন্ধ করে দিল। আস্তে আস্তে ফেরত এলাম নিউ-ওয়ার্ডে সুব্রতদের নম্বরে।

সুব্রত আর ভোম্বল এক জোট হয়ে আক্রমণ করল—"এ তোমার উদারতাবাদের ফল! এখন এতগুলো ছেলে মরবে!" গুম হয়ে ভাবছি 'খোকন কথা শুনল না। কেন ও বিশ্বাস করতে পারলো না। কেন?'

সাতখাতা থেকে খবর আসছে। এক-এক চোরের পেছনে নাকি সাত-সাত ওয়ারলেস থাকে! সুতরাং হাওয়ার খবর হাওয়ার মতই। কেউ বলছে—বিশজন মরেছে। কেউ বলছে ৬০ জন। কিন্তু সবাই বলছে—সব লুটপাট হয়ে গেছে। পরার কাপড় পর্যন্ত সিপাইবাবুরা রেখে যায়নি। হতভম্ব কমরেডরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নম্বরে। পালিয়েছে ৬ জন। নিউ-ওয়ার্ড বন্ধ করে গুনতি মেলানো হল। ডেপুটিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"নিশীথদার খবর কী! বেঁচে আছে তো?" উনি বললেন—"কান পাতুন শুনতে পাবেন!" বাতাসে কান্না আর আর্তনাদের শব্দ। বাতাস ভারী। "ইস! দু'টো পাগলির কি আকাশ পাতাল ফারাক!" একটাতে ছিল প্রতিরোধের বাঁধ ভাঙা গর্জন—আর একটা করুণ আর্তনাদ। সুব্রতকে বললাম—"স্লোগান তোল্—এখানকার কমরেডরা যাতে ভয় না পায়!" "জেল পালানো জেল-বিদ্রোহ চলছে, চলবে!" সুব্রত চেঁচাল। আমি আর ভোম্বল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম। কিন্তু বাকি ৪০ জন? এক অজানা আতঙ্ক তাদের মুখ থেকে সমস্ত ভাষা আর রক্ত শুষে নিয়েছে। তাদের ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কথা বেরুচ্ছে না।

ওদের নিয়ে বসলাম। এদিকে এক একদল ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী পালা করে এসে চাতালে লাঠি পেটাচ্ছে। আমার আর ভোম্বলের নাম ধরে খিস্তি করছে। কমরেডদের, জ্বালাময়ী ভাষার, ভাঁড়ার উজাড় করে উৎসাহ দিলাম। "…যেই পালাক! পালিয়েছে তো! বিদ্রোহকে সমর্থন জানাতেই হবে। ভুল সঠিক বিচার পরে হবে…" জানতামই আমাকে আর ভোম্বলকে এখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর? আশঙ্কাটা কমরেডদের সামনে রাখলাম। "…পরে যদি বেঁচে থাকি আবার আমরা সংগ্রামের ময়দানেই মিলব। আবার দেখা হবে। এর মধ্যে তোমরা ভয়কে জয় কর। দৃঢ় হও। শত্রুর সমানে সামান্যতম দুর্বলতা দেখিও না।

আর ঐক্যবদ্ধ থেক। যে যতটুকু করতে পারে, সেটুকুই কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ কর। এই সময় কেউ যদি তোমাকে এক গ্লাস জল আগিয়ে দিয়েও সাহায্য করে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থেক…" একেবারে 'স্টেরয়েড অ্যাকশন!' হঠাৎ প্রত্যেকের মধ্যেই দেখি দারুণ চাঞ্চল্য। সকলেই মনে হল আপন আপন ফর্মে ফিরে এসেছে। তারা প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল "আমাদের একজন বেঁচে থাকতেও তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে দেব না।" এবার কথা হারালাম আমি নিজেই। কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোঁট দু'টো অসম্ভব কাঁপছে। চোখ জ্বালা করছে। বুঝলাম এখন কিছু বলতে গেলেই কান্নায় ভেঙে পড়ব। 'এ কী ভালবাসা!' মনে মনে বললাম—'ভগবান, তুমি নেই জানি! তাই তোমাকে বলছি না, আমার ভগবানকে বলছি—তোমরা আমাকে শক্তি দাও। এই ভালবাসার মর্যাদা রক্ষার শক্তি দাও! শক্তি দাও!' এই আবেগ সংযত করতে কয়েক মিনিট সময় নিলাম। ভোম্বল নির্বিকার। ওর কিছুতেই কিছু হয় না। এসব বোধই ওর নেই। অন্য কমরেডকে রক্ষা করাটা এক কমরেডের দায়িত্ব। সুতরাং ওর কাছে এগুলো ন্যাকামিরই নামান্তর মাত্র! আমি তো পাতি। তাই সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো—হাসি, কান্না, উদ্বেগ, ভালবাসাগুলো এখনও সযত্নে রক্ষা করে চলেছি! এখনও শত্রুর মুখোমুখি, উদ্ধত বেয়োনেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি… "খামোস! হৃদয়ের সপক্ষে আমি! যুক্তি বুদ্ধি জানি না। হৃদয়-হীন যুক্তি মেনে রাজা হওয়ার বাসনা আমার নেই। তার চেয়ে যুক্তিহীন হৃদয়কে প্রভু মেনে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারি আমি! নামাও তোমার বেয়োনেট!" নিজেকে সংযত করে ওদের বললাম—"তা হয় না। ওরা নিয়ে যাবেই। মাঝ-খান থেকে তোমরা অহেতুক রক্ত ঝরাবে। হাত-পা ভাঙবে। এই কটা থালা-বাটি দিয়ে কতক্ষণ একটা সশস্ত্র গুণ্ডা দলের সঙ্গে লড়বে?" ওঁরা শেষ চেষ্টা করলেন—"আমাদের একটা সুযোগ দাও! মরার সুযোগ। আমাদের নেতাকে বাঁচানোর জন্য মরার সুযোগ!" আবার ইমোশনাল সেটব্যাক! এবার ধাক্কাটা একটু বেশি। দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলাম—"না, না, তা হয় না!"

এসব বলতে বলতেই এক ডেপুটিবাবু এসে হাজির। পরিচিত। "অজয় দে," "আজিজুল হক" অফিস কল! চল্লিশজন আমাকে সরিয়ে দিয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—"না, যাবে না। আমাদের না মেরে ফেলে ওদের নিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা।" সেই গর্জনে ডেপুটিবাবু হতভম্ব! ফোর্স জোর করে তালা খোলার চেষ্টা করতেই চল্লিশজন গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভেতর থেকে দরজাটা ঠেলে রইল। হিউম্যান ব্যারিকেড। ডেপুটিবাবু দু-একবার কী একটা বলতে

গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। উনি তালা বন্ধ করে ফেরত চলে গেলেন। প্রতিটি নম্বর থেকে করুণ চিৎকার ভেসে আসছে। লাঠি-পেটার শব্দ। আর মাঝে মাঝে 'বজরংবলী' আর 'বালক ব্রহ্মচারির' জয়ধ্বনি। দু'টো নাম তাই আজও আমার কাছে খুন-হত্যা, লুটের সমার্থক।

কমরেডদের শেষবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ভোম্বল কিছু বলছে না। তবে যাওয়ার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তটা যে ও মানতে পারছে না বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা এই নয় যে, ও নিজে মরার বা মার খাবার ভয়ে ভীত। ওর ইচ্ছা (এবং রাজনীতি) এদের লড়তে শেখাতে হবে। "এই সব বড়লোকের পোলারা এক ঘাও ডাণ্ডা খায়নি। বুঝুক বিপ্লবের ঠ্যালা কত!" কমরেডদের বললাম—"এ সব চলে না। তোমাদের ইতিহাসের জ্ঞান নেই। তাই তোমরা এসব ভাবছ। আমাদের তো বাঁচাতে পারবেই না, উল্টে অহেতুক নিজেরা মরবে! আমাদের ছেড়ে দাও!"

কিন্তু চার্জড্ পেত্তি-বুর্জোয়া-যুবক বীভৎস রকমের গোঁয়ার! ফলে মনে মনে ফন্দি এঁটে ফেললাম। মিনিট পনের পরে ডেপুটিবাবু ডি সি এস বি এবং ডি সি ডি ডি সহ হাজির! এবার ওদের বলতে না দিয়ে আমিই বললাম—"দেখুন রাত-টুকু কেটে যাক্! এদের কথাও থাক! আপনাদের কথাও থাক! ভোরবেলা নিয়ে যাবেন। কোথায় নিয়ে যাবেন তা তো জানিই। ভোরে গেলেও কেউ জানতে পারবে না।" কমরেডরা হতভম্ব! ওরা ভদ্রলোকের মত ফিরে গেলেন। মাত্র এক আধ ঘণ্টার ব্যাপার! রাত শেষ হয়ে এসেছে। পাগলির অত্যাচারে, নিউ-ওয়ার্ডের গাছগুলো থেকে সব পাখি পালিয়েছে। দূর থেকে তাদের জাগরণী ভেসে আসছে। জেলে আজকের ভোরটা একটু অন্যরকম। সকলেই 'নিদ্রাহারা'! কিন্তু ক্লান্তি নেই। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছি কখন যম আসে! একেই বলে যমের দক্ষিণদ্বার! 'দ্বার' খোলার অপেক্ষা। ওদের বললাম—"ভয় নেই। মনে হচ্ছে মেরে ফেলবে না! মেরে ফেলার ইচ্ছা থাকলেও প্রেসিডেন্সি জেলে সেটা করানোর লোকই পাবে না।" ওরা ফুঁপিয়ে উঠল। ওদের ফোঁপানির শব্দ "...আমাদের একটা সুযোগ দিলে না। আমরা কী মুখ দেখাব বাইরে...।" শব্দ শেষ হ'তে-না-হতেই সমন হাজির। দুই ডি সি-র একজন বলল "দুটো হার্মাদকে একসঙ্গে নয়! এই ভোম্বল! তুই আগে আয়।" আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"আপনার ব্যবস্থা পরে হবে।" কথা শেষ না-করেই ডেপুটিবাবুকে বললেন—"বুঝলেন মিঃ চৌধুরী, হি ইজ্ মোর ডেঞ্জারাস! কলম এবং ছুরি দুটোতেই এক্সপার্ট। অনেকদিন সুযোগ খুঁজছিলাম! থ্যাঙ্কস খোকন ভট্টাচার্য!" গেট খুলে গেছে। ভোম্বল চলে গেল।

কমরেডরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। ঘৃণা-মায়া-মমতা মেশানো স্লোগান। এ স্লোগানের ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু গভীরতায় এ স্লোগান কয়েক কোটি লোকের আওয়াজের সমান! বাতাসে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছি—ভোম্বলের শেষ গলার স্বরটা শোনা যায় কিনা! সকলেই চুপ! পাখিগুলোও কিচির-মিচির করতে ভুলে গেছে নাকি! চড়ুইগুলো কোথায় পালাল? এ সময় যে-কোন শব্দই প্রাণের লক্ষণ।

মানবের সাথে দানবের

কোন এক (নামটা মনে পড়ছে না) আমেরিকার সাংবাদিক বিশ্ব-ভ্রমণের পর একটা বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুন্দর একটা কথা বলেছেন—"ভারতে গিয়ে আমি ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ভগবানের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভারতবাসীদের বেঁচে থাকা! ভগবান না-বাঁচালে, কোন মানুষ ওই অবস্থায় দু-দিনও বাঁচতে পারে না।" তিনি যদি নিশীথদা, ভোম্বল, কিংবা আমাদের দেখতেন; যদি একবার দেখতেন আমরা এখনও বেঁচে আছি, এবং বেঁচে আছে আমাদের পরিবারগুলোও, তাহলে তাঁর প্রমাণের সপক্ষে আরও সুন্দর সুন্দর উদাহরণ তুলে ধরতে পারতেন। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো, মানুষকে মেরে ফেলতে চাইলেই মেরে ফেলতে পারে না। মানুষের 'মাথাটা' বোঁটার ফুল নয়—যে ইচ্ছা করলেই কেউ ছিঁড়ে নেবে!

ভোম্বল কতক্ষণ গেছে? জানি না! ভাবতে ভাবতেই সি-আর-পি পার্টি হাজির। এবার নেতৃত্বে স্বয়ং জেলরবাবু!

অর্থাৎ আমাদের এক সময়ের ক্যাডার! দরজা খুলে গেল। ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভেতরে ওদের ফোঁপানি-গলার আর্তনাদ—"আজিজুলদা!" একটু হেসে স্লোগান তুললাম—"নকশালবাড়ি লাল সেলাম!" "শত শহিদের রক্তে রাঙা লাল পতাকা লাল সেলাম।" ওরা গেটের সামনে জড়ো হয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় রেসপণ্ড করল। সুব্রতর নেতৃত্বে একদল গান ধরেছে—

'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ। সে কথা ভুলব না

তোমার বুকের খুনে রাঙাইলে গো আঁধার জেলখানা...'

বারোজন লোক কর্ডন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম সারিতে চারজন লাঠি, তারপরের চারজন কিরীচ (তলোয়ার) ধারী, শেষ সারির চারজন মাস্কেট! বারান্দার শেষ পর্যন্ত ওদের গানের সুর শুনতে শুনতে আর গুন গুন করতে করতে এগিয়ে

গেলাম। কে যেন এসকর্ট পার্টিকে সাবধান করে দিল—"সাবধান! ওর হাতের-নাগালে কেউ থাকবেন না!" নিউ-ওয়ার্ডের গেটের কাছে পৌঁছে মনে হল কেউ পেছন থেকে মাথা লক্ষ্য করে লাঠি তুলছে—শট করে বাঁদিকে সরে গেলাম! একজন লাঠিধারী ডানদিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল! হেসে পেছন ফিরলাম। পেছন ফিরতে দেখেই লাঠিধারীরা দু-পা পেছিয়ে গেল। জেলর গম্ভীর হয়ে কমাণ্ড দিল—"সাবধান! মাথা বাঁচাবেন!" (এটাই জেলের কমাণ্ড! যখনই কোন কমাণ্ডিং অফিসার মারার নির্দেশ দেন এটা তাঁকে বলতেই হবে।) সাময়িক হল্ট! আবার চলেছি, কোথায়··· ? দেখি···

দড়ি-হাজত, অরবিন্দ সেল, স্কুল পার হয়ে এলাম। কৌতূহলী বন্দীরা আজ নেই। গোটা চত্বর ফাঁকা। রোদ ওঠেনি এখনও। তবে ফরসা হয়ে এসেছে। রেলিঙ গেট খুলে গেল।

রেলিঙ গেট থেকে কয়েকগজ দূরে কেস টেবিল। আমাকে আসতে দেখে ডি সি এম বি উঠে এল। "এ শালা লেড়ের বাচ্চাকে জন্মের মত পঙ্গু করে দাও!" নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে কে একজন কোমর লক্ষ্য করে লাঠি চালাল—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল "দু-স্টেপ লাফিয়ে যাও!" সামনে লাফিয়ে গেলাম। লাঠিটা ফস্কাল। আমাকে লাফাতে দেখে দুই ডি সি কোমর থেকে রিভলভার টেনে চার স্টেপ ব্যাক-লাফ দিল।

—"এই শালা শুয়োরের বাচ্চা! আর এগুবি না! এগুলেই গু-গু-গু···গুলি করব।"

হেসে ফেললাম! "শালার কাগুজে বাঘ সব!" খিস্তি করলাম জোরেই। বুঝলাম সব রকমের প্রচারেরই একটা মূল্য আছে। প্রচারকারী যে-উদ্দেশ্যেই করুক না কেন যাদের কাছে এ গুলো যাচ্ছে তারা নিজেদের মত করে ভেবে নেয়।

সি পি এম থেকে বেরিয়ে আসার সময় নেতারা 'খুনে', 'বাবাকে খুন করে পালিয়েছে', 'দু-হাত দিয়ে ঘাড় মটকে মানুষ মেরে ফেলে' ইত্যাদি যে-সমস্ত প্রচার করেছিল তার প্রভাব পড়েছে ওদেরই বাহিনীর ওপর। সকলেই চিৎকার করছে "মার শালাকে! মার ডালো!" "মার, মার" "গিরাও শালে কো!" কেউ আর এগিয়ে আসছে না। ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনীর দিকে ফিরে (অর্থাৎ ডি সি-দের পেছনে রেখে) মাস্তানের মত হুঙ্কার দিলাম "মারবে? মার। তবে তোমাদের পুলিস-বাবারা তোমাদের চিরকাল বাঁচাবে না, ভাটপাড়ার ওপারে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। রেণ্ডিখানায় যাবে কী করে? কেন মারবে?···" হঠাৎ পেছন থেকে ডি সি এস বি চিৎকার করে উঠল, "জেলর বাবু! ওকে বক্তৃতা করতে দেবেন না।

আপনার ফোর্স আপনাকেই কেলাতে শুরু করবে। স্টপ হিম। ফোর্স হিম।" জেলর আর ডি সি ডি ডি পেছন থেকে এসে জাপটে ধরল। মনে মনে ভাবলাম—"এরই নাম চাকরি! এক সময়ের কমরেড! হায় কমল!"

দুজনে প্রায় পাঁজাকোলা করে কয়েক পা দূরে একটা কাঠের কপাট দেওয়া দরজা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল, ছিটকে পড়লাম। পয়লা-বাইশ সেল ব্লক। মাথা তুলেই দেখলাম—নিশীথদা, ভোম্বল, বিপ্লব পড়ে আছে। চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। 'ওরা বেঁচে আছে তো?" চিৎকার করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই জেলর এবং ডি সি ডি ডির চিৎকার—"গিরাও! মাথা-বাঁচাকে!"

ব্যস শুরু হয়ে গেল লাঠি পেটা। সাপ-পেটানোর মত লাঠি পড়তে শুরু করেছে। এতগুলো লাঠি এক সাথে পড়ার জন্য লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ! "বালক ব্রহ্মচারীর জয়ধ্বনি। পাশবিক উল্লাস···" বার দুই মাথা তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম···।

২

সর্বাঙ্গে ছেঁকা-র জ্বালায় হুঁশ ফিরলে দেখি সেল-ব্লকের চাতালেই পড়ে আছি। হাত-পা কিছুই নাড়াতে পারছি না, নিশীথদা, ভোম্বল, বিপ্লব সকলেই পড়ে আছে। ডান-হাতটা তোলার চেষ্টা করলাম। যদি গড়িয়ে গড়িয়ে ওদের কাছে পৌঁছানো যায়! বুঝলাম হাতটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ব্যর্থ চেষ্টা! আমাকে ছটফট করতে দেখে এক বৃদ্ধ সিপাই এগিয়ে এল···'মজুমদার দাদু!' কানের কাছে মুখ এনে মজুমদার দাদু ফিস ফিস করে বলল—"চুপচাপ মড়ার মত পড়ে থাকেন! শালারা এখুনিই আবার আসবে। হুঁশ হয়েছে দেখলে আবার পেটাবে—" জিজ্ঞাসা করলাম "নিশীথদা?" মাথাটা আরও নিচু করে বুড়ো বলল— "এখানে দেওয়ালেরও কান আছে! সব শালা চামচা! নিশীথবাবু একটু বেশি মার খেয়েছে, মরেনি, হুঁশ আছে। জল খাইয়েছি। মড়ার মত পড়ে আছে।" "ভোম্বল?"

"শালা-বি-ক্লাস! দুটো ডাণ্ডা খেয়েই পরিত্রাহি চিৎকার করে কেলিয়ে গেছে। ভাল আছে।"

"বিপ্লব, বিপ্লবের কী অবস্থা?"

"ওকে বেশি ডাণ্ডা মারেনি, তবে লক্ষ্মীকান্তের চেলা কার্তিক সিপাই ওর পায়ে কিরীচ চালিয়েছে! সকলেরই জ্ঞান ফিরেছে। আপনি মড়ার মত পড়ে থাকুন!"

"পিঠের তলায় ছেঁকা লাগছে যে—" আমার অনুযোগ শুনে বৃদ্ধ ধমক দিল—'লাগুক একটু ছ্যাঁকা! পড়ে থাকেন"। বৃদ্ধের কথা শেষ হতে না হতেই গেটে হইচই

আর দরজা ঠোকার আওয়াজ। মজুমদার দাদু চাবির থলিটা নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত আমাকে সাবধান করে গেল—"মড়ার মত পড়ে থাকেন।"

চিত হয়ে চুপ চাপ পড়ে আছি। ফেব্রুয়ারির রোদ তেমন কড়া নয় কিন্তু এই সিমেণ্টের চাতালে দুপুর-রোদ মোটামুটি অসহ্যই। তাছাড়া সূর্যটা সরাসরি মাথার ওপর। সেই কাল বিকেল পাঁচটা থেকে তাণ্ডব চলছে তো চলছেই। এখনও লুট-পাট বন্ধ হয়নি। নম্বরে নম্বরে সি আর পি ঢুকে যাকে পাচ্ছে ধরে পেটাচ্ছে। সব কেড়ে-কুড়ে নিচ্ছে। শীতের জামাকাপড়, শাল-আলোয়ান, ঘড়ি, রেডিও সব মিলিয়ে কিছু না হোক আমাদের নম্বরে তখনকার বাজারে হাজার বিশেক টাকার কাপড়-জামা তো ছিলই। বই-পত্তরের হিসাব এর মধ্যে না আনাই ভাল। বাড়ির লোকদের দিয়ে-যাওয়া বিস্কুট, সন্দেশ, ফল, সব লুট করেছে এরা। মটকা মেরে পড়ে সব হিসাব করছি আর ব্যর্থ একটা আক্রোশে ভেতরটা ফুঁসছে। 'প্রথম সুযোগেই মোক্ষম ঝাড় দিতে হবে!' শয়তানের মাথা ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল। এতদিন পর এই প্রথম মনে হল শহরাঞ্চলেও খতমটা সঠিক! কিছু জেল-সেপাই আর তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাটাটা একান্ত জরুরী। "দাঁড়াও শালারা! কমরেডরা আবার সুস্থ হয়ে উঠুক!" নিজের যুক্তিতে নিজেই হেসে ফেললাম। "আঘাতে তোমার সব তত্ত্ব গোলমাল হয়ে গেল আজিজুল হক!" চোখ বন্ধ।

"কেমন আছে সব" গলা শুনে বুঝলাম প্রশ্নকর্তা জেলর। "বিশেষ ভাল ঠেকেছে না স্যার! পাঁচ-ছ ঘণ্টা ধরে সব বেহুঁশ হয়ে আছে! কত জলের ছিটা দিলাম!" মজুমদার দাদুর উত্তর। পায়ের আওয়াজে বুঝলাম আরও কয়েকজন আছে। তারা উল্লাসে চাতালেই লাঠিপেটা করছে! জেলর ধমকে তাদের সেল চত্বরের বাইরে বার করে দিল। "রক্ত-খেকো নেকড়ে পুষছি। বুঝলেন মজুমদারবাবু! এরা এক-দিন আমাকেও খাবে! বলুন তো! বছরের পর বছর জোয়ান ছেলেরা জেলে বন্ধ থাকতে পারে? পালাবে না? বেশ করেছে, তা ব'লে মেরে ফেলতে হবে!" বুঝলাম জেলর অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মগ্লানিতে ভুগছে। "আপনি ছিলেন বলে স্যার তবু কেউ মরেনি!" মজুমদার দাদুর তেল-মারা কথা। "না, না, ওসব বলবেন না। মরেনি কিন্তু মরতে পারে তো? আজিজুলদা কেমন?" কাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী জানি। আমার মনে হল উত্তর দিই। আবার মনে হ'ল আফটর অল জেলর!

"বুঝলেন, এরা সব সমাজের ক্রীম! কি স্ট্যামিনা দেখলেন? একা একটা লোক এত বড় ফোর্সকে দু-দুবার হটে যেতে বাধ্য করল। কি ডেডিকেশন! এই

নিশীথ ভট্টাচার্য—একজন প্রফেসর বুঝলেন! বিপ্লব হালিমের বাবা কত বড় লোক জানেন? আর আজিজুলদা?" কান খাড়া হয়ে উঠল। ভাবছি কি বলতে পারে কমল ব্যানার্জি! আমার বাবা তো বিখ্যাত নন, আবার নিজেরও কোন যোগ্যতা নেই। তবুও শত্রুপক্ষ কী বলে শোনার জন্য কান সতর্ক হল। …"ইস্! ওঁর যদি কিছু হয়ে যায় আমার ঘরেই আমি মুখ দেখাতে পারব না। আমার গিন্নি আবার ওঁর ফ্যান!" কথা শেষ করে জেলর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। আমি ভাবছি এটাই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। নাই বা হলাম বিখ্যাত বাবার ছেলে, নাই বা হলাম প্রফেসর কিংবা পণ্ডিত! একটা খুনী আমলার বউ কিংবা এক তরুণী মা তার স্বামীকে অভিযুক্ত করছে—এটা কম পাওয়া নাকি! মানুষের কোনখানে আমাদের জায়গা বোঝার চেষ্টা করলাম। ইস্ এতক্ষণ ধরে রাগে এদেরই কাটার কথা ভাবছিলাম? ছিঃ ছিঃ। সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল! বোঝার চেষ্টা করলাম, 'আমরা কারা?'

জেলরকে চুপ করে থাকতে দেখে মজুমদার দাদু বলল—"স্যার, এঁদের ঘরে তুলে দি?"

"হ্যাঁ, তাই দেন! তিনদিনের আগে ডাক্তার আসবে না! ১৮ নং-টা পরিষ্কার আছে তো? ওখানেই তুলে দেন। একটু জল, চা-টা খাওয়াবেন!" জেলর নির্দেশ দিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াল বলে মনে হচ্ছে। চাবি বন্ধ করার শব্দে বুঝলাম জেলর বেরিয়ে গেছে। "এই বুড়ো শোন।" মজুমদার দাদুকে হাঁক দিলাম। "এই চুপ, চুপ, মেট পাহারা আছে। আগে সেলে তুলে ঘরে চাবি লাগাই তারপর কথা!"

'ঝমা-ঝম্-ঝম্' শেকল বেড়ির শব্দ। অর্থাৎ গৌরদা মেট। নাম গৌর মাহাতো। গোটা জেলে একমাত্র শেকল-বেড়ি লাইফার। তাই বিখ্যাত। পুরুলিয়ার আদি-বাসী। জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোল। ভাইকে খুন করে যাবজ্জীবন হয়েছে। একবার জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই ডাণ্ডা-বেড়ি এবং চিরস্থায়ী সেল বাসিন্দা! অন্য বন্দীরা ওকে গৌর-নকশাল বলে ডাকত। গৌরদা তার বাহিনী নিয়ে হাজির। চোখ মেলে ডাক দিলাম—"এই শালো গৌরদা!"

"দাদা বলছিস আবার শালো বলছিস কি রে শালো!" গৌরদা চিৎকার করে পুরুলিয়া টানে উত্তর দিল। "বুঝলে দাদু, ঐ শালো এত মার খেয়েও শালোর রস মরেনি, দাও না, আর দু-ঘা।" কথা বলতে বলতেই একটা কম্বলে নিশীথদাকে তুলল। "আয় না শালো! এখনও একটা পা ভাল আছে। মারব লাথি!" হাসতে হাসতে চ্যালেঞ্জ জানালাম। "আসছি রে শালো দাঁড়া, নিশীথদাকে রেখে আসি।"

কম্বলটার চার প্রান্ত চারজন ফালতু ধরে টেনে তুলল। স্ট্রেচারের বিকল্প। না, আমার চেষ্টা ব্যর্থ। যাদের উদ্দেশে এবং যে-উদ্দেশে কথাগুলো বললাম সফল হল না, 'ওরা কেউ চোখ খুলছে না কেন?' তাহলে কি বেঁচে নেই। মজুমদার দাদু মিথ্যা কথা বলল? যত ভাল লোকই হোক 'খাকী' তো! আবার একগাদা দুশ্চিন্তা। কোথায় নিয়ে গেল নিশীথদাকে?

গৌরদা আবার ফিরে এসে বিপ্লবকে নিয়ে গেল। তারপর ভোম্বলও গেল। কেউ কথা বলছে না কেন? ছটফট করছি। ওদের আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ভোম্বলকে রেখে গৌরদা আমার কাছে এলো। বললাম—"একটু ধর না হেঁটেই যাব।" গৌরদা ধমক দিল—'শালো গাঁড়ে রস হয়েছে না? মরার সখ হয়েছে? মটকা-মেরে শুয়ে থাক। আথুনি।" সি-আর-পি আসবে, সুতরাং শুয়েই যেতে হল। কম্বল-বাহকদের পাশে পাশে গৌরদা আর মজুমদার দাদু চলেছে। "শালোকে একুশের তিনে (মর্গের জেল-নাম) রেখে আসি চল, মজুমদার দাদু!" "চল না শালা!"—কম্বলে শুয়ে-শুয়েই আমার পাঁয়তাড়া! ওরা কয়েকটা ঘর পার হয়ে একটা ঘরে আস্তে করে কম্বলটা নামিয়ে রাখল যাতে আঘাত না-পাই। মনে মনে একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করলাম—বন্দীদের মধ্যে থেকে এই জেলে ওরা এখনও পর্যন্ত কাউকেই আমাদের পেটানোর কাজ পায়নি। এটা কমরেডদের রাজনৈতিক কাজের সুফল। আগে থেকেই ওখানে শঙ্কু ছিল। পরে এলাম আমরা চারজন। অর্থাৎ একটা সাত-পা লম্বা, সাত-পা চওড়া ঘরে পাঁচজন সোমথ জওয়ান। এর নাম সেল।

৩

অনেক বিপ্লবীর স্মৃতিধন্য এই প্রেসিডেন্সি জেলের কুখ্যাত বা বিখ্যাত ৪৪ ডিগ্রী সেল। যুগে যুগে অনেক দেশপ্রেমিকের কান্না-রক্ত-দৃঢ়তার সাক্ষী এখানকার প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথর। এখানেই কাটিয়ে গেছেন বারীন ঘোষ, সত্যেন, কানাই, মনোরঞ্জন। দীনেশের অমর সৃষ্টি দীনেশের-পত্রাবলী এখানকার একটা ঘরে বসে হ্যারিকেনের আলোতে লেখা! সবচেয়ে বড় কথা—আমার সতীশদার বহু রক্ত ঝরেছে এখানে। মেঝেতে আঙটা পোঁতা। যুবক সতীশ পাকড়াশীকে শেকল-বেড়ি পরিয়ে ঐ আঙটার সাথে বেঁধে—সাহেব চাবুক চালাচ্ছে। কোন জানালা নেই। ওপরে ঘুলঘুলি দিয়ে শালপাতায় মোড়া খাবার। পাশে ইউরোপীয়ান সেলে সুভাষ বসুরা তখন সুজির হালুয়াতে ঘি-এর পরিমাণ নির্ধারণে ব্যস্ত। বেঁটে-খাটো মনোরঞ্জন হালদার? ওঃ কি স্ট্যামিনা! কাঁটাতারে শুইয়ে সাহেব কোঁড়া

চালাবার হুকুম দিল। দশাসই পাঠান চাবুক হাতে যেই মারতে যাবে শেকল ছিঁড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন মনোরঞ্জন। টুঁটি টিপে ধরলেন তার। পেছনে তখন ঘানি ছিল, এখন সেটা ছাতা কামান। সাজা-প্রাপ্ত বিপ্লবীদের দিয়ে ঘানি টানানো হত। তাঁরা শুনলেন ৪৪ ডিগ্রীতে তাদের কমরেডদের ওপর সাহেব সুপার অত্যাচার চালাচ্ছে। ব্যস সাথে সাথেই পরিকল্পনা হয়ে গেল। একদিন গোটা জেল সচকিত, হতভম্ব! কি ব্যাপার? ঘানি ঘরে রেঁাদে বেরিয়ে সাহেব ঘানি চাপা পড়েছে। স্বদেশীবাবুরা সাহেবকে ঘানিতে পিষ্টে দিয়েছেন। 'সাহেব-তেল কেমন হয়' দেখার শখ হয়েছিল তাঁদের। নামী-দামী স্বদেশীবাবুরা এই 'বর্বর হত্যাকাণ্ডে'র প্রতিবাদ করলেন। তরুণ-বিপ্লবীরা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। 'চালাও অত্যাচার!' 'হত্যা করার একচেটিয়া অধিকার আমরা ভেঙে দিয়েছি কি ভেতরে কি বাইরে…' ভোম্বলকে শোনাচ্ছিলাম স্থান-মাহাত্ম্য। নিশীথদা ধমক দিলেন—"চুপ কর তো! তুমি সব সময় অতীতে বাস কর! এই অভ্যাসটা ছাড়।" সত্যিই তো, এঁরা বর্তমান। কিন্তু আমি যে আমাদের অতীতকে ভুলতে পারছি না, এ দোষ কার? আমার?

শঙ্কু দরজার কাছে শোবে না। বিকেল হয়ে আসছে। ওর ভয় রাত্রে যদি—বোম্বাইয়ারা এসে দরজা দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে পেটায় কিম্বা কিরীচ চালায়। একেবারে অমূলক আশঙ্কা নয়। ঠিক হল একেবারে দরজার গোড়ায় আমিই শোব, তারপর পরপর নিশীথদা, ভোম্বল, বিপ্লব। সবশেষে শঙ্কু। আমার হাঁটুটা সরে গেছে, ডান হাতের কব্জিটা প্যাঁক-প্যাক করছে, কনুইটারও বোধহয় হাড় সরেছে। মাথাটা মেঝেতে পড়ার সময় একটু ফেটেছে। এই যা। আঘাত মাইনর। নিশীথদার পা শতছিন্ন। দু-পায়েরই সিনবোন গেছে। মালাইচাকিটা বেরিয়ে আসতেচাইছে। ডান হাতের আঙুলগুলো থেঁতলানো। একটু মেজর। ভোম্বল! ওর ভাষায় "এই তোমাদের মত আদর্শবাদীদের, এই হয়েছে মুস্কিল! আরে বাবা জেলের ভাষাটা হচ্ছে 'গিরাও'। সুতরাং 'গিরে' গেলেই মার শেষ! দু-ঘা লাঠি পড়তেই চিল-চিৎকার করে আমি গিরে গেলাম। ওরা পিঠের ওপর আর দু-চার ঘা দিয়ে চলে গেল! ব্যস হয়ে গেল। তা না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দাও মার খাও!" এ-যাত্রা ওর ভেঙেছে-ভুঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। বিপ্লবের ডান পায়ের কাফে গভীর ক্ষত! রক্ত পড়তে পড়তে আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে। কাহিল হয়েছে ঐ সব থেকে বেশি। সব থেকে কম মার খেয়ে সব থেকে বেশি কাহিল। শঙ্কু মারই খায়নি। যাইহোক না কেন শরীর তার দাবি আদায় করে নেবেই। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল—কারুরই পেটে কিছুই পড়েনি, তারপর এত টেনশন। নিশীথদা আর বিপ্লবের ঝাঁপিয়ে জ্বর এল। 'টেনশন-রিলিজে'র উত্তাপ, না ম্যালেরিয়া?

শঙ্কুর ওপর ভরসা করা যায় না। একটাও এক্সট্রা কম্বল নেই। আমার আর ভোম্বলের কম্বল দুটো দিয়ে দু-জনকে চেপে ধরে থাকলাম। ডাক্তার ডাকার চেষ্টা বৃথা। আই জি-ফাইভী ঘুরে না-যাওয়া পর্যন্ত কেউ আসবে না। সবচেয়ে বড় অসুবিধা পাঁচজন লোক পেচ্ছাব করবে কোথায়? একটাই তো টুকরি! এক কোণে একটা ঢাকনা বিহীন তেকোনা টিনের টুকরি পড়ে আছে। পেচ্ছাব পায়খানা সব ওতেই। এতক্ষণ ধরে শঙ্কু একাই ওটাকে ভরিয়ে রেখেছে। উগ্র এ্যামো-নিয়ার গন্ধে ঘরের বাতাস ঝাঁঝালো। নিশীথদার আবার একটু গন্ধ-বাতিক আছে। ওঁর আরও বাতিক ছিল যেমন কারুর সামনে বা কেউ কথা বললে ওঁর শরীরের জল আর বেরুতে চায় না। ব্লাডার ফেটে গেলেও না। ব্যস, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে হয়। "ওঃ আজিজুল, পেচ্ছাব করবো।" নিশীথদা জ্বর, যন্ত্রণা, তার ওপর পেচ্ছাবের বেগ, ভোম্বল হেসে ফেলল। আমি নিজেও দাঁড়াতে পারছি না। পেছনটা ঘষতে ঘষতে টুকরি পর্যন্ত গিয়ে বাঁহাতে 'শৌচকার্য নিমিত্তে' রাখা ভাঙা টিনটা নিয়ে এসে ওঁর কম্বলের নীচে ধরলাম। হাসতে হাসতে বললাম—"এই কমরেডরা, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপটি করে থাক, কমরেড এন বি এখন জলত্যাগ করবেন। আত্মত্যাগ করতে করতে ফিরে এসে এখন তিনি জলত্যাগ করবেন!" ভোম্বল হেসে উঠতেই নিশীথদা খেপে গেলেন। শরীরের এক বিশেষ স্থানের চুলের নাম প্রথম উচ্চারণ না করে উনি কোন কথাই শুরু করতে পারেন না। খেপে গিয়ে আমার কৌটোধরা হাতটা সরিয়ে দিলেন—। "...এর কমরেডলি ফিলিংস সব! এ-দিকে আমার ব্লাডার ফেটে যাচ্ছে আর ওনারা দাঁত কেলাচ্ছেন!" রাগে গজগজ করতে করতে নিজেই টিনটাকে ইউরিনাল বানিয়ে নিলেন। বিপ্লব আর শঙ্কু এতক্ষণ আমাদের এই 'ত্যাগ' যুদ্ধে নির্বিকার দর্শক ছিল। শঙ্কুই প্রথম কথা বলল—"তোমরা এত হাসাহাসি কোরো না, ওরা কিন্তু এখনও ঘুরছে।" নিশীথদা খেপে গেলেন আবার "বা...এর পার্টি করতে এসেছে! হাসতে হাসতে যদি মরতে না পারো যাও গিয়ে কংগ্রেস করো" (হ্যাঁ, ও কথা রেখেছে বটে! এখন শঙ্কর সিংকে কে না চেনে?) এবার আমার গুম হয়ে যাবার পালা! সত্যি তো নির্যাতন, অপমান, মৃত্যুকে যদি হাসতে হাসতেই বুকে না টেনে নিতে পারি—সেগুলোর দাম কী, অতএব মাভৈঃ।

৪

ভাবনা শেষ হতে না হতেই একদল গুণ্ডা অ্যান্টি-সেলের দরজা ঠেলে অ্যান্টি-সেলের সামনে দাঁড়াল। চাতালে দমাদম লাঠি পেটাচ্ছে আর খিস্তি করছে। ভেতরে

আমরাও মস্করা চালিয়ে যাচ্ছি। 'রোগ-শোক-দুঃখ' ভুলে নিশীথদা জোরে জোরেই বললেন—"যে শালা প্রথমে ঢুকবে তার অণ্ডকোষ আর পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে নাও! এক শালাকে চাই-ই!" ওরা ভেবেছিল এসে দেখবে আমরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি তা নয়—দেখে মেজাজে হাসি-ঠাট্টা করছি। একটু হতভম্ব হল গুণ্ডাবাহিনী। বাঁহাতে পেচ্ছাবের টিনটা নিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। ..."আরে, শালে! উনলোগোঁ কা মা কা ভুঁসড়ী মে...ডালো, শালে লোক পিসাব ফেক্‌তা হ্যায়..." বাকিরা 'রাম রাম' করতে করতে দৌড়। আকস্মিকভাবেই লড়াইয়ের একটা মোক্ষম হাতিয়ার আবিষ্কার হয়ে গেল। পেচ্ছাব-পায়খানাও অস্ত্র! বিহারীগুলোর ভীষণ জাত-পাত আর ছোঁয়া-ছুঁতের ভয়! পেচ্ছাব খেতে রাজি নয়।

মিনিট পনের পরে জেলর এসে হাজির। সি আর পি বাহিনীকে অ্যান্টি-সেলের বাইরে রেখে একাই ঢুকল।

"আজিজুল দা! বয়স তো হল, এবার চ্যাংড়া-বুদ্ধিগুলো ছাড়ুন না! আমার ফোর্সের গায়ে পেচ্ছাব ছুঁড়লেন কেন?" "মোটেই তোমার কমরেডদের মানে ঐ লুম্পেনগুলোর গায়ে পেচ্ছাব ফেলিনি! ঐ জানোয়ারগুলো নিশীথ ভট্টাচার্যর পেচ্ছাব খাবারও যোগ্য নয়। বামুনের পেচ্ছাব রাখব কোথায় বলো? একটা টুকরিতে পাঁচজনের সঙ্গে তো রাখা যায় না; আগুন জ্বলে যেতে পারে। তাই ছুঁড়ে দিলাম!" আমার কথা বলার ঢঙে সকলেই, মায় খুনীবাহিনীর বাঙালীগুলো পর্যন্ত হেসে ফেলল। "ওঃ এত মারও খেতে পারেন আপনারা? আপনাকে নিয়ে হয়েছে যত মুস্কিল! আজকের রাতটা ম্যানেজ করে নিন কোনরকমে। কাল থেকে প্রত্যেককে পৃথক করে দেব।"

"চব্বিশ ঘণ্টা তো হতে চলল, খেতে-দেতে দেবে, না কি সেটাও বন্ধ করে দেবে?" জেলরকে জিজ্ঞাসা করলাম। কথা শেষ হবার আগেই একটা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় গোটা পনের রুটি, অন্য একটাতে কালো ডাল, আর জেলের বিখ্যাত ঘ্যাঁট। খোসাভর্তি কুমড়োর সঙ্গে বেগুন, খোসাসমেত কচু মিলেমিশে এক ঘ্যাঁট! তালা খুলে গৌরদা থালা দুটো ঢুকিয়ে দিল। আহা রুটি তো নয়। মানুষের গলা লক্ষ্য করে যদি এগুলোকে রিঙ বলের মত ছুঁড়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই গলা-কাটা যাবে! তাই অমৃত! রুটির কোণগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাঝখানের অপেক্ষাকৃত নরম অংশটা ডাল-তরকারির সঙ্গে ভাল করে চটকানো হল। বাঃ বেশ ভাল পিণ্ডি তৈরি হয়েছে! প্রত্যেকের পেটেই আগুন জ্বলছে। মাল তো এতটুকু! একই থালায় বসা হল খেতে। যার যে-হাতটা চলছে সে সেই হাতেই খাচ্ছে। খাচ্ছে না, ছাই! প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতা করে হাতের গতি কম করে ফেলেছে।

হঠাৎ সকলেরই হাতের হাড় ভেঙে গেল ! এ ওকে বলছে "আরে খাচ্ছিস না কেন ? আমি একাই তো সব সাবড়ে দিলাম !" ও তাকে বলছে "কী হল খাও।" সকলের মুখ নড়ছে কিন্তু হাত চলছে কম। সকলেই জানি এর মানে কী ! 'আহাঃ জওয়ান ছেলেটা চব্বিশ ঘণ্টা কিছুই খায়নি—ও একটু খাক' একদল এটা ভাবে তো অন্যদল ভাবে—'ইস্ ! এই বয়সে এত ধকল সইবে কী করে ? আমাদের তো স্বাস্থ্য ভাল, আরও দু-চার দিন না খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারব। চালাকি করে ওঁদের একটু বেশি খাইয়ে দিলে ক্ষতি কি ? না হলে ওঁরা বাঁচবেন না !' এই 'আত্মত্যাগের' প্রতিযোগিতায় অতটুকু মাল তাও পড়ে রইল। আবার ছোট শঙ্কর ওপরই দায়িত্বটা বর্তাল বাকিটা শেষ করার। ভোম্বল ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে—"এ রকম করলে দুই বুড়ো বাঁচবে ? কাল থেকে আমিই 'জম্পেস' বানাব। 'জম্পেস' মানে ঐ পিণ্ডি আর কি ! প্রত্যেকের ডায়েট আলাদা করে দেওয়া হবে। না-খেলে ফেলে দাও ! আমরা কি ডাস্টবিন না কি ! তোমাদের ভাগেরটা কেন খাব ?" ভোম্বল গজ গজ করছে দেখে নিশীথদার জ্বরটা তেড়ে-ফুঁড়ে এল। 'উহু উহু' করতে করতে বুড়ো কম্বলের তলায়। ভোম্বল তবেই চুপ করে। ওকে চুপ করতে দেখে নিশীথদা আমার পেছনে কাঠি করতে শুরু করলেন—"এক্সপার্টস কমেণ্ট, প্লীজ !" চোখ পাকিয়ে নিশীথদার দিকে তাকালাম বটে কিন্তু তখন আমি ফেরত চলে গেছি—৬৪-৬৬'র সেই বীভৎস জেল-জীবনে। বিধান রায়-মুজফফর আহ-মেদের চুক্তির বলে বলীয়ান বন্দী জীবনে। মাছের টুকরো নিয়ে কুৎসিত বাক্য বিনিময়, টোস্টে মাখনের পরিমাণ নিয়ে খেস্তাখেস্তি ! তার পাশে এই দৃশ্য। বেঁচে থাক সরোজদা ! দীর্ঘ-দীর্ঘদিন ধরে তিনি বেঁচে থাকুন। কিছু না করুক সরোজদার জেল-লাইনের স্পিরিট পশু বানাবার কারখানায় আমাদের মনুষ্যত্বটাকে টিঁকিয়ে রেখেছিল। সরোজদার সমালোচকরা (যাঁরা যৌথভাবে লাইনটা আমদানি করার পর ধরা পড়েই সমালোচক হয়ে 'শ্রেণীভুক্ত-বাবু-নকশাল' হয়ে গেলেন ! সব দোষ সরোজদার ঘাড়ে চাপিয়ে অভিসম্পাত করে হাত-পা ছুঁড়লেন। তাই আমিও কৃতিত্বটা একা সরোজদাকেই দিচ্ছি। কারণ বাকিরা যে নিজেদের পিতৃত্ব অস্বীকার করে নিজেদের নপুংসক ঘোষণা করেছেন।) এ দৃশ্য দেখেননি। আঁতুড় ঘরে ঢুকে তাঁরা শুধু নোংরা রক্তমাখা-ন্যাকড়াগুলোই দেখলেন—নতুন শিশুটা তাঁদের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেল। এটাই যা দুঃখের !

পতন, না জয়ের প্রস্তুতি

স্বাভাবিক অবস্থায় 'জেল কা গরমি তিন রোজ!' অর্থাৎ জেলে আপৎকালীন অবস্থা চলে তিনদিন। তবে সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারলে একদিনেই 'গরম' ভেঙে যায়। আবার প্রতিরোধ যদি ভুল পদ্ধতিতে হয় তিন মাসও চলতে পারে জরুরি অবস্থা। সঠিক প্রতিরোধ মানে কী? প্রতিরোধ যেখানে প্রতিশোধে উন্নীত হবার সম্ভাবনা থাকে। পায়ের তলার মাটিটা যেখানে শক্ত সেখানেই আসে সঠিক প্রতিরোধ। জেলের যে-কোন প্রতিরোধের ভাগ্যই বাইরের জনসমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। আঠারটা বছর এই শিক্ষাটাই দিয়ে যাচ্ছে। বন্দী থাকা বছরগুলো আঙুল তুলে বারবার বলছে—'তুমি অজ্ঞ, উপহাস্য, আসল, আসল বীর ঐ পাঁচিলের বাইরের লোকেরা!' ঐ যে মানুষটাকে মনে হচ্ছে নিরীহ-গোবেচারা, ঐ যে মা, নিজের এবং নিজের সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছেন, ওঁরাই আসল বীর, ওঁদের বোঝ! ঠিকই তাই! পরের দিন থেকেই খবর পেলাম কাতারে কাতারে মানুষ, জেল গেটে এসে জানতে চান—'কী হয়েছে? কে কে মরেছে!' অসংগঠিত মানুষ, আত্মীয়-বিয়োগের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন মানুষ! দু-দিনেই 'গরমি' ভেঙে গেল। আই-জি ঘুরে গেল। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ক্রিয়া যখন, তখন তো প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবেই। তবে এই ক্রিয়া থেকে ফায়দা বড় কম উঠল। আরও যদি গোটা পঞ্চাশ ছেলে পালাতে পারত নির্যাতনটা বেশি সার্থক হত। যাঁরা জামিন নেবেন ভাবছিলেন—এই তাণ্ডব দেখে তাঁরা শুধু যে জামিনই নিলেন তাই নয়—কেউ কেউ বণ্ড দিয়ে কংগ্রেসী কিংবা সি পি আই-এর খাতায় নাম লেখালেন। জামিন-বিরোধী নিছক মিলিট্যাণ্টদের বড় অংশটা সরাসরি কংগ্রেসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভিড়ে পর পর জামিনে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমাদের সেই তিন নেতা প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ও আমাকে অভিসম্পাত করতে ভুললেন না। 'আজিজুল হক চামচাদের বার করে দিয়ে ভাল কমরেডদের খুন করাবার চক্রান্ত করছে।' অভিযোগের জবাবে শুধু হেসে বললাম—"বাপু হে! আমার নিজের সু (অথবা কু) কীর্তির সংখ্যা এত বেশি যে অন্যের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করার কোন প্রবৃত্তি আমার নেই। আমারই 'সোনার ধানে' তরী উপচে পড়ছে—সেখানে আমারই ঠাঁই হচ্ছে না। 'তার ওপর আবার বোঝা'!" কর্তৃপক্ষ সকলকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। রাজনৈতিক সংগঠকরা হয় সেলে না হয় অন্য জেলে স্থানান্তরিত হল। এক কথায় গড়ার মুখেই এই ঘটনা সব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। আমাদের পরিকল্পনা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঘটনা থেকে শিখলাম—প্রচণ্ড আত্মত্যাগ থাকা সত্ত্বেও স্রেফ সদিচ্ছা-জাত-বিপ্লবী পদক্ষেপ বিপ্লবের

ক্ষতিই করে। পাঁচজনের মুক্তির বিনিময়ে ৫০/১০০ জনের মুক্তিটা পিছিয়ে যায়। তবে পদক্ষেপটা অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। সমর্থন না করলে বুঝবো কী করে—তার দুর্বলতাগুলো কী!

কে কোথায় জানি না। শঙ্কু বেরিয়ে গেছে। বিপ্লবও বেরুবে বেরুবে করছে। নামী-দামী-অভিজাত-বংশের ছেলেদের গার্জেনরা আর ছেলেদের জেলে রাখতে চান না। এরকমভাবে লাঠি-পেটা খেয়ে সাপের মত মরতে দিতে চান না। মা-বাবাদের স্নেহজাত-উদ্বেগের কাছে তাঁরা বাধ্য ছেলের মত সারেণ্ডার করলেন। বাকি থাকল আমার মত ল্যাংটোর দল। কে আর আমাকে নেবে? ভারটা এত বেশি যে কেউ ভরসা পেল না। আর আমার টানে টানে নিশীথদা। দুই মানিক জোড়! সেই শুরু হল নিশীথ ভট্টাচার্য-আজিজুল হকের 'কুখ্যাত' (বা শত্রুর বুক-কাঁপানো) জুটি। আবার গড়তে হবে। একটা আঘাত ওদের দিতেই হবে।

৬৯ থেকে ৭১-এর প্রথম দু-তিন মাসকে যদি বলা যায়—কৃষক এবং ছাত্র-যুবকদের বিদ্রোহের যুগ, তাহলে গোটা '৭১কেই বলতে হবে জেল বিদ্রোহের যুগ। চারু মজুমদারের ভাষায়—'দুশো বছরের সাম্রাজ্যবাদ তার শাসন যন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ইমারত হিসাবে গড়ে তুলেছিল এই জেলখানা…' সেই জেল আজ বিদ্রোহের কেন্দ্র। 'বিপ্লবীদের সামনে সেই ইমারত' তাসের ঘরের মত ধসে পড়ছে। 'বন্দী হত্যা এবং নৃশংস দমন পীড়ন সত্ত্বেও এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জেল পালানো, জেল-বিদ্রোহ দমন করতে পারছে না, পারবে না।'

২

এই পর্যন্ত পড়ে কোন বিদগ্ধ পাঠক মন্তব্য করতে পারেন—ম'শায়, সাতের দশকের জেল মানে তো নরক! লাঠিপেটা, খুন, না-খেতে দিয়ে মারা, 'রেকিং অব ট্রিটমেণ্ট'-এ মারা অথবা পঙ্গু করে দেওয়া। এইসব। অন্ততপক্ষে গৌরকিশোর ঘোষ থেকে মেরী টেইলর তাই বলেছেন। রাজনীতিক সুলভ ভণ্ড বিনয় না করেই বলছি 'তা মশায়, জেলটা নরক, চিরকালই ছিল, আজও আছে। তাছাড়া, আমি তাদের উচ্ছেদ করার জন্য লড়াই করব—তারা আমাকে দুধে ভাতে রাখবে এটা ভাববই বা কেন? তাই জেলে অত্যাচারটা কোন বলার মত ঘটনাই নয়। বলার যেটা সেটা হল এই অত্যাচারের জাল কেটে জীবন কীরকম নিজেকে ঘোষণা করেছে—জীবনের এই দৃপ্ত ঘোষণাটাই জেল-জীবনের বলার কথা। বাকি সব কথার কথা। ন্যাকামি বই কিছুই নয়।'

চব্বিশ ঘণ্টা একটা ঘরে বন্ধ। কম্বলে চিল্লোড়, তার রক্ত-চোষার ঠ্যালায় গায়ে

দাগা দাগা ঘা। শরীরের যেখানে যত 'কেশ' জাতীয় বস্তু আছে সর্বত্রই উকুন, আর আট-গড়া স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। এরই মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এক সেল থেকে অন্য সেলে কথা চালাচালি হচ্ছে। চিরকুট চালাচালি হচ্ছে গোপনে। বেড়ালের গলায় চিঠি বেঁধে—তাকেই ক্যুরিয়র করা হয়েছে। বেড়াল পোষ মানাতে নিশীথদা রীতিমত এক্সপার্ট। অত্যুক্তি বলে কেউ কেউ হাসতে পারেন—কিন্তু এটা ঘটনা যে নিশীথদার 'মিনি', আমরা যখনই শোবার আগে 'ইনটারন্যাশনাল' গাইতাম ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। একটুও নড়ত না। মিনি ছিল আমাদের ক্যুরিয়র! সেই মিনিকেই কিনা প্রশান্তরা কেটে খেয়ে ফেলল। থাক সে সব কথা। মানুষের থেকে তো আর পশুর দাম বেশি হতে পারে না। মানুষ বাঁচার জন্য পশুকে বধও করতে পারে, খেতেও পারে, এতে দোষের কিছুই নেই। তাতে একটু আধটু নিষ্ঠুরতা দেখা গেলে এত হৈ চৈ করার কী আছে! অবশ্যই নিষ্ঠুরতাগুলো পরিহার্য। নিছক আনন্দের জন্য একটা প্রজাপতি মারাও অন্যায়। মৌলিক মানবতা-বিরোধী। কিন্তু মানুষ নিষ্ঠুরতা করেছে বলে পশুদের শৃঙ্খলমুক্ত করে মানুষ হত্যার অনুমতি দিতে হবে, তা কি অনুমোদন যোগ্য? অথচ এটাই সমাজের ডান-বাম-মধ্য সব পন্থার লোকরাই বোঝাতে চাইছেন!

দমদমে প্রায় পঞ্চাশজন মরল, বহরমপুর-জেলে তিমির শহিদ হল, আলিপুরে বন্দী হত্যার রেকর্ড হল, অমিয়কে হারালাম। স্পেশাল জেলে পরিতোষরা সাত-জন খুন হলেন, সিউড়িতেও রক্ত ঝরল, বর্ধমান জেলও বাকি থাকল না, হিসাব করে দেখা গেল দু'শর মত নকশাল বন্দীই খুন হলেন। সাধারণ বন্দীদের সংখ্যা যোগ করলে এ সংখ্যা আরও তিন-চারগুণ বেশি হবে। জানোয়ারদের মুক্ত করে মানুষ খাবার খেলায় মাতলেন ওরা। ওরা বললেন—পালাতে গেলে মরবে না? আমাদের পার্টির একদা নেতারা বললেন—'সরোজদার লাইন মানলে মরতেই হবে।' অদ্ভুতভাবে দুই দলের মত মিলে গেল। কেউ প্রশ্ন তুলল না, কেউ বলল না—'না, যত যাই হোক, জানোয়ারদের মানুষ হত্যার অধিকার নেই। জানোয়ার-দের রক্ত-পিপাসা স্তব্ধ করে দাও!'

কাগজ পড়ি, রেডিও শুনি আর চুল ছিঁড়ি। নিশীথদা বললেন—"আগে লক-আপটা খোলাতে হবে। লাইং লো! এখন গায়ের জোরে কিছু করা যাবে না। ওরা ভাবুক আমরা মরে গেছি।"

জেল কর্তৃপক্ষ হতচকিত হয়ে আবিষ্কার করল সেলের নকশালরা (বিশেষ করে, নিশীথ ভট্টাচার্য-আজিজুল হক) আর স্লোগান দিচ্ছে না। 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে না, প্রথমদিকে ওরা বোঝার চেষ্টা করল। আমাদের গাম্ভীর্য দেখে দূরে

দূরে সরেই থাকল। হ্যাঁ ইতিমধ্যে জেল-প্রশাসনে একটা রীতিমত নীতিগত পরিবর্তন হয়ে গেছে। জেল-প্রশাসন সরাসরি পুলিসের হাতে চলে গেছে। ফ্যাসীবাদের ষোলকলার পনের কলা পূর্ণ, আর কি? জেলে জেলে সিকিউরিটি অফিসার বলে গোয়েন্দা দপ্তরের একটা পোস্ট তৈরি হল। ৫২টা জেল মিলিয়ে একজন চিফ সিকিউরিটি অফিসার তৈরি করা হল। অবশ্যই তাঁকে হতে হবে একজন দক্ষ আই-পি-এস। প্রথম সি-এস-ও—'স্বনামধন্য' পাঁচুগোপাল মুখার্জি। ইনি নানান কর্ম-কাণ্ডের জন্য পুলিস এবং সংবাদপত্র মহলে বিখ্যাত। পুরুলিয়ার এস-পি থাকার সময় উলঙ্গ-আদিবাসী মহিলাদের ছবি বিক্রির মামলায় ফেঁসে জেলের দায়িত্বে চলে আসেন। কী কারণে জানি না প্রেসিডেন্সি জেলটা ওঁর নেক-নজরে পড়ে যায়। হঠাৎ-হঠাৎ মাঝরাতে দলবল নিয়ে দুমদাম রেইড অর্থাৎ সার্চ করতে আসত। এক রাত্রে তো হাফপ্যান্ট পরে গেঞ্জি গায়ে দুই কুকুর দু হাতে ধরে জেল-গেটে হাজির। 'হামারা কুত্তা ভুখা হ্যায়! সিপাই লোগোঁ কা খুন মাংতা! সিপাই লাও!' মধ্যরাত্রে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। মাতাল পাঁচু মুখার্জি কুকুর লেলিয়ে সেপাই তাড়িয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ। এ হেন ব্যক্তি যখন নিরাপত্তার দায়িত্বে—সে নিরাপত্তা ভাঙতে কতক্ষণ।

পাঁচু মুখার্জির কীর্তিকলাপ আমাদের পক্ষেই চলে এল। আমাদের শরীর ক্রমশ খারাপ হতে হতে প্রায় ব্রেকিং পয়েণ্টে চলে এসেছে। চুলকানি, পাঁচড়া, উকুন, অনিদ্রা, তার ওপর ২৪ ঘণ্টা বন্ধ এবং প্রায় না-খাওয়া, প্রধান খাদ্য গুড়ের লাল-চা, অভাবে লবণ-চা আর তেঁতুল-বিচি মেশানো আটার তেতো রুটি। ভাতের পরিমাণ কমতে কমতে আক্ষরিক অর্থেই এক গরাসে দাঁড়িয়েছে। জেলের পাঁচিল আরও চার ফুট উঁচু হল। কোণে কোণে ওয়াচ-টাওয়ার তৈরি হল। সেখানে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে সেপাই রাতদিন নজর রাখছে। 'ওপর থেকে ভেতর-পানে ঠায় তাকিয়ে থাকে বেচারারা!' জেল-গেটের সামনে সি-আর-পি-এফ. (সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস)-এর দুটো ক্যাম্প বসল। ভাটপাড়া ব্রিজের মুখের বাড়িটা দখল করে বি-এস-এফ-এর বেস-ক্যাম্প তৈরি হল। বেলভেডিয়র তো ওদের কাছে ন্যাচরাল-ব্যারিয়ার। কারণ মিলিটারি অফিসারদের কোয়ার্টার ওদিকটা ব্লক করে রেখেছে। এরকমভাবে নিরাপত্তাকে নিশ্ছিদ্র করে লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘর তৈরি করল চাঁদ বেনিয়ার দল! অতএব এখন ভেতরে একটু ঢিলে দেওয়া যায়। চব্বিশ ঘণ্টা লক-আপ উঠল। ভাঙা হাড়গুলো নিজে নিজেই প্রাকৃতিক নিয়মে জুড়ে গিয়ে আমাদের হাত-পায়ের শেপগুলো পোলিও রুগীদের মত করে দিয়েছে। তাই সই।

আঃ, রোদ! জল! হাওয়া! পশ্চিমমুখো সেল ১-২২। সেলগুলোর সামনে হাত তিনেক চওড়া সিমেণ্টের রাস্তা। তার ওপর দিয়েই উঠেছে মুক্ত দুনিয়া থেকে বিভাজনকারী (আগে ছিল বিশ ফুট এখন চব্বিশ ফুট) উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে ওপারে অস্ত্রের গুদাম। গুদামের সামনেই সি-আর-পি ক্যাম্প! অর্থাৎ সেলের ভেতর দিয়ে যদি কিছু চব্বিশ ফুট দেওয়ালটাকে টপকে ছুঁড়তে পারা যায় সেটা সরাসরি ছোঁড়ার মোমেণ্টামেই সি-আর-পি ক্যাম্পের সামনে পড়বে। লক-আপ থেকে মুক্ত হয়েই প্রথম কৌশল আবিষ্কার করে ফেলল সকলে। এরই নাম মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা!

এ তো গেল বেড়ার ওপার। এপারের খবর কী? যাঁরা মুক্তি চান তাঁদের খবর কী? কলকাতাতে ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। বাইরে থেকে বেশ কিছু পরিচিত আত্মগোপনকারী নেতা এবং কর্মী ধরা পড়ে আসছে। তাঁদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হচ্ছে। চীনের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে কমরেডরা বিভ্রান্ত! ফাইলের সঙ্গে সেলের কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ সেল হচ্ছে জেলের মধ্যেই জেল। চীনের সমালোচনার ১১ পয়েণ্টকে কেন্দ্র করে কমরেডরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ১১ পয়েণ্টের পক্ষে এবং বিপক্ষে। অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সব। আমরা বললাম 'ওসব প্রশ্ন এখানে বসে কী করে মীমাংসা হবে। বাইরে বেরুতে চাও কিনা সেটা ঠিক কর। বিশাল দেশ অ-চষা পড়ে আছে ওখানেই যার যা বীজ আছে ফেলবে চল', 'ভেতরের যা কিছু আলোচনাই হোক না কেন তার মূল লক্ষ্য হতে হবে পাঁচিল।' এই প্রশ্নে একেবারে দুভাগ হয়ে গেল। তাঁদের বক্তব্য '১১ পয়েণ্ট মানলে জেলভাঙা মানা যায় না। জেল ভাঙা ছাড়া বাকি সব পন্থায় ১১ পয়েণ্ট গ্রাহ্য পন্থা!' আমরা বললাম '১১ পয়েণ্ট এবং মুক্তি। লড়াইটা যদি এ দুটোর মধ্যে হয় আমরা মুক্তির পক্ষে। আর মুক্তি ওরা এমনি দেবে না।' দু-একজন সর্বোচ্চ কমিটির নেতারও পদার্পণ ঘটল। জেলে ঢুকেই তাঁরা জেল ভাঙার লাইনকে নির্মমভাবে আক্রমণ শুরু করলেন। জেল ভাঙবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের সাতখাতাতেই তাঁরা আবার জমা হলেন। জেল যাঁরা ভাঙতে চান না—তাঁরা মিলেমিশে একটা রাজনৈতিক ফাইল খুললেন।

অন্যপক্ষে যাঁরা জেল ভাঙতে চান—তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করলেন ওদের খেউড় করার জন্য। সমস্ত শক্তি খরচ হ'তে শুরু করল—খেউড়ে। সেল এসব থেকে মুক্ত। হ্যাঁ, তাঁরা আরও একটা কাজ শুরু করলেন—'সংশোধনবাদীদের' সঙ্গে পার্থক্য রেখা টানার জন্য—বিচিত্র তত্ত্ব আমদানি করলেন—'ছোটখাটো লড়াই করিয়ে—কমরেডদের টেম্পারড করে তোলো। জেল ভাঙার জন্য

এটা নাকি অনিবার্য।' ফল যা হবার তাই হল। প্রায় ছোটখাটো প্রাক্-পাগলী অবস্থা। ডাণ্ডা, হাত-পা ভাঙা।

ওঁদের কর্মসূচী হল লালঝাণ্ডা তোল, স্লোগান লেখ, কর্তৃপক্ষ মুছতে এলে রেজিস্ট-রেজিস্ট খেলা খেল—দু-চার ঘা ডাণ্ডা খেয়ে হাসপাতালে যাও, ভাল হয়ে মূল্যায়ন কর। আবার ঐ কাজই কর। আবার ডাণ্ডা খাও, আবার মূল্যায়ন··· একই চক্রে ঘুরে বেড়াও। আমরা ওঁদের বলতে শুরু করলাম সশস্ত্র গান্ধীবাদী! দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কতদিন মার খাওয়া যায়? ভাল একটা অংশ হয় জামিনে বেরিয়ে গেল না হয় সাতখাতায় ঢুকল।

এর মধ্যেই সরোজদা শহিদ হয়ে গেলেন। আমরা একেবারে পিতৃহীন হয়ে পড়লাম। একদিকে ১১ পয়েণ্ট অন্যদিকে প্রচণ্ড উৎসাহী সশস্ত্র গান্ধীবাদী কর্মসূচী! ওরা বলে চারুপন্থী, এরা বলে চীনাপন্থী! কি কেলো! কি কেলো! ঐ সময়েই আমার মনে হয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম দু'টো রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রথমটার নাম 'জেলের মধ্যে সংশোধনবাদের নির্দিষ্ট প্রকাশ' আর দ্বিতীয়টা তো (একটু আত্মপ্রচার করে দিচ্ছি) নানান কারণে ঐতিহাসিক। এবং আজও প্রাসঙ্গিক—'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়গুলো রক্ষা করুন!' প্রথমটাতে দু-পক্ষকেই তুলো ধুনা করেছিলাম, জেল-পালানো কেন সঠিক তার বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই জেল পালানোর নির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলো নির্ধারণ করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টাতে ছিল লিন-পিয়াওকে হত্যা করার মাধ্যমে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে রঙ পাল্টাতে চলেছে তারই ইঙ্গিত। সেদিন-কার বিরোধীরা আজ প্রায় প্রত্যেকেই চীনা পার্টির স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন। ফারাক যেটুকু আছে তা হল ওঁরা বলছেন মাও-সে-তুং-এর মৃত্যুর পর চীনা পার্টি ডিগবাজি খেয়েছে, আমি বলেছিলাম দশম কংগ্রেসের সময় থেকেই ডিগবাজি খাওয়া চীনের পার্টির হাতের বলি—মাও সে তুং! আশা করছি সময় আমাদের প্রত্যেককেই শিক্ষিত করে তুলবে। এই মতভেদটুকুও থাকবে না। এরই জন্য মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজ আমি ভীষণ রকমের আশাবাদী। মনে হচ্ছে সব কমিউনিস্ট বিপ্লবী আবার এককাট্টা হবার বাস্তব্ ভিত্ তৈরি হয়েছে।

থাক্। আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আপাতত তোলা থাক। দুটো লেখাই ভীষণ ভাবে আক্রমণের মুখে পড়ল। কেউ কেউ তো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিলেন—'জেলের ভেতরেই আমাদের খতম করে দেওয়া উচিত।' পরে অবশ্য তাঁরাই আমাকে রক্ষার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। লু-সুন একবার একটা খুব মজার কথা বলেছিলেন—'যখন কেউ তোমাকে সমর্থন করে, তুমি উৎসাহ পাও, দু-গুণ উৎসাহে

কাজ করতে পার। যখন কেউ বিরোধিতা করে, বিরোধিতা ভাঙার জন্যই তোমার কাজের গতি তীব্রতা পায়'। কিন্তু মুশকিল হয় যখন কেউ বিরোধিতা করে না। সমর্থনও করে না। তখন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি। লেখার অভ্যাস বজায় রাখতে গিয়ে লিখলাম দুটো প্রবন্ধ! সেটা কিনা ওদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল? তবে তাই হোক! লেখা দুটোর সমর্থনে উভয় পক্ষেরই ব্যাপক ক্যাডাররা এগিয়ে এলেন। এদের মধ্যে স্বপন সাহা, কিশলয়ের নাম তো বলতেই হবে। বাকিদের নাম আর বলব না। তাঁরা গোপনে যোগাযোগ করলেন। জেল-বিদ্রোহের কনসেপশনটাই পাল্টে গিয়ে নতুন মানে হয়ে গেল।

এর মধ্যে দমদম থেকে জনা-দুয়েক কমরেড তাঁদের সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে এলেন। খোকনদের সঙ্গে পালিয়েছিল একজন ধরা পড়ে ফিরে এল। দমদম জেলে মেদিনীপুরের প্রভাবে—'অক্ষরে অক্ষরে চারু মজুমদারকে মানতে হবে' স্লোগান চীনা পার্টির দশম কংগ্রেসের পরেই ফল দিল। দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট কাগজে দেখেই ওরা চারু মজুমদারের বহ্ন্যুৎসব শুরু করল। 'কে বা আগে বও দিবেন' তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল।'

এসব ঘটনার আগে কিন্তু চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার এবং লকআপে শহিদের মৃত্যুবরণের ঘটনা ঘটে গেছে। চরম অরাজকতা! ভেতরে তো সেটা আরও তুঙ্গে। প্রত্যেকেই চাইছে বাইরে বেরিয়ে কিছু একটা করতে হবে, ছটফট করছে সকলে। এই সময়ে আলিপুর জেল থেকে ফরমান এল, তার লেখক একজন অধ্যাপক। 'সি এম গ্রেপ্তার হতে পারেন না, তিনি গ্রেপ্তার হন নি। এসব বুর্জোয়া অপপ্রচার। এসবে বিশ্বাস করাটা সংশোধনবাদী ছাপ', ব্যস! আমাদের জেলের এঁরা আবার বিগড়ে বসলেন। বুঝলাম—অত্যন্ত বাজে ভাবে আক্রমণ আসছে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমার নিজস্ব মেজাজকে লাগাম পরালাম। জনে জনে যাকে পারলাম বোঝালাম—এ প্রচারের আসল উদ্দেশ্য দু-দিন পরে যখন এটা প্রমাণ হবে যে সি এম সত্যি সত্যি ধরা পড়েছেন তখন ঐ নেতা ডিগবাজি খেয়ে বললেন —"তাহলে সি এম কেমন বিপ্লবী যে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন? অতএব সি এম বিপ্লবী নয়। সুতরাং বও দাও!" আমার কথাটা সত্য প্রমাণ করার জন্যই বোধহয় মেদিনীপুরের ঐ আগুন-খেকো অধ্যাপক ঠিকই যুক্তিটি হাজির করে সদলবলে সরে পড়লেন। বেঁচে থাকুন ওঁরা! দমদম গেল, আলিপুর গেল, নামী-দামী নেতারা সরে গেলেন। রইলাম পড়ে কতগুলো অনামী অখ্যাত লোক।

আলিপুরের ৭৩-এর পয়লা অক্টোবরের ব্যর্থ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত কমরেডরাও প্রেসিডেন্সিতে এলেন। ভোম্বলও ফেরত এল। আবার ভর-ভরন্ত সংসার! প্রবীর

(পরে হাওড়া জেলে শহিদ হয়), প্রতীপের মত ছেলে পেলে যে কেউই হিরো বনে যেতে পারে। এখন আর দেরি নয়। বেরতেই হবে। অনেকদিন হয়ে গেল। কতদিন আর 'শ্বশুরবাড়ি' থাকা যায়?

৩

আমাদের জেল-পার্টি কমিটি গড়ে উঠেছিল মূলত ফাইলের কমরেডদের নিয়ে। নতুন ছেলে-পুলে সব। নকলনবিশি করতেই ওস্তাদ। তাদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার দৈন্য প্রকট হয়ে উঠল। এই সময় অর্থাৎ '৭৫-এর মাঝামাঝি সময়েও (বাইরে যখন প্রায় মরুভূমি, সবেধন নীলমণি মহাদেববাবুও সদলবলে ঢুকে পড়েছেন জেলে)। তখনও তারা বলে চলেছে '৭৪-এর ৩১ ডিসেম্বরই দিল্লি দখল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখন আবার জেল পালানোর প্রোগ্রাম কেন? আবার কলম ধরলাম। লিখলাম —'অক্ষরে অক্ষরে মানার' বা 'আনক্রিটিক্যালি' মানার তত্ত্বের প্রবক্তারা আসলে হয় ধান্দাবাজ, না হয় সৎ মূর্খ। 'আনক্রিটিক্যালি' মানা মানে অন্ধ আনুগত্য। চারু মজুমদার তাঁর লেখাগুলোতে মাত্র দু-বার এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন—দু-বারই আস্থার প্রশ্নে এগুলো এসেছে। বিপ্লবের প্রতি আস্থা, বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আস্থাটা 'আনক্রিটিক্যাল' তো বটেই। কিন্তু তিনি কম করে বিশবার 'অন্ধ আনুগত্যের' বিরোধিতা করেছেন। 'আনক্রিটিক্যালি' মানা মানে না-মানা। আনক্রিটিক্যাল সমর্থক মানে একদল তোষামোদ-মোসাহেব। এরা হচ্ছে সেই বাঁদরের মত যে ঘুমন্ত প্রভুর মুখে বসা ব্রণ সন্ধানী মক্ষিকাটা তাড়াবার জন্য তলোয়ার চালায়। এদের হাতে পড়েই প্রভুদের অপমৃত্যু ঘটে। এরা কিন্তু বাঁদরামি চালিয়ে যায়। একথা ঠিকই তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ছাড়া, বিশ্বাস ছাড়া সে তত্ত্ব যথেষ্ট আন্তরিকতায় প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু এই দৃঢ় সমর্থন আসে তত্ত্বটাকে তথ্য দিয়ে বোঝার মাধ্যমে। ক্রিটিক্যালি বিশ্লেষণের মাধ্যমে। শুরু হয়ে গেল পড়াশোনার উৎসব। অ্যান্টিড্যুরিং থেকে হেনরি মিলার কিছুই বাদ গেল না। অঙ্ক থেকে রসায়ন সব পড়। এক কথায় বাৎসায়ন থেকে রসায়ন। চিন্তা করার পদ্ধতিটাই পাল্টাতে হবে। জেল পার্টি ভেঙে গেল—ব্যাপক সমালোচনার চাপে। নতুন করে গড়ে উঠল পার্টি। কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখল ঝামেলাবাজ নকশালগুলো তাস, দাবা খেলছে, ফুটবল খেলতে মাঠে যাবার জন্য মিনতি করছে। পড়ছে…। ভ্রূ কুঁচকাল ওদের, কী ব্যাপার মতলবটা কী ওদের? জেল ভাঙার প্রোগ্রাম হাতে নিয়েই নীতিগতভাবে প্রথমে ঠিক হল আমরা যে কজন জেল ভাঙতে চাই তাদের মধ্যে একটা জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তোলা দরকার। এক জেলে থাকলেও

সকলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। যোগাযোগ করাটা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার! ব্যাপক রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে ক্যুরিয়র পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত প্ল্যান এবং অ্যাকশন সম্পর্কে প্রত্যেককে উৎসাহিত করা, এবং ৪৫ জনের কাছ থেকেই প্ল্যান আহ্বান করা। এ গণতন্ত্রের ফলে ৪৫টা ছেলেই নিছক সৈন্য থাকবে না সেনাপতিও হবে। অর্থাৎ ঘটনার সময় যদি নির্বাচিত সেনাপতি হঠাৎ মারা যায় বা দুর্বল হয়ে পড়ে যে কেউ এগিয়ে এসে সে দায়িত্ব নিতে পারবে। বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেবে না। কারণ সে সমগ্র রণনীতিটাই জানে। তৃতীয়ত সম্পূর্ণ আমাদের ভেতরের উদ্যোগেই হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়েই পরিকল্পনা করা। বাইরের সাহায্যটা একেবারেই গৌণ ব্যাপার। চতুর্থত প্রত্যেককেই ডাম্পিং প্লেস খুঁজে বার করতে উৎসাহ নেওয়া। সবচেয়ে বড় কথা হল প্রত্যেককে এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা—'নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে কমরেডদের মুক্তি!' 'আমার নিজস্ব মুক্তিটা গৌণ', ন্যাশনাল লাইব্রেরির খাতা ঘাঁটলে দেখা যাবে '৭৫ সালে হঠাৎ ওদের 'এক্সপ্লোসিভ' সংক্রান্ত বই পত্তরের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। জিনিস পত্তর লুকিয়ে রাখতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছে (যেখানে ধরা পড়ার সব থেকে বেশি সম্ভাবনা সেই সেলে কিন্তু ধরা পড়ছে না!)। মারধর হচ্ছে। আমরা লক্ষ্মী ছেলের মত হজম করে নিচ্ছি। চালাক কর্তৃপক্ষ হলে একটু ভাবত। কিন্তু ওরা ভাবল দিয়েছি শালাদের 'মেরুদণ্ড ভেঙে'! অবশ্য ভাবলেও তখন ওদের কিছুই করার ছিল না। বন্দীদের শতকরা ৭০ ভাগকে (ইউ টি বা নিবর্তনমূলক আটকে ধৃত অন্যান্য দলের বন্দীদের কথা বলছি না, সাধারণ স্থায়ী বাসিন্দা!) এবং সিপাই কেরানীদের শতকরা ৮০ ভাগকে তখন আমরা হয় সক্রিয় না-হয় নিষ্ক্রিয় সমর্থক করে ফেলেছি। এই সময় লেখা হল 'দেড়হাতি গামছা পরে ঘোমটা দেওয়া যায় না, মুখ ঢাকতে গেলে পাছা বেরিয়ে পড়বে। জল ছাড়া মাছ গোপনে থাকতে পারে না। প্রত্যেক বন্দীকে কাজে লাগান! তাদের পরামর্শ ও উপদেশ নিন। তবে সাবধানে সে যাতে প্রথম দিকে বুঝতেও না পারে কী কাজে তাকে লাগানো হচ্ছে।' সুতরাং সাধারণ বন্দীদের সুখ-দুঃখের প্রতি নীরব থাকা চলবে না।

এই সময় দেশের ভেতরে মানে আমাদের বাইরে এল বিরাট পরিবর্তন। দম বন্ধ করা এমার্জেন্সি। নামী-দামী লোকেরা ভেতরে ঢুকল, ঢুকল টাকার কুমিররা। তাদের ভারে (নামে) এবং ধারে (টাকায়) জেল হয়ে গেল খোলা মেলা। আমাদের ওপর বিধি-নিষেধ থাকলেও সেটা চালু করার মত ফোর্স থাকল না। টাকা উড়ছে। সুপার থেকে গেট পাহারা সকলেই টাকা ধরতে ব্যস্ত! এই সময়েই বিখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোরের সঙ্গে সেই কুখ্যাত কথাবার্তা হয়। যেটা

লোকে বলে (গৌরদা বলে কিনা জানি না) আমার ঔদ্ধত্য আর দুর্ব্যবহারের নিদর্শন। এই ফাঁকে ঘটনাটা বলে নিই। একদিন জেলর এসে বলল, "গৌরবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।" ওকে বললাম "কাল হাসপাতালে আসতে বলবেন। ওখানেই কথা হবে।"

পরের দিন দশটা নাগাদ উনি এবং ক্ষিতিবাবু হাসপাতালে এলেন। সেল থেকে আমিও গেলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সাতখাতার ওদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়?" বললাম—"ওঁরা ডিপ্লোম্যাট আমরা পেট্রিয়ট!" উনি বললেন—"সব পেট্রিয়টিজমই ফ্যাসিবাদের জননী। ইন্দিরার চেয়ে বড় পেট্রিয়ট কে আছে?" মাথাটা একটু গরম হল কিন্তু তখনও মেজাজ শরিফ আছে। বললাম —"সে কি মশায়! একটা ব্লেড দিয়ে দাড়ি কামিয়ে মুখটা জঙ্গলমুক্ত করবেন, না লোকের পকেট কাটবেন সেটা ব্লেডের দোষ না কি? হিটলার পেট্রিয়ট ছিল, ইন্দিরা পেট্রিয়ট অতএব পেট্রিয়টিজমই খারাপ! এ যে সেই মাতালের গল্প হয়ে গেল, গরুর চার পা সে দুধ দেয়, টেবিলের চার পা সে দুধ দেবে না কেন?" উনি বোধ হয় আমার মত মূর্খের কাছে আর একটু বিনয় আশা করেছিলেন! তারপর উনি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বললেন, যৌথ প্রেস, যৌথ প্রচার (গোপন) ইত্যাদি। বললাম—"ভাল তো! চলুন, খুব শিগ্‌গিরই আমরা জেলের পাঁচিল ভেঙে দিচ্ছি! চলুন বাইরে বেরিয়ে এসব করা যাবে।" উনি অবিশ্বাসের গৌড়ীয় হাসি হাসলেন। মেজাজটা বিগড়ে গেল—মনে মনে বললাম—"যেই হও তুমি লাট সাহেব! আমার বিশ্বাসকে আঘাত দেবার অধিকার তোমার নেই!" মুখে আমারও সেই বিখ্যাত হাসি (যেটার ব্যাখা আজও কেউ পায়নি)। আচ্ছা! গৌরদা! আজ এতসব বলছেন, আজই কাগজে দেখলাম আপনার বন্ধু সন্তোষ ঘোষ লিখেছেন 'জীবনানন্দ যে সমস্ত শূকরীর প্রসব-বেদনা দেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন—তাদের সন্তান-সন্ততি আজ দিল্লি থেকে কলকাতা ভরে গেছে' পড়তে পড়তে আমাদের কমরেডদের বললাম "সন্তোষবাবু ও গৌরকিশোরকে জিজ্ঞাসা করে আয় তো এই শূকরীদের গর্ভ বানানোর জন্য তাঁরা কতখানি করে বীর্য স্খলন করেছেন।" আমাদের কথাবার্তা যাঁরা শুনছিলেন—তাঁরা হো হো করে হেসে উঠলেন! ক্ষিতিবাবু ওঁকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন! সুধী পাঠকরাই বলুন! এতে দুর্ব্যবহার বা ঔদ্ধত্য কোথায়? আবার বলছি আমার এবং গৌরদার যৌথ পরিচিত লোকরাই এসব বলছে। গৌরদা বলছেন বলে বলছি না।

এর মধ্যে দুটো ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অস্থির করে তুলল। প্রথমটা হল আমাদের দুই কমরেডকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়ে আমাদের সেলেই পাঠানো

হল। দৃশ্যটা ভাবতে পারছিলাম না। অসিত বিশ্বাস হাত-পেছন মোড়া হয়ে কালো বোরখা পরে আমার সামনে দিয়ে ফাঁসি কাঠে চড়তে যাচ্ছে। আমি বসে বসে দেখছি। অনাগত দিনটা কল্পনা করে ছটফট করছি। 'না! এ হতে দেওয়া হবে না!' দ্বিতীয়টা হল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে সিটুর সম্মেলনে জ্যোতিবাবু বললেন— "আই এন টি ইউ সি-র অনুমতি ছাড়া কোথাও কোন আন্দোলন নয়!" বাইরে একি চলছে। এরা কী ভেবেছে? জরুরী অবস্থাকে এমন অপরাজেয় দৈত্যদানো ভাবছে কেন? আঘাত কর—এই দৈত্যকে, ওদের সব থেকে শক্ত জায়গাতেই ওদের আঘাত করতে হবে। 'কেন্দ্রীয় কাজকে ত্বরান্বিত করুন!' 'প্রতিটি পরিবর্তনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখুন।'

'বিপক্ষের জেনারেলের রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা করুন!'

৪

এরপর? এর পরের ঘটনা খুবই সহজ। রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ, এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মতাদর্শগতভাবে দৃঢ় ৪৫ জন যুবক যদি কিছু করব ভাবে কে তাদের ঠেকায়? সে সমস্ত রুদ্ধশ্বাস প্রস্তুতির কথা আমি বলতে পারছি না। কারণ আমি আজও বন্দী। ঘটনার কুশীলবরা আজও জীবিত। সরকার আজও প্রতিবাদী লোকদের নিকেশ করে দেবার রাজনীতিতেই বিশ্বাসী। তাঁরা আলেকজাণ্ডারের মত সিংহহৃদয় নন যে পরাজিত পুরুদের শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের স্ব-রাজ্যে (মানে সংসারে) প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। শুধু বলছি, '৭৬ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ফেব্রুয়ারি পুলিস এবং জেল কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করল নকশালরা যে-সমস্ত নম্বরে থাকত সেগুলোতে কে বা কারা কখন বিশাল বিশাল গর্ত করে গেছে। হ্যাঁ, ওগুলো নকশালরাই করেছিল—তাদের অস্ত্রপাতি, বইপত্তর লুকিয়ে রাখার জন্য। কী করে করল? সেটা পুলিসের কাছে আজও রহস্য। এক একটা নম্বরে একশ-দেড়শ লোকের মধ্যে ৮-১০ জন নকশাল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এই কংক্রিটের মাঝে খুঁড়ে এত বড় বড় গর্ত বানালই বা কী করে? বানানো যদিও-বা যায়, দিনের পর দিন সেগুলো সার্চ পার্টির নজর এড়িয়ে থাকলই বা কী করে? মনে রাখতে হবে তখন রাত-বিরেতে হঠাৎ হঠাৎ জেল রেইড হত (আজকের মত সার্চ নয়, রীতিমত রেইড!)।

এইসব প্রশ্ন উত্তরহীনই থাক। ভাড়াটে বুদ্ধি আর বিপ্লবী বুদ্ধির ফারাক এখানেই। ভাড়াটে বুদ্ধি দিয়ে তারা কী করে বুঝবে ব্যাপারটা মোটেই ব্যাপকের চোখ এড়িয়ে হয়নি, ব্যাপকের সমর্থনে এবং মুষ্টিমেয় লোকের চোখ এড়িয়েই

হয়েছে। যে-কোন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডই ব্যাপক মানুষের উৎসব। সুতরাং যাদের উৎসব তাদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে উৎসব-আয়োজন করলে সেটা তো মাঠে মারা যাবেই। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ষড়যন্ত্রের স্থান খুবই নিচের দিকে। দু-চারজন থেকে গোপন রাখতে হয়।

যাই হোক, পরিকল্পনা আসতে শুরু করেছে। ৪৫টা পরিকল্পনাই জমা পড়ল। পরিকল্পনার প্রথম কাজ, শত্রুর দুর্বল জায়গা কোনটা এবং কেন। সবগুলো থেকেই যা বেরুল তাকে সূত্রায়ন করলে দাঁড়ায়, "শত্রু যেখান থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করে না সেটাই তার দুর্বলতম স্পট!" জেলের মধ্যে সেটা কোনটা? গেট! সুতরাং চালাও তদন্ত। গেট মানে দুটো বাধা। ভেতরের দিকের একটা গেট, যেটা পার হয়ে বাইরের সঙ্গে বিভাজনকারী লৌহকপাটের কাছে পৌঁছানো যাবে। তার পর লৌহকপাট। সুতরাং গেটের সামনের শত্রুশক্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হবে। "পুবে আক্রমণের নাম করে পশ্চিমে আক্রমণ কর।"

গোটা জেল হঠাৎ একদিন গরম হয়ে গেল। আমাদের কমরেডরাও ছিঃ ছিঃ করতে শুরু করল। বিরোধীরা গালাগালি করছে, "মরুক! শালারা মরুক!" কী ব্যাপার? না, গজপাল আর কালু হালদার বলে দুজন চ্যাংড়া নকশাল নিউ-ওয়ার্ডের পেছন দিক দিয়ে গর্ত খুঁড়ে দেওয়াল টপকে পালাবার ধান্দা করছিল, ধরা পড়ে গেছে, ওদের পিটিয়ে-পাটিয়ে সেলে ঢুকিয়ে দিল। ক্ষুব্ধ বুকে আমরা দেখলাম, সহ্য করলাম—দাঁতে দাঁত চেপে। পরের দিন কাগজগুলোতে বড় বড় করে বেরুল—'সিকিউরিটি অফিসারের তৎপরতায় নকশালপন্থীদের পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ।' অন্তরীক্ষে বসে অন্তর্যামী হাসলেন। আর এত মার খেয়েও কালু-গজপাল হাসল। সুতরাং গেটের সামনে থেকে একটা সি আর পি ক্যাম্প হটে গিয়ে নিউ-ওয়ার্ডের পেছন দিকের দেওয়াল পাহারার কাজে লেগে গেল। গুড! পার্টি কমিটির সার্কুলার বেরুল, 'বিপ্লবী যুদ্ধের মূল রণকৌশলগত নীতিই হল শত্রুবাহিনীর মুভ-মেণ্ট আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা যেমনটা চাইব ওরা সেইরকমভাবে চলাফেরা করবে। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাবেন না।' কমরেডরা শান্ত হলেন।

এই প্রসঙ্গে কালুর কথা একটু আলাদাভাবে বলা উচিত। সে নেই। আমাদের মুক্ত করতে গেটের বাইরে সে জীবন দিয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারির সত্যিকারের নায়ক সেই। গরিব-কৃষক ঘরের ছেলে। মেদিনীপুরে বাড়ি। চাকরি করতে কলকাতাতে আসে। প্রথমে একটা মিষ্টির দোকানে বয়ের কাজ করে। পরে টেলিফোন ভবনের ক্যান্টিন-বয় হয়। ওখানেই কমরেডদের সংস্পর্শে আসে। একটা মিছিল থেকে গ্রেপ্তার হয়ে এসে জেলের নরক, জুভেনাইল ফাইলে থাকত। ২৪

ফেব্রুয়ারি আমরা আরও একজনকে হারাই, সে হল স্বদেশ ঘোষ। সামান্য তদন্তের ভুলে, দুটো অমূল্য প্রাণ যদি না হারাতাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি সত্যিই অনবদ্য হত। লম্বা, সুঠাম স্বাস্থ্যের স্বদেশ। আড়িয়াদহের ছেলে। কৈশোরেই জেলে ঢোকে। জেলেই যৌবন-প্রাপ্ত হয়। যুবক স্বদেশকে যৌবনের শুরুতেই ঘাতকের সীসে শেষ করে দিল।

অনুশোচনা নেই আবার লাভের তুলনায় ক্ষতিটা কিছুই নয়। কিংবা ওদেরও দুজন মরেছে অতএব সমান সমান হয়ে গেছে ভেবে আত্মতৃপ্তি পাবারও কোন কারণ নেই। স্বদেশ, কালু সমান সমান ওদের দুটো হতে পারে না। দুটো কেন দুশও নয়, দু-হাজারও নয়। মানুষ কোনদিন মনুষ্যেতর জীবদের ইক্স-ইকোয়াল হয় না। "আবেগকে নিয়ন্ত্রণে আনো আজিজুল হক! আজ তুমি পঙ্গু ভুলে যেও না।" হ্যাঁ, তাই করছি। প্রশ্ন হল গেটের অ্যাপ্রোচ কী করে হবে? কেন ডিভিশনবাবুরা তো যখন তখন গেটে যেতে পারে। তাদের ল্যাজ ধরে! ভেতরের গেটে খট-খট করলেই ভেতর দিককার গেট খুলে যাবে। তখন গেট-সেপাইকে 'ওভার পাওয়ারড' করে চাবি কেড়ে নেওয়া হবে। অর্থাৎ লৌহকপাট পর্যন্ত যাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন, অফিস এবং ডি-ও টেবিল অর্থাৎ সাইরেন অ্যালার্মকে ম্যানুভার করা? ওটা কি আর এমন কাজ? ভেতরের গেট খোলা পেলে বিভিন্ন নম্বর থেকে সকলে আধ মিনিটের মধ্যে ছুটে গেটে ঢুকে যাবে। একজন কমাণ্ড দিয়ে ডি-ওকে দাঁড় করিয়ে দেবে। দুজন সাইরেন এবং টেলিফোনের তার কেটে দেবে।

কিন্তু গেটের সামনে যে একটা ক্যাম্প আছে তার কী হবে?

গেটে হট্টগোল হচ্ছে দেখলে ওরা পজিশন নিয়ে নেবে। ছোঃ, ওটা আবার সমস্যা নাকি? ওদের আমরা নাচাব। ১-২২/২৩-৪৪-এর কোণ বরাবর যে গুমটিটা আছে ওখানেও একজন রাইফেলধারী, তার কী হবে? বেটা রাইফেল নিয়ে হুমড়ি খাবে। আসলে ওরা কাগুজে বাঘ তো? ঠিক হল গুমটিতে একজন পেটো ছুঁড়বে (সেল চত্বর থেকে) অন্য একজন ৬নং ঘর থেকে সোজাসুজি গোটা দুই "সেল-বোমা" পাঁচিল টপকে দেবে। সেগুলো অবধারিতভাবে অস্ত্র গুদাম ডিঙিয়ে সি আর পি ক্যাম্পের সামনে পড়বে। এতে দুটো কাজ হবে, ম্যাগাজিন-বক্সের দিকে কেউ আসতে সাহস পাবে না। সেল ফাটার আওয়াজ শুনেই যে-কমরেড আগে গেটে পৌঁছেছেন তিনি লৌহফটকের ভেতর থেকে হাত গলিয়ে গোটা দুই পেটো এবং ককটেল ছুঁড়বেন। সি আর পি ভাববে ওরা ভেতর এবং বার দু-দিক থেকেই আক্রান্ত। সুতরাং সবগুলো দৌড়ে গিয়ে অফিসের লাগোয়া বাইরের দিকে কোণাকুণি যে-ইন্টারভিউ রুমটা আছে সেখানে আশ্রয় নেবে। অর্থাৎ সামনের

রাস্তা মুক্ত। ঐ ঘর থেকে রাইফেল চালালেও আমাদের পথ তারা রাইফেলে তাক করতে পারছে না। কিন্তু মূল বি এস এফ ক্যাম্প ব্রিজের মুখে যেটা, সেখান থেকেও ফোর্স এসে যেতে পারে তো? কিংবা আলিপুর থানা থেকেও আসতে পারে! না, সে ভয় নেই। দুটো "ডিলে-বি" বাক্স একটা ব্রিজের গোড়ায় অন্যটা বেলভেডিয়ার অ্যাপ্রোচে রেখে চলে এলেই হবে। "ডিলে-বি" হল সলতে বোমা। একটা বাক্সে গোটা দশেক (সর্বোচ্চ) থাকে। সলতেগুলো বাক্সের ওপরের একটা ছিদ্র দিয়ে বার করে একসঙ্গে বাঁধা থাকে। ওখানটায় আগুন ধরিয়ে বাক্সটা রেখে চলে এলে, প্রথম বোমটা ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটা খুলে সব বোমাগুলো ছিটকে যায়। সলতেগুলো সময় অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করা থাকে। অর্থাৎ ৫ সেকেণ্ড, ৭ সেকেণ্ড, ১০ সেকেণ্ড পর পর সেগুলো ফাটতে থাকবে। ব্যাপারটা খুবই সহজ। ঘড়ি ধরে সলতের সাইজগুলো নির্ধারণ করা হয় আর কি! পর পর রাস্তার ওপর বোমা ফাটছে দেখলে শত্রু কোন সময়েই ভাবতে পারবে না ওখানে কেউ নেই। ওরা ভাবতে বাধ্য ওখানে বোমা-সজ্জিত একটা দল আছে। সুতরাং সাময়িকভাবে হল্ট করবেই। সেটাই যথেষ্ট সময়! কালু এবং স্বদেশকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাক্স দুটো দু-জায়গায় বসিয়ে দৌড়ে ফিরে এসে মূল-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। ওদের ফিরে আসতে একটু দেরি হওয়ার জন্যই এক সিপাই রাইফেল-পজিশন পেয়ে যায়। এবং অঘটনটাও ঘটে যায়।

সবই তো হল, কিন্তু লৌহকপাট খুলবে কী করে? গেট খুলবে, স্বদেশ-কালু ছুটবে, বাক্স রেখে আসবে তবেই না?

যে-চাবির রিঙটা দিয়ে চাবি খোলা হয়, তাতে অন্ততপক্ষে গোটা চল্লিশ বিভিন্ন ফলস চাবির সঙ্গে গেটের আসল চাবিটা থাকে। সেই চাবি কোনটা? 'নজর রাখ'।

কোর্টে যাতায়াতের পথে প্রত্যেকেই নজর রাখতে লাগলেন, কোন্ সে-চাবি, যেটা আমাদের মুক্তির দরজায় তালা মেরে রেখেছে? চাবির অন্বেষণে লেগে গেল পঞ্চাশ জোড়া চোখ। বোঝা গেল গেটের দিক মুখ করে চাবির তোড়াটা যদি একহাতে ঝোলানো হয় তাহলে ডানদিকের পঞ্চম চাবিটাই সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু —যার জন্যই এত হেনস্তা! বাইরে না-হয় বেরুলাম, বেরুলে তো চ্যালেঞ্জ গেটের লন, সেটাও পার হলাম না-হয়। তারপর যাব কোন দিক দিয়ে। গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে না। বাইরের অবস্থা ধু-ধু। ভাটপাড়া ব্রিজ দিয়ে যাওয়া যাবে না। ওদিকে ব্রিজের ও-প্রান্তের মুখেই বি এস এফ-এর বেসক্যাম্প। বেলভেডিয়ার মিলিটারি আর আমলা কোয়ার্টার অঞ্চল, আলিপুর থানা ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে,

সুতরাং ওটাও পরিত্যাজ্য। সুতরাং চ্যালেঞ্জ গেট পার হয়ে একটু ডানদিকে ডেপুটি সুপারের কোয়ার্টারের মাঠ। মাঠ পেরিয়ে আদিগঙ্গা। আদিগঙ্গার পুণ্য করা জলে পাপ ধুয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল। পরিকল্পনা প্রস্তুত। বাহিনীও তৈরি, তবুও দেরি কেন? আমরা তো পালাব। বাকি যাঁরা থাকবেন, নাই-বা করলেন আমাদের রাজনীতি, জেলে পাগলি হলে তাঁরাও তো বাঁচবেন না। তাঁদের জানানোটা নৈতিক কর্তব্য কিনা? নানান তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হল তাঁদের কায়দা করে জানাতে হবে। অর্থাৎ নিজেদের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন না করে তাঁদের মতামত জানতে হবে। বৃদ্ধ অসুস্থ ধীরেনদাকে অবশ্য সরাসরিই বলা যায়। কিন্তু সাতখাতার ওই বারোমেশাল দঙ্গলকে বলব কী করে? যাই হোক বলতে তো হবেই। ধীরেন চক্রবর্তী, অগ্নিযুগে বিপ্লবে দীক্ষা নেন, তারপর সিলেট থেকে বহিষ্কার। ফরওয়ার্ড কাগজের অন্যতম প্রাণপুরুষ। তারপর 'স্বাধীনতায়' যোগ দেন। 'দেশ-হিতৈষী' যখন প্রমোদবাবুরা জোর করে দখল করতে যান, সেই সময় আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে চরম লাঞ্ছিত হন। বেরিয়ে এসে সরোজদা, সুশীতলদার সঙ্গে মিলে 'দেশব্রতী' কাগজ বের করেন। দেশব্রতী অফিস থেকেই গ্রেপ্তার হয়ে মেদিনীপুর চালান যান। ওখান থেকে পঞ্চম ট্রাইব্যুনালের কেস খেয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে আসেন। এই দেশেই সম্ভব এ-হেন লোক না-খেতে পেয়ে গত বৎসর দমদমের লালগড় কলোনির এক প্রায়-বস্তি ঘরে মারা গেলেন। ধীরেনদা সব শুনে লাফিয়ে উঠলেন, (টি-বি রোগে আক্রান্ত হয়ে তখন তিনি জেল হাসপাতালে)—"খুব ভাল কথা! আমার কথা ভাববেন না। আমি তো আজ হোক কাল হোক মরবই। বেরুন, আপনারা বেরুন। দেশ আপনাদের চাইছে। এমারজেন্সির তলপেটে একটা জব্বর লাথি কষানো হবে!" উত্তেজিত বৃদ্ধকে চোখের জল দিয়ে শান্ত করতে হল।

সাতখাতার কাকে বলব? অসিতকে? না, বলা যাবে না, যদিও আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন অসিত। তবুও ভরসা পেলাম না। ওর এখনকার নেতা কে-এস জেলে জেলে চারুপন্থীদের পেটাচ্ছে। ভাইজাগের কমরেডরা খবর পাঠিয়েছেন কে-এস কীরকমভাবে ওদের পিটুনি খাইয়েছে। ও যদি কে-এস-কে বলে দেয়, সর্বনাশ! সাধনদা? উঁহু, ওঁর নিজের ভাষায়, "আমি আন-নার্ভড হয়ে গেছি।" আন-নার্ভড লোক নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যা-খুশি করে ফেলতে পারে। তাহলে ডেবরা-খ্যাত এক নেতাই বাকি থাকে। আর কাউকে তো চিনি না। হ্যাঁ, ওকেই বলা যায়! "যাই হোক ও জনগণের নেতা! সন অব সি সয়েল! ও যদি কিছু বুঝতেও পারে গাবাবে না! চেপে যাবে।" ওকেই একদিন বললাম, "এই যে

শোন, আমরা যদি দেওয়াল উড়িয়ে দিই তোমরা কী করবে ?" ও বলল, "ওড়াও তো !" আবার বললাম, "যদি গেট খুলে দিই।" ওর একই উত্তর, "খোল তো !" তখন সিরিয়াসলি বললাম, "সত্যি আমরা পালাচ্ছি, তোমরা যাবে তো চল। বাইরে বেরিয়ে সব প্রশ্নের ফয়সালা কর।" এবার ও একটু গম্ভীর হল, "কাল জানাব।" পরের দিন ও জানাল (হাসপাতাল ছিল আমাদের মিটিং প্লেস !), "ওদের কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেছে, তাঁরা নাকচ করেছেন, এটা চরম হঠকারিতা এবং সন্ত্রাসবাদী কাজ !" রেগে গিয়ে বললাম, "তা বাপু, তোমরাই তো তখন পি-সি-তে ছিলে, সার্কুলারটা সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়ার সময় এই বোধটা হয়নি কেন ? জেলে ঢুকেই সব মার্কসবাদী হয়ে যাচ্ছ নাকি ?" ও মাথা নিচু করে বলল, "আজিজুল, তুমি বুঝছ না, এখন বাইরে বেরিয়ে তিনদিনও টিকতে পারবে না।" হেসে বললাম, "সে আমিও জানি, আমার প্রশ্নটা অন্যখানে, জরুরী অবস্থার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই, জরুরী অবস্থা এমন কোনও দৈত্য-দানো নয় যে, যেটা আমরা ভাঙতে পারি না। এই দমবন্ধ অবস্থায় এটা হবে এক ঝলক মুক্ত বাতাস !" ওর ভাসা ভাসা চোখ চকচক করে উঠল। সামলে নিয়ে বলল, "উইশ ইউ সাকসেস !" হাত-মিলিয়ে চলে এলাম। দায়িত্ব শেষ !

জেল কর্তৃপক্ষ দেখল নকশালরা হঠাৎ সকালে বিকেলে দৌড় প্র্যাকটিস করছে। কাঁচা ডাবকে ডিসকাস বানিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ডিসকাস থ্রো করছে। ওরা দেখে আর হাসাহাসি করে। ভাবে নকশালদের হাজার পাগলামোর মধ্যে এটা নতুন যোগ হল।

ছাত্র হিসাবে আমি বরাবরই খুব মনোযোগী এবং ভাল ছাত্র। গুরুদের কাছ থেকে যেটা শিখি সেটাই যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করে গুরুদের কাৎ করে থাকি। আমার লেখার ঢঙ দেখে বুঝতে পারছেন না, কার মত কথা বলছি, সেই 'আমি এবং ওরা' মনে পড়ছে না ?

উৎপলদার (দত্ত) কাছ থেকে শিখেছিলাম, নাটকের সব পার্ট সবাইকে মুখস্থ করাবে। এতে দুটো সুবিধা, প্রত্যেকেই সামগ্রিকভাবে নাটকটা বুঝবে। তাতে তার নিজের ভূমিকা কোথায়, অ্যাকশন কী সেটা বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় সুবিধা, যদি কোন কুশীলব হঠাৎ বিগড়ে যান, যে-কেউ সেই ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে পারে। সুতরাং পঞ্চাশজনকেই পুরো পরিকল্পনাটা মুখস্থ করানো হল। কার কী ভূমিকা জানিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের কমরেডরা যে সমস্ত নম্বরে বা সেল ঘরে থাকতেন এখন সেগুলোর অবস্থা ভয়-পোয়াতির মত। মেঝের আর দেওয়ালের গর্ভে কী না আছে! পিন-পিয়াও থেকে পাইপগান! ই-ডি-ডির অপেক্ষা (এক্সপেক্টেড ডেট অব ডেলিভারি)। পাঁজি পত্তর দেখে দিনক্ষণ ঠিক হল। আক্ষরিক অর্থেই পাঁজি দেখে। আমাদের হঠাৎ পাঁজি পড়তে দেখে চীন ফেরত লোকজনরা বলতে শুরু করলেন 'তাই হয়! সন্ত্রাসবাদের শেষ পরিণতি অধ্যাত্মবাদ।' আমরা খুঁজে বার করলাম কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে বেলা তিনটের সময় ভাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে—অর্থাৎ আদিগঙ্গার জল তখন হাঁটুর নিচে। একটা কথা বার বার বলে রাখছি—সমস্ত প্রস্তুতির শতকরা নব্বই ভাগই কিন্তু আমরা নিজেরা করেছি। বাইরে তখন প্রায় শূন্য অবস্থা! প্রায় কোন সাহায্যই নেই। চব্বিশে ফেব্রুয়ারি হল সেই শুভদিন। 'কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, মঙ্গলবার বেলা তিন ঘটিকায় শুভ মহরৎ হইবে ঢং ঢং ঢং!' কাকতালীয়-ভাবে সে দিনটাতেই যুবরাজের কলকাতা দর্শন! ব্যস্ সোনায় সোহাগা! সব ব্যাটা সঞ্জয়কে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। ফোর্স খবর পেয়ে 'মবিলাইজ' হতে হতে পগার পার—মানে আদিগঙ্গা পার!

কে জানত ছাই সত্যি সত্যিই পেয়ালা এবং ঠোঁটের মধ্যেও দূরত্ব থাকে। এবং দূরত্বটা মাঝে মাঝে মৃত্যুর কারণও হতে পারে। ২৩ তারিখ হঠাৎ পেঁচো (সি এস ও পাঁচুগোপাল) তার দলবল নিয়ে এসে হাজির। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল "লিকেজ?" মাতাল মানুষ তো। সেলে ঢুকতেই বিনয়ে গলে গেলাম "শুনুন মিঃ মুখার্জি, আমরা মানে আমাদের কমরেডরা, যাঁরা বিভিন্ন ফাইলে আছেন, তাঁরা একটু খাওয়া দাওয়া করতে চাই?" শুনেই উনি বিগলিত: "হঠাৎ ভোগবাদ? আপনারা খান নাকি?" আরও গলে গিয়ে বললাম "না, মানে বুঝলেন তো চার-পাশে এত খাওয়া দাওয়া দেখে ওদেরও একটু খেতে শখ গেছে এই আর কি?" আসলে আমাকে এইরকম ভাবে কথা বলতে দেখেই উনি নার্ভাস! 'আজিজুল হক এত বিনয়ী হয়ে গেল কবে? আবার খাবার আর্জি!' নার্ভাস হয়ে গিয়ে জেলরকে বললেন—"ব্যবস্থা করে দিন না!" আমাকে বললেন—"তবে সকলকে তো এক জায়গায় আসতে দিতে পারি না।"

"না, না, তা কেন? যে-যার নম্বরেই থাকবে, আমার এখান থেকে রান্না করে ফাইলে ফাইলে পৌঁছে দেব। আপনাদের দিকটাও দেখতে হবে তো?" আমার কথা শুনে উনি জেলরকে নির্দেশ দিলেন। সার্চ আর হ'ল না। যাবার সময় বিজয়ীর হাসি হেসে উপদেশ 'থাক আপনাদের মতিগতি ফিরুক! ভগবান করুন!

আপনারা ভাল হোন।' বললাম—"জেলবাবুকে বলে যান যেন রেলিঙের সিপাই খাবার-দাবার ঘাঁটাঘাঁটি না করে।"

"না না, সে কি! জেলের ভিতরে রান্না হবে। তার আবার চেকিং কী।" নিশীথদা বললেন "গুড লাক।"

২৪ তারিখ সকাল থেকেই সকলে জামা-কাপড় পরে খোশ মেজাজে কোলাকুলি করছে। অকারণে হাসছে। এ ওকে ঠেলছে, ও তার পেছনে লাগছে। বাতাসে ঘি আর গরম মশলার গন্ধ। কি? না, নকশালরা ফিষ্টি করছে। তৈরি হল চিঁড়ের পোলাও, কষা মাংস, ডিমের মামলেট, মাছ ভাজা, সুজির পায়েস। ডিভিশন বাবুদের কাছ থেকে তিনটে পাত্র আনা হয়েছে। ডিউটি সেপাইরাও আনন্দের ভাগীদার হয়ে গল্প করছে। তাই লক্ষ্য করল না দু-জন কিন্তু অনুপস্থিত, তারা সেলগুলোকে গন্ধ-যন্ত্রণা মুক্ত করছে। মাঝে মাঝে এক একজন একটা বিশেষ ঘরে ঢুকছে, অস্ত্রপাতি টাকা এবং শেষ নির্দেশ বুঝে নিচ্ছে। তিনটে নম্বরের জন্য হাঁড়িতে পোলাও। (তার নিচে কী আছে অনুমান করে নিন)। থালাতে এবং বাটিতে মাংস, মাছ, ডিম, পায়েস সাজানো হল। যে মেট হাঁড়িগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে জানতেও পারল না বোম, ছুরি, লাস্ট মিনিট নির্দেশ বয়ে নিয়ে সে যাচ্ছে। শুধু তাকে বলে দেওয়া হল—রেলিঙের সেপাইবাবুকে এই একটা একটা থালা ধরিয়ে দিও, তিনটে রেলিঙ গেটের জন্য তিনটে থালা করা হয়েছে। প্রস্তুতি পর্ব শেষ।

২

বেলা দুটো—সকলে চঞ্চল, সেল গেট থেকে উঁকি মেরে দু-পাশটা দেখে নিলাম। এখনও রেলিঙে তালা। আড়াইটা। "ঐ তো দড়ি হাজত থেকে এক একজন করে এসে এদিক ওদিক গল্প করছে। রেলিঙ গেট খুলছে। একজন মেন গেটের দিকে চলে গেল। ২-৫৮ 'ঐ যে ঐ তো ছাতা নাড়ছে।' 'নকশাল বাড়ি লাল সেলাম!' জেল হতভম্ব! ৫০ জন জেল গেটে। 'গিদুম' 'গিদুম' 'গি-দু-ম', সি আর পি-রা দৌড়াচ্ছে, অফিস স্টাফ সকলে টেবিলের তলায়। ছবির মত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। "এই যাঃ চাবি খুলছে না" "সে কি চেষ্টা কর।" "না, ব্যর্থ?" "কোন চাবিটাই লাগছে না," "সর্বনাশ" পঞ্চাশটা তাজা প্রাণ এখুনিই ঝরে যাবে। ভোম্বল বাটখারা তুলে তালাটার গায়ে দুমদুম পেটাল, কিছুই হল না। ৩০ সেকেণ্ডের অ্যাকশন—এক মিনিট, দু মিনিট! সর্বনাশ! "তৈরি হও সব মরার জন্য।" কে একজন ঘড়িটা লক্ষ্য করে ককটেল ছুঁড়ল। আগুন ছিটকে এসে নিমাই-সিপাইয়ের গায়ে পড়ল।

"ইস্! নার্ভাস হয়ে শুধু শুধু একটা প্রাণ নিয়ে নিলি?" ভোম্বল সব থেকে বড় পেটোটা নিয়ে তালাতে মারতে গেল "এ কি করছিস থাম, থাম, ওই পেটো ফাটলে কেউ বাঁচবে না" সে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হল। যার হাতে যা আছে সে সেগুলোই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যবহার করতে শুরু করেছে। 'এই রে! এগুলো এবার না পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।' সামলাবার চেষ্টা করছি। নিশীথদা হঠাৎ 'গামছা' বার করল। 'গামছা' মানে একটা পাকা লোহার রড্, ক্রমশ সরু থেকে মোটা হয়েছে। 'গামছাটা'র সরু দিকটা মেন গেটের ওপরের তালাটার আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই 'কড়াং'। সকলে উল্লাসে ফেটে পড়ল। এই হচ্ছে নিশীথদা! অঘটনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। দ্বিতীয় তালাটাও খুলে গেল। ৩-টে ৪ মিঃ হৈ-হৈ করে নির্ধারিত রুটে সকলে ছুটলেন। আঃ মুক্তি!

কিন্তু স্বদেশ কালু? ওদের বাক্সগুলো বসিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। ডেপুটি সুপারের ঘর থেকে সেই ফাঁকে জানালা দিয়ে একজন রাইফেল তাক করল। জানালাটার পাশ দিয়েই রাস্তা। স্বদেশ পড়ল। দ্বিতীয় গুলিতে কালু। তৃতীয়টা আমার বাঁ-হাত ছুঁল। একটা ধাক্কা আর গরম শিক ঢুকিয়ে দেওয়ার অনুভূতি। হোঁচট খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালাম। স্বদেশ চিৎকার করছে…"চলে যাও! পালাও! আমি আর ফিরছি না!" ওদের ফেলে রেখে নদীতে নামলাম। ভাবলাম কি হবে ওপারে গিয়ে? কে যেন চিৎকার করল, "পালাও! বলছি! এটাই হবে আমার প্রতি ভালবাসা!" হাঁটতে হাঁটতে নদী পার হলাম।

কই মুক্তির আনন্দ পাচ্ছি না তো, মনে হল কে যেন কলজেটা ছিঁড়ে বার করে নিয়েছে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস বেতার লাল সতর্কতা ঘোষণা করছে। নিজের কানে শুনতে শুনতে যাচ্ছি—"নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক অ্যাণ্ড ফর্টি ফাইভ এসকেপ্‌ড্ ফ্রম প্রেসিডেন্সি জেল! হ্যালো! হ্যালো!" আস্তে করে ভ্যানটার পাশ কাটিয়ে গেলাম! "কোথায় যাবে তুমি পথিক?" "—ঐ যে আলোর দেশে।" "আমাকে নিয়ে যাবে না?" না, কারণ তুমি আমার অতীত, তাকে ফেলে এসেছি গঙ্গার ওপারে!…"

মার্কসবাদের ইজারাদাররা কী বলেন? সেদিন কি আমরা খুব বেশি সন্ত্রাসবাদ করেছিলাম? নাকি, সন্ত্রাসের তলপেটে লাথিই কষিয়েছিলাম? ভবিষ্যতের কাছে এ প্রশ্নের জবাব চাইতেই পারি আমি। চাইছিও তাই। তারপর?

উপসংহার

এক যে ছিল রাজা। এ যুগের রাজা। রাজা আমেরিকা ঘুরে এসে সিদ্ধান্ত নিল ; আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বানাবে। হুজুরের ইচ্ছায় বাড়ি হল। গৃহ প্রবেশও ঘটল ধুমধাম করে। সকলকে নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে খুশিতে ডগমগ রাজা গট গট করে বাড়ির ছাদে উঠে গেলেন। কে জানত ছাই রাজার ছিল উচ্চতা আতঙ্ক—হাইট ফোবিয়া। নিচের দিকে তাকিয়েই রাজার মাথা গেল ঘুরে। প্রথমে চিৎকার করে উঠল আনন্দে—"আমি কত বড় ! তোরা সব পিঁপড়ের মত ছোট ! তোদের দলে মুচড়ে আমি এগিয়ে যাব ! কিন্তু যাবে কোথায় ? এটা ভাবতে গিয়েই রাজা আর্তনাদ করে উঠল—আমি নামব কী করে ? আমাকে নামাও ? মন্ত্রী-সান্ত্রী পাত্র-মিত্র-অমাত্য-চামচা-হাতা-খুন্তি সকলে মাইক লাগিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে—"মহারাজ যে পথে উঠছেন সেই পথেই নামুন !" রাজার কানে সে আওয়াজ পৌঁছায় না। রাজা শুধুই চিৎকার করে "আমাকে নামাও—"

দিন যায় সপ্তাহ যায় রাজা চিৎকার করে চলেছে। মন্ত্রীদের কপালে ভাঁজ পড়ল। কত মন্ত্রণা-যন্ত্রণা ! শেষে তারা ঠিক করল "দেশে দেশে ঢ্যাড়া দাও। যে রাজাকে নামাতে পারবে তাকেই রাজকন্যে আর অর্ধেক রাজত্ব দেওয়া হবে।"

দেশের সীমান্তে বাস করত এক কায়েত। রাজা একবার তাকে খুব লাঞ্ছনা করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। সে ভাবল "এই তো সময় ! ব্যাটা রাজা তো আর নামতে পারবে না। শালাকে আচ্ছা করে গালাগালি করে আসা যাক।" কায়েত রাজপ্রাসাদে এসে বলল—"আমি রাজাকে নামিয়ে আনব !" সবাই তাকে দুর দূর করতে লাগল। কায়েতও নাছোড়বান্দা ! বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলল "যা, ব্যাটা চেষ্টা করে দেখ। যদি নামাতে না পারিস তোকে আবার গারদে পুরব !"

অনুমতি পেয়ে মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে কায়েত গট গট করে ওপরে উঠে গেল। ছাদের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে দেখে রাজা 'আকাশ পানে চেয়ে' বিড় বিড় করছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই সে চিৎকার করল—"এই শালা রাজা, সেবার তো খুব কেলিয়ে ছিলি ! এবার যাবি কোথা ? এবার এখানে যদি ধরে তোকে কেলাই, কে ঠেকাবে ?"

কায়েতের খিস্তি শুনেই রাজা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে লাল-লাল চোখ করে তাকে দেখল। রাজাকে তাকাতে দেখেই কায়েত আবার হুঙ্কার দিল—"আরে ! শালো দেখছিস কি ?···" হাজার হোক রাজরাজড়ার রক্ত বলে কথা ! কায়েতকে কথা শেষ করতে না দিয়েই রাজা কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার

খুলে…'পাকড়াও শালে কো !' চিৎকার করে কায়েতকে তেড়ে গেল। কায়েতও প্রস্তুত ছিল। সে ছুটে একদমে সিঁড়ির শেষ মাথায়। সেখান থেকে আবার গালাগালি করল… ।

উঁচু অবস্থানটা এখন রাজার পেছনে পড়ে গেছে। সামনে পড়ে আছে শুধু মাটি-মুখী সিঁড়ি। যে মাটিতে ফুল ফোটে, শস্য হয়, সেই মাটি। যে মাটিতে শিশু হামা দেয়, মায়েরা বিছানা পাতে, সেই মাটি। আর আছে ঐ কায়েত। রাজা আবার ছুটে গেল। কায়েত ছোটে গালাগালি করতে করতে আর রাজা ছোটে তাকে ধরতে। এরকমভাবে ছুটতে, ছুটতে…ছুটতে…কায়েত পগার পার, অর্থাৎ রাজফটক পার। রাজা ছুঁল মাটি। পাত্র-মিত্র-অমাত্য, আমচা-চামচা-খামচা সকলে খুব খুশি। মহারাজার নামে জয়ধ্বনি উঠল। ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা উলুধ্বনি মহারাজের মাটি স্পর্শকে স্বাগত জানাল… ।

ওদিকে কায়েত ভাবে 'যাক শালা রাজাটাকে মাটিতে নামিয়েছি তো ! না হলে শালা পাগল হয়েই মরে যেত…' (পিতৃদেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বুঝহ্ রসিক জনে !

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের দিনলিপি

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে

এক বছর পর হাসপাতাল থেকে জেলে এলাম, হাসপাতাল থেকে একেবারে পাতালে। আমার 'ভাবনা-মত'ই ব্যাপারগুলো ঘটে চলেছে। এই যে শুধু যাওয়া আর আসা এর মধ্যে 'স্রোতে ভাসা' ছাড়া আমার কোনো ভূমিকাই ছিল না। থাকার কথাও নয়।

একটা পরিবর্তন অবশ্য লক্ষ্য করার মত। হাসপাতালে যাবার সময় সেটা চোখে পড়েছিল। এখন সে আশংকাটাই সত্যে পরিণত। আমি হঠাৎ 'স্যার' হয়ে গেছি! ওই শব্দটা শুনলেই আমার গা চিড়বিড় করে। এখন প্রত্যেককে ধরে ধরে বোঝাতে হচ্ছে 'আমি স্যার নই'—এটা খবরের কাগজের অবদান, ওঁরা এমনভাবে আমাকে তুলে ধরেছেন যেন 'আগামী দিনের ভাগ্যবিধাতা' আমিই। কিম্বা 'আমিই এ হতভাগা বাংলাকে বাঁচাতে এবং উদ্ধার করতে পারি।'

এটা ভালো জিনিসের খারাপ দিক। ফলে নিজের সাথে লড়াইটা আরও বেড়ে গেল। এ সংগ্রামে জিতে 'আমাকে' আজিজুল, দ্য ক্রিমিনালই' থাকতে হবে, ওটাই আমার গর্ব।

হাসপাতালে থাকাতে সব থেকে বড় লাভ যেটা হয়েছে—বাবাই-তিন্নীর সাথে ঘনিষ্ঠতা!

ওদের মাধ্যমে এ যুগের বাচ্চাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি। ওদের অশেষ ক্ষতি-সাধন করে চলেছি। আমার ক্ষতি যেটা হল, আমাকে সুস্থ করতে গিয়ে ঝুমুর নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

আসার দিনে ওকে যে-রকম আপ-সেট দেখলাম, এ রকমটা কোনোদিনও দেখি নি।

ধুনোর গন্ধ দিল বাবাই, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন, এর কোনো মানে হয় না, আজ হোক কাল হোক, বাবাকে তো জেলে যেতেই হবে!' বাবাইকে বুকে চেপে ধরে ও একেবারে ভেঙে পড়ল। বিশাল পুলিশবাহিনীর সামনে নিজেকে ঠিক রাখতে আমি তিন্নীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ও এসবের ধার ধারে না, নিজেকে জাহির করতেই ব্যস্ত। ওর বক্তব্য শোনাতেই ও ব্যস্ত। না শুনে উপায় আছে! মাথার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টানে আমার উচ্চতাটা কমিয়ে দিল—'যেতে দিলে তো!'

আর পারলাম না সামলাতে। 'হায় রে মূঢ় মেয়ে, অবোধ শিশু; তোর হৃদয়ের শক্তির চেয়ে, পশুশক্তি অনেক অনেক বড়। কি করে তাকে আটকাবি মা?'

একজন অফিসার এসে বললেন, 'স্যার, ইউ আর রেডি।'

অফিসারকে ঢুকতে দেখেই ঝুমুর নিজেকে সামলে নিল, চোখের জল মুছে হাসিমুখে বলল, "ডোণ্ট গেট আপসেট্, হু ইজ এ্যাফ্রেইড অব আজিজুল হক?"

অফিসারটাকে দেখিয়ে দিলাম।

নীচে পুলিশের বেতার গাড়ি অনবরত হেড-কোয়ার্টারের কাছে নির্দেশ নিয়ে চলেছে, তার যান্ত্রিক শব্দ। কেবিনে অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা, তিন্নীর দিকে তাকালাম এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে বাবাকে ছাড়তেই হবে। বাবা বস্তুটা স্বপ্নেই সম্ভব।

আমার বুক চিরে বেরিয়ে এল 'বাবরের প্রার্থনা,' বাবাই-তিন্নীকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "আমায় ধ্বংস করে দাও প্রভু! আমার সন্ততি স্বপ্নেই থাক।"

ঝুমুর হাসতে হাসতে বলল, "হোল না, হোল না,"

'আমার ধ্বংসে

ফোটে যেন হাজার রক্তের ফুল,

আমার ধ্বংসে

হোক না ওরা মুক্তি আকুল।'

ইদানিং ওর এই একটা স্বভাব হয়েছে আমার কবিতা দিয়েই আমাকে কাত করা। 'একটা নাম, কত ঈর্ষার, আতঙ্কের আর ভালোবাসার এটাও শেষ হয়ে যাবে।' ঝুমুরের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? ওর কথার রেশ টেনেই ওকে একটু টিজ্ করলাম—"সাথে সাথে তোমার পেছনে টিক টিক করার একজন কমে যাবে!" ও দমবার পাত্রী না কি! একজন নয়, এক এবং শেষ জন!

কেবিনের বাইরে পুলিশের ভিড় বাড়ছে। ভেতরে আমরা পাঁচজন, পাঁচজনের ভেতরেই বিচ্ছেদের এবং অনিশ্চয়তার জন্য অস্থিরতা বাড়ছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছি যাতে অন্যের কাছে ধরা না পড়ে যাই, সদা-দুরন্ত বাবাই-তিন্নীও কেমন চুপচাপ। ওরা এলে গোটা হাসপাতাল জানতে পারত, আজ ওরা বাক্‌রুদ্ধ, দুষ্টুমি ভুলে গেছে। ওদের মনে কি হচ্ছে জানতে বড় ইচ্ছা করছিল, ওদের সমস্ত হেনস্থার জন্য দায়ী কে?

ওরাও কি আমাকে দুষছে?

সবার আগে ভেঙে পড়ল তপন। ওকে বাগে আনতে এমন জোরে চেঁচালাম যে আমি নিজেই ধরা পড়ে গেলাম, এর মাঝেই সিস্টাররা এলেন তাঁদের মাল-পত্তর বুঝে নিতে। অদ্ভুত হৃদয়হীন যান্ত্রিক ব্যাপার! ওঁদের দোষ দিয়ে লাভ

নেই। যন্ত্রমানবী হিসাবেই ওঁরা কর্তব্য পালন করে থাকেন। থ্যাঙ্কলেস জবের এটাই জব্-স্যাটিসফেকসন্।

ঝুমুর বলল, "কি ভাবছ?"

হেসে বললাম, "আই মিস য়্যু এ্যাণ্ড মাই পিপল ব্যাড্‌লি!"

ও বলল, "ভ্যাখো তো, আমরা ভাবছি আবার দেখা হবার কথা, বিচ্ছেদের কথা, জেলের বন্দীরা খবর পেয়ে পেয়ে ওদিকে আনন্দ করছে তাদের আজিজুলদা ফিরে আসছে?"

বুঝলাম ও নিজেতে ফিরে আসছে। এটাই ঝুমুর; ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম না। কারণ সান্ত্বনা নামক বস্তুটার অস্তিত্বই নেই। যার ব্যথা তাকেই বইতে হয়।

উফ্, আমার মাথাটা যদি না থাকত, আমিই বোধ হয় পৃথিবীর সব থেকে সুখী ব্যক্তি হতে পারতাম। সত্যিকারের মানুষের মাথা বইবার ক্ষমতা পৃথিবীর কি আছে?

সোহনলাল হুইল-চেয়ার নিয়ে হাজির।

আগে পেছনে নানান পোশাকের এবং পদের বিশজন সশস্ত্র পুলিশ। কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখি সে এক কাণ্ডই বটে! আরও প্রায় জনা পঞ্চাশ পুলিশ গোটা করিডর দখল করে আছে, অন্যান্য রুগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা ভিড় করেছেন, পাশে বাবাই-তিন্নী আর তাদের মা চলেছে।

এই রুগীরা আমাকে দেখেন নি, আমার এদিকটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। তবুও তাদের সমস্যার কথা তাঁরা গোপনে লিখে জানাতেন, আমার দীর্ঘায়ু কামনা করতেন! মৃত্যুপথযাত্রী এক রুগীর ছোট চিরকুটটা ভুলি কি করে?

'আমার আয়ু নিয়ে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন!'

হ্যাঁ, তারপর তিনি বাঁচেন নি, কে এই খবর? কতই বা তাঁর বয়স ছিল? নিজেদের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে আজ যাঁরা আমাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত তাঁর সহমর্মী! চোখের পাতাটা ভারী হয়ে এল, একটু হেসে হাত তুললাম, কর্ডনের পুলিশের মাথার ওপর দিয়ে ৫০-৬০ জোড়া হাত উঠল, সিস্টার-এর চোখে জল!

কে যেন বলল, "হাসিটা ঠিক আছে?"

বউ এর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, "এমনও হাসি আছে দেখে কান্না মনে হয়…"না কি যেন সেই গানটা…

লিফট্ নীচে নামল, দুধারে প্রস্তুত প্রায় আধ ডজন গাড়ি। শুধু পুলিশের গাড়ি

নয় প্রাইভেট গাড়িতেও শাদা পোশাকের পুলিশ। সন্ধ্যা লাগছে। একজন সাংবাদিক এগিয়ে এলেন, পুলিশ বুঝে ওঠার আগেই ওর সাথে হাত মেলালাম।

জুনিয়র ডাক্তার, ট্রেনি মেয়ে, আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভিড় কেটে আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট প্রিজন-ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাবাই-তিন্নী তার আগেই গাড়িতে উঠে বসল, ওদের তীব্র প্রতিবাদের শেষ অস্ত্র, ওদের ধারণা হয়ত ওরা উঠলে গাড়ি অচল হয়ে যাবে। ঝুমুর নীচ থেকে ডাকল ওদের, তিন্নীর ভীষণ আপত্তি। "আমি বাবার সাথে যাব। বাবাকে পাউদার মাখিয়ে দেব, চুল আঁচলে দেব···"

আর শোনার ধৈর্য ছিল না, আর চাপ সহ্য করার শক্তি ছিল না। সার্জেণ্টটাকে বললাম, "এদের নামিয়ে দিন।"

দেখলাম তারও চোখের কোণটা ভিজে গেছে। শেষ বিদায়ে বাবাই আর ঝুমুর এক সাথে চিৎকার করে বলল, "সাবধানে থেকো!"

হেসে উত্তর দিলাম, "অসাবধানের স্থযোগ কোথায়? সাবধানে থাকতে হবে তোমাদেরই কারণ তোমরা অদৃশ্য শত্রু দিয়ে ঘেরা।" একজন ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরা শেষ বারের মত ফ্ল্যাশ মারতেই বললাম, "ফ্লাশ-গানের সাথে শট-গান রাখুন।"

গাড়ি স্টার্ট নিল। ইঞ্জিনের শব্দ।

"বাবাকে যেতে দিতে হবেই" "কেঁদো না মা"

ধাতব যন্ত্রে শব্দে এই কথাগুলোই কানে বাজতে লাগল, বাবাই-তিন্নীর মুখ, ঝুমুরের অস্থস্থ পাণ্ডুর মুখ, রক্তহীন ফোলা শরীর, অসংখ্য মানুষের মুখ ঝাপসা হয়ে গেল। ভাগ্যিস গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার।

চোখের জল শুকোতে না শুকোতেই গাড়ি এসে দাঁড়াল লৌহকপাটের সামনে। ঝুমুর, বাবাই ওরা এখনো হয়ত স্টেশনেই আছে।

জেলের চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখানে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভয়াবহ গুমোট আবহাওয়া, চাপা কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে এদের। আর বুকচেরা নিঃশ্বাসের সাথে ঘুমোতে যায় এরা। সমাজ-সংসার এদের ত্যাগ করেছে। এরা কিন্তু ভাবে তাদের কথা। স্নেহ-ভালোবাসা এখানকার অধিবাসীরা পায় নি, কিন্তু দিতে চায়। এরা কিছু দিতে চায়, কিছু করতে চায়, কিন্তু এদের 'হাত'কে করে দেওয়া হয়েছে অকেজো, মস্তিষ্ককে অলস, এটা করা হয়েছে কখনো বা বড় বড় বুলির আড়ালে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মার্কসবাদীদের পরিচালিত এ জেল দেখলে লেনিন কোনো সময়ই বলতেন না, 'এটা বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়!' উৎপল দত্তকেও দশ বার হোঁচট খেয়ে বলতে হত, 'ফুচিকের স্মৃতিধন্য কারাগার।'

জেল আমার জীবনে নতুন নয়। যাদের সঙ্গে জেল খেটেছি এখন তাদের হাতে জেল খাটছি। কিছুই কি পালটায় নি? পালটেছে বই কি? এই যেমন বাঁশের লাঠির জায়গায় বেতের ছড়ি! আগে অত্যাচারে মাথা ফাটত, হাত ভাঙত, লোকে দেখতে পেত, এখন লাং পাংকচার, আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। আগে বন্দীরা খেতে পেত। চুরি তখনও ছিল, কিন্তু সেটা হত গোপনে, বড় জোর দুটো ডিম কিম্বা হাফ কিলো তেল। এখন চুরিটা আইন-সিদ্ধ।

সেপাই-বাবুদের ইউনিয়নের কল্যাণে জেলের সুপার ঠুঁটো জগন্নাথ। ডাক্তার থরহরিকম্প। মন্ত্রীদের নামে 'জিন্দাবাদ' দিয়ে সকাল নটায় তেনারা ব্যাগ হাতে জেলে ঢোকেন, জেলের ভেতর থেকে বিনি পয়সায় বাজার করে বেরোন, 'তেনারা' মানে সকলে নন কিন্তু, খুবই সামান্য অংশ। চুরির বহর শুনলে বোফর্সের দালালরাও এদের গুরু বলে মেনে নেবেন।

যখন দমদম জেলে ছিলাম দেখেছি 'এক ইউনিয়নে'র একজন সভাপতি 'এঁড়ে' পুষে দৈনিক বিশ-কিলো দুধ বিক্রি করত। অসুস্থ বন্দীদের জন্য ওই জেলে প্রায় ৬০০ লিটার দুধ আসত। দুধের গাড়ি এলেই 'সভাপতিজী' কা 'পঁচাশ-বোতল' চলে যেত। সেই দুধে তাঁর চলত ঢালাও কারবার। সেই টাকাই জেসপের শ্রমিক-দের মাসে ১০ টাকা হার সুদে চক্রবৃদ্ধিতে খাটান তিনি। 'এঁড়ে'টা ধরা পড়েছে। এখন কারবার চলছে বিনা গরুতে! তাঁর আরও এক মহান কারবার আছে। খাটিয়া ভাড়া দেওয়া। 'জেসপ' এবং পার্শ্ববর্তী শ্রমিক অঞ্চলের যে সমস্ত শ্রমিকদের থাকার জায়গা নেই, তাঁদের দৈনিক দুটাকায় ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করা! কে কি বলবে? যারা বলবে তারা তো ডাকাত! চোরের বিচারক ডাকাত! তাই ইউনিয়ন নির্বাচনে যখন দু পক্ষ আমার কাছে এলেন, দু তরফই দাবি করলেন, তাঁরা 'দুনম্বরী' বন্ধ করে দেবেন। আমি তাঁদের বললাম, "না, এতে আমি নেই, যে পক্ষ পোস্টার দেবে সকলের চুরি করার সমান অধিকার আছে তাদের পক্ষে আমি!" প্রত্যেকের চুরি করার অধিকার স্বীকার করলেই যদি নিজেরা মারামারি করে চুরি বন্ধ করে! এরকম ঘটনাও মাঝে মাঝে যে ঘটে না, তা নয়, ঘটে।

বামফ্রন্ট এক অদ্ভুত রাজনীতি চালাচ্ছে। ইন্দিরা ওপর থেকে এমার্জেন্সি চালু করতে গিয়ে যে ধাক্কা খেয়েছিল বামফ্রন্ট সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করছে যে জনগণের মধ্যে থেকেই দাবি উঠুক—এর চেয়ে এমার্জেন্সি ভাল!

এমার্জেন্সির গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে। ইন্দিরা মানুষকে সংগঠিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঘৃণাই কুড়িয়েছে, এঁরা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না করে অধিকার দিয়েছে, সংগঠিতভাবে লুট কর, ফলে কর্মচারীদের বেশির ভাগ অংশই দাবি তুলছে, ইউনিয়ন ভেঙে দাও! ইউনিয়ন বা সংগঠন হল দু নম্বরীদের আখড়া। ইন্দিরা শত চেষ্টা করেও যেটা পারে নি, এরা কৃতকার্যতার সঙ্গে সেটা করছে।

'শত্রু-রূপে' ইন্দিরা-ধন্য এঁরা!

অসুস্থ কয়েদীদের দুধ-চিনি-চা-ডিমে চলছে রমরমা সিপাহী-ক্যান্টিন! অথচ বন্দীরা যখন বলেন 'আমাদের ডায়েট কেটে বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠানো হোক!' তখন আসে আইনের কথা! শিবঠাকুরের একুশে আইনের দেশে সবই সব্বনেশে ব্যাপার!

জেলে বসে তাই ভাবছি, 'কে চোর? কে অপরাধী? কে বেশি মানুষ? যারা নিজেদের খাবার কেটে বন্যাত্রাণে টাকা দিতে চান তাঁরা, না, যাঁরা সেগুলো ঘুরিয়ে সুদে টাকা খাটান, ব্যবসা করেন এবং যাঁরা তাদের মদত দেয়, তাঁরা?' শেষ বিচারের বিচারকরা কি বলেন দেখি! জেল-বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জেলকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে—

প্রথম যুগে বলা হতো প্রতিশোধাগার,

তারপর হলো—প্রায়শ্চিত্তাগার

তারপর হলো—কারাগার

এখন আবার সংশোধনাগার!

পুরানো-পচা জামায় নতুন কাপড়ের তালি মারতে গিয়ে সবসুদ্ধ খসে পড়ছে!

যে নামেই ডাক না কেন, জেল আছে জেলখানাতেই!

এরকম অবস্থাতে আমার জেলে আসাটাই যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যারা 'ভয়ে' অথবা 'সততা'র জন্যই জেলখানার এই 'জেল-চুরি' বন্ধ করতে চান তাঁরা উৎফুল্ল। 'এখন যদি ওরা একটু সমঝে চলে।' এঁরা সংখ্যায় বেশি। যাঁরা সরাসরি যুক্ত তাঁদের ভাবখানা—'এই রে শালা, না মরে আবার জ্বালাতে এলো! একটু এড়িয়ে চলাই ভালো!' এই এড়াতে গিয়ে একজন ধরিয়ে দিলেন আর একজনের ওষুধের প্রেসক্রিপশন—প্রায় ৬০০ টাকার ওষুধ!

প্রত্যেকেরই দাবি 'এর একটা বিহিত করুন!'

ওদের বোঝালাম, 'ডাকাত ধরতে ব্যর্থ হয়ে শেষে চোরের পেছনে কাঠি দিতে হবে? ওর মধ্যে আমি নেই।'

৩৮০ কোটি টাকা যেখানে তছরূপ হচ্ছে সেখানে ৩৮০ টাকা তো কোন ছার !'

এই ওষুধ ব্যাপারটা জেলখানায় একটা সমস্যা। জেল হাসপাতাল বন্দীদের জন্য, না, স্টাফদের জন্য এ প্রশ্ন সমাধান না হলে অসুস্থ বন্দীরা মরতে থাকবেই, কোনো ডাক্তারই জেলে টিকতে পারবে না। ওষুধের দোকানগুলোর কণ্ট্রাক্ট থাকে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র জেল-স্টাফরাই সপরিবারে বিনা খরচে চিকিৎসা পাবার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এবং এর কোনো উচ্চ-সীমা বাঁধা নেই। জেল-স্টাফরা এ সুযোগ গ্রহণ করেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। ওরা ডাক্তারবাবুকে নির্দেশ দিয়ে ওষুধ লেখান। সেই প্রেসক্রিপশন জেল-নির্দিষ্ট দোকানে জমা দিয়ে (শতকরা বিশ টাকা কমিশন ছাড়া) নগদ টাকা নিয়ে আসেন। ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর বাড়তি মাথা তো নেই যে তাঁরা স্টাফদের মর্জি-মাফিক ওষুধ লিখবেন না ! এই যন্ত্রণায় কেউ আর জেল হাসপাতালে চাকরি নিতে চান না। মন্ত্রীর হুমকি, আর অপমানের ভয়ে তাঁদের অবিবাহিত যুবক স্টাফের জন্যও একেবারে বিশটা ই-পি-ফোর্ট লিখে দিতে হয়। ই-পি-ফোর্ট হচ্ছে গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত ট্যাবলেট। বাজারে নাকি ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে। ভাবতে পারা যায় একই প্রেসক্রিপশনে ডুরাবলিন, ডেকাডুরাবলিন, কাইমোরাল ফোর্ট ? কিম্বা হেপাটাইটিসের জন্য কিলো কিলো গ্লুকোজের সাথে শ-শ 'কামপোজ' ? কোনো ডাক্তারই হেপাটাইটিসে 'কামপোজ' দিতে চাইবেন না, ওটা 'ধর্মীয় নিষিদ্ধ'। কিন্তু এখানে না দিয়ে উপায় আছে ? তাঁরা ডেভিড্‌সন সাহেবকে মাথায় তুলে রেখে শুধু লিখে যান, তাঁরা ডাক্তার নন, ইউনিয়নের দাদাদের অর্ডার ক্যারিয়ার কেরানি মাত্র। তাঁকে এক সিপাইবাবুর মায়ের জন্য (৬২ বৎসর বয়স্কা) ফার্টাইল ট্যাবলেট লিখতেই হবে, কারণ তিনি 'দাদা'। কে ডাক্তারি করবে ! মনক্ষুণ্ন ডাক্তার বড়জোর হেসে বলতে পারেন, 'আপনার মায়ের কি এখনও সন্তান দরকার !'

এর ফলে জেলরের ভাষ্য অনুযায়ী গত মাসে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ওষুধের বিল হয়েছে ! তাই বন্দীরা ওষুধ পাবেন না। জেলরকে চ্যালেঞ্জ জানালাম —এর কতটা সিপাহীদের জন্য ব্যয় হয়েছে জানান। উনি বললেন, এক লক্ষ পনেরো হাজার। বাকি পনেরো হাজার টাকা, এক হাজার বন্দীর জন্য খরচ। মানে দৈনিক ৫০ পয়সা। এর মধ্যে আবার আমার মত প্রিভিলেজড্‌ বন্দীও আছেন। তাহলে প্রায় সাড়ে ন'শ বন্দীর জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ ২৫-৩০ পয়সারও কম ! জেলর থতমত খেয়ে বললেন, কি করব বলুন, আমরা তো কতবার বলেছি, স্টাফদের পুলিশ হাসপাতালের সাথে যুক্ত করা হোক। তা কর্তারা শুনছেন কোথায় ? কর্তারা শুনছেন না—সুতরাং বন্দীগুলোই মরুক ! অদ্ভুত রাজনীতি,

সিদ্ধার্থবাবু শিউরে উঠছেন. না, মুচকি হাসছেন। তারাপদ লাহিড়ীর* চিতাভস্ম দিয়ে চিকিৎসা চলুক বন্দীদের !

প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে আমাদের মধ্যে একটা চুটকি চালু ছিল, বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যেই একজন এর স্রষ্টা ! প্রফুল্লবাবু তখন 'আমদরবার' করে প্রতিদিন সকালে সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট শুনতেন। একদিন এক বৃদ্ধ এলেন, তাঁর ছিল বিশাল হাইড্রোসিল। তিনি এসে প্রফুল্লবাবুকে বললেন, "স্যার একটা আর্জি ছিল !"

প্রফুল্লবাবু বললেন, "বলুন।"

বৃদ্ধ নিজের হাইড্রোসিলটা দেখালেন। প্রফুল্লবাবু বিশালাকার বস্তুটা দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, "আমি কি করব ? আমি তো ডাক্তার নই ?"

বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা, "আপনি পারেন স্যার।"

অবাক প্রফুল্লবাবু বিরক্ত হলেন, "যান, আপনি হাসপাতালে যান, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।" বৃদ্ধ আমতা আমতা করে বললেন, "না স্যার, তার দরকার হবে না, আপনি একটু হাত বুলায়ে দ্যান। আপনি যাতে হাত দ্যান সেটাই উবে যায়, আপনি যদি আমার এইটায় হাত বুলায়ে দ্যান এটাও উবে যাবে !"

সরকারিভাবে স্বীকৃত চিরকুমার প্রফুল্লবাবু কি করেছিলেন, চুটকি-কার সেটা বলেন নি। তিনি কিন্তু প্রফুল্ল সেনের ছেঁড়া জুতো পায়ে গলিয়ে যাতেই হাত দিচ্ছেন সেটাই উবে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলের তেল শুধু পশ্চিম বাংলার জেল-গুলোতেই নয়, হাসপাতালগুলোতেও সরবরাহ হত, বাইরেও বিক্রি হত। সেটা বন্ধ। নাকি 'ভীষণ' ক্ষতিতে চলছিল ঘানি। ঐ জেলের ছাড়া, দমদমের কম্বল, কার্পেট, আলিপুরের প্রেস, মেদিনীপুরের সরষে এবংচাল, বহরমপুর জেলার গামছা এবং তাঁতবস্ত্র, এগুলো সবই লাভদায়ক ছিল।

কার্যত জেলের বন্দীদের জন্য যে ব্যয় সেটা জেলের বন্দীরাই তুলে দিতেন। এখন আলিপুরের প্রেস একটা 'পবিত্র গাই'। টন টন কাগজ আসে, ছাপা যত না হয়, চোরাই বাজারে বিক্রি হয় তার বেশি। ব্যাগকে ব্যাগ লেড্, টাইপ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দামি দামি মেশিন অকেজো। সবই উঠে যাচ্ছে। এ চুরি হচ্ছে সংগঠিতভাবে। বন্দীরা কাজ করতে চান না এটা বাজে অজুহাত। কাজের ব্যাপারে বন্দীদের এরকম কোনো স্বাধীনতাই থাকার কথা নয়।

আসলে যে যেখানে আছে সেখান থেকেই 'কিছু পাইয়ে দাও বা করে নাও' সরকারের এই নীতিতেই এই হাল।

* জেল উন্নয়নের জন্য রাজ্যসরকার কয়েক বছর আগে তারাপদ লাহিড়ী কমিশন গঠন করে-ছিলেন।

এ সব আমিও জানি ওরাও জানেন। তাই জেল গেটেই সুপার অভ্যর্থনা জানালেন মিষ্টি হেসে, "দেখবেন, বুঝতেই পারছেন আমরা স্যাণ্ড-উইচ্‌ড্‌।" বললাম, "দেখুন আমাকে না গাইতে হয় 'তোমারই জেলে/পালিছো ঠেলে/তুমিই ধন্য, ধন্য হে'!"

কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম আমি আমার ফরমে ফিরে আসছি। উনি জেলের অবস্থা ব্রিফ করলেন। হাসতে হাসতে বললাম, "আমি তো এটাই চাই। আমি চাই সর্বাত্মক ধ্বংস। ইউনিয়ন এই ধ্বংসের কাজ ত্বরান্বিত করছে বই কি! আমার কাছে অনেস্ট অফিসার্স আর মোর ডেঞ্জারাস, কারণ তাঁরাই এই নরকের পাহারদারি করেন। নরকরক্ষীর অনেষ্টি মানে চরম নারকীয় ব্যাপার সেটা।

উনি বোধহয় একটু ধাক্কা খেলেন। ঠিক এটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ভিজিলেন্স কমিটির রিপোর্টে জেলের দুর্নীতি কিন্তু এখন ১৩ নম্বরে নেমে এসেছে। এমনকী বিচার-ব্যবস্থারও নীচে। তাহলেই বুঝুন, দুর্নীতিমুক্ত সরকারী সংস্থা বা ব্যক্তি, আর মোশন ছাড়া ম্যাটার এর অস্তিত্ব, দুটোই আমার কাছে অকল্পনীয়।

উনি হাসলেন। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিও দুজনের ঘাড়ে চেপে প্রধান দরজা দিয়ে জেলের ভেতরে ঢুকে গেলাম।

আইন-প্রণয়নকারী এবং আইন-প্রয়োগকর্তাদের মধ্যে যদি চীনের পাঁচিল থাকে প্রশাসনে অরাজকতা দেখা দেবেই। আর এই নৈরাজ্যের দায়-দায়িত্ব হতভাগ্য শাসিতদেরই বইতে হয়। যখন শাসিতরা হাত পা বাঁধা বধ্যভূমির পশু হয় তখন তো কথাই নেই! কথাগুলো বলেছিলাম নওজোয়ান জেলর মনোজবাবুকে। ছেলেটা কিছু করতে চায়। ধান্দাবাজ নয়, ছাত্র-জীবনের আদর্শ-ফাদর্শগুলো এখনও ওঁর মধ্যে ঝিলিক মারে। কিন্তু সদিচ্ছা দিয়েই তো সব হয় না। আইন যাঁরা তৈরি করছেন তাঁরা জানে না সমস্যাটা কি! তাঁদের লক্ষ্য তো আবার কি করে ভোটে জেতা যায়। ফলে তাঁদের থাকবে একটা 'পপুলিস্ট' দৃষ্টিভঙ্গি। বন্দীদের তো ভোট নেই সুতরাং বন্দীদের ভেট দিয়ে যদি ১০-২০টা মাস্তান 'রাজনৈতিক কর্মী' পাওয়া যায় ক্ষতি কি! জেলর-সুপাররা তো সংখ্যায় কম। তা ছাড়া তারা তো মারামারি করে ভোট এবং ভেট দিতে পারবে না। তাই জেলর-সুপারদের ওপর অলিখিত নির্দেশ, 'জেলে রাজনৈতিক কর্মী তৈরি কর।' বিভাগীয় মন্ত্রীরাও তাই চায়, যারা কয়েক বছর আগেও 'মুক্তি-সূর্য জিন্দাবাদ' করেছে, তাদের জামার রঙ পালটে গেছে। বন্দীদের রুটিটা, ডিমটা, দুধটা ডাণ্ডা মেরে

কেড়ে নিয়ে অমলেট টোস্ট চিবুতে চিবুতে অভুক্ত, অসুস্থ বন্দীকে কেউ বা সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের কথা, কেউ বা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা শোনাচ্ছে। জেলর-সুপার নির্বিকার দর্শক—'হুজুরের দল বাড়ছে', তাঁদেরও ভবিষ্যৎ মজবুত হচ্ছে।

হতভাগ্য বন্দী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ৭০ থেকে ৭৭, সাত বছরেরও বেশি সময় অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে জেল খেটেছি, ডাণ্ডা-বেড়ী পরে পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা লক-আপে থেকেছি, তার ওপর ছিল প্রতিটি স্মৃতি-বিজড়িত দিনে পাঁচ-হাতি-ডাণ্ডার ঝাড়। ১ মে, (মে-দিবস), পয়লা অক্টোবর (চীনা-বিপ্লব দিবস), ৭ নভেম্বর (অক্টোবর বিপ্লব দিবস), ২২ এপ্রিল (লেনিন জন্ম দিবস), এ সমস্ত দিনগুলো এলেই জেল হাসপাতাল খালি করে দেওয়া হত। হাত-পা ভাঙা, মাথা ফাটা 'নকশাল' বন্দীতে হাসপাতাল ভর্তি হয়ে যেত। এত নির্যাতন সত্বেও জেলকে কোনো সময় খাঁচা মনে হয় নি। কারণ দুটো। আমরাও তো আর হাত তুলে মার খেতাম না, হাতের কাছে যা পেতাম তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নিজেরা জেলে এসেছি বলে তো আর হাত আর মাথাটা স্টেট ব্যাঙ্কে সুদে জমা দিয়ে আসি নি। আমাদের এই অদৃশ্যপূর্ব লড়াই শত্রুপক্ষেরও শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিল। শত্রুপক্ষেও ছিল 'বীর পুজো'র দল। তাঁরা 'ত্যাগে'র এবং 'দৃঢ়তা'র প্রতি সম্মান জানাতে জানত। কারণ তারা ছিল যথার্থই যোদ্ধা। একজন যোদ্ধা, অন্য যোদ্ধাকে সাধারণত সম্মানই করে থাকে, লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুকে পরাজিত করতে হবে কিন্তু তার বীরত্বের জন্য প্রাপ্য সম্মান দিতে তারা কুণ্ঠিত হত না। তারা চরিত্র হনন, ব্ল্যাক-মেল, এগুলোকে ঘেন্না করত। আমাদের ব্যাপারগুলো আমরা লড়াইয়ের ময়দানেই ফয়সালা করে নিতাম, এটাই ছিল সে যুগের এথিক্স। অনেকেই ভাবতে পারেন এ তো মধ্যযুগীয় শিভালরি! হ্যাঁ এই 'শিভালরি' ছিল বলেই সে যুগ অমন মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের জন্ম দিতে পেরে-ছিল। সেটা ছিল বলা যায় শাসক শ্রেণীর কাছে ব্রিটিশ এথিক্স মেনে চলার সময়।

এখন এসেছে আমেরিকান এথিক্স মেনে চলার সময়। হাতে-মারার জায়গা নিয়েছে ভাতে মারা, লড়ায়ের ময়দানে ফয়সালা করার জায়গা নিয়েছে ষড়যন্ত্র। বুদ্ধির লড়াইয়ের বদলে এসেছে কুৎসা, চরিত্র হনন, ব্ল্যাক-মেইলিং। অদ্ভুত এক সন্দেহ-বাতিক মানসিকতা। প্রত্যেকে, প্রত্যেককে সন্দেহ করছে এবং এটা ছড়ানো হচ্ছে ওপর থেকে। তার ফলে তারা নিজেরাও সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ছে। অসুস্থ আবহাওয়া, অসুস্থ পরিবেশ, দম বন্ধ হয়ে আসা বাতাবরণ। মন্ত্রীরা সরাসরি ইউনিয়নের মাধ্যমে ফরমান জারি করছেন ফলে জেলর-সুপার বন্দীদের কথা ভাববেন কখন? ইউনিয়নের আর্জি এবং দাবি শুনতেই তাঁদের সময় চলে যায়।

'দরবারে হেরে/বউকে ধরে মারে' জেলর-সুপার ইউনিয়নের সাথে না পেরে উঠে যত কড়াকড়ি করেন বন্দীদের ওপর। ফলে বন্দীরা দ্বৈত শাসনের বলি। ইউনিয়নের শাসন, জেলর-সুপারের শাসন। বর্তমানের জেলর-সুপারদের দেখলে করুণা হয়। এক ইউনিয়নের এক নেতা সুপারকে সম্বোধন করলেন, 'যা বে শালা ঘরে ঢোক্!' সুপার বেচারা কোন ইউনিয়নের কথা শুনবে। মুখ্যমন্ত্রীর ইউনিয়ন, না জেলমন্ত্রীর ইউনিয়ন। জেলমন্ত্রীর ইউনিয়ন এই জেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ, স্বরাষ্ট্র-সচিব, অর্থ-সচিব সব আটকে দিচ্ছে।

টাকার বা জীবন মানের ভিত্তিতে নয়, এখানে তো শ্রেণী (!) বিশ্লেষণ করতে গেলে নির্যাতনের ভিত্তিতে করতে হবে দেখছি! আর্থিক উপার্জনেই বা এক একজন জেল-সিপাহী নেতা একজন জেলর (সৎ বা ভীরু অথবা ভদ্র) থেকে কম কিসে! মার্কসবাদের সমস্ত শিক্ষা পালটে যাবার জোগাড় হয়েছে দেখছি! দুই ইউনিয়ন যদি শুধু নিজেদের মধ্যেই লড়াইটা সীমাবদ্ধ রাখত তা হলেও বুঝতাম! তারা বন্দীদের নিয়েও টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। এতে বন্দীদের মধ্যকার সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছে। ইউনিয়নগুলো সোজাসুজি চলছে পুলিশের নির্দেশে। আই পি এস সংগঠন পরিষ্কারভাবে জেলকে সিভিল-শাসন থেকে পুলিশি শাসনে আনতে চায়, এরই জন্য সব সময় তারা জেলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সিভিলিয়ানদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা প্রমাণ হয়। দুই ইউনিয়নের মধ্যেই কিছু পরিচিত পুলিশি এজেণ্ট আছে, তেমনিই আছে বন্দীদের মধ্যেও তাদের তল্পিবাহক। জেলর-সুপার এই ত্রিমুখী চাপে হতভম্ব। সামান্যতম সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ। তাই কোনো জেলে সুপার (যেমন দমদমে) পুলিশের ১১২ টাকার মাইনের ইনফরমারের মত কাজ করেন। কলকাতার বাইরের একটি জেলের সুপার যেমন মহান দায়িত্ব নিয়েছেন বন্দীদের মধ্যে এবং সিপাহীদের মধ্যে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করাবেনই। অথচ তিনি রাজনীতির কিছুই জানেন না বোঝেন না, সুতরাং কিছু ধান্দাবাজকে দলে টানার জন্য প্রচুর সুযোগ দিয়ে দল ভারী করছেন। এতে ব্যাপক অংশ নিজেদের বঞ্চিত এবং নির্যাতিত মনে করছেন। তার দলে টানার পদ্ধতিও বিচিত্র—জেলের মধ্যে ড্রাগের কারবার করার অবাধ সুযোগ দান, মদের সরবরাহ এবং ইণ্টারভিউ-এর সময় বাইরের দেহ-পসারিনী ঢুকিয়ে নিজের অফিসে কিছু লোককে যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া। বর্তমান আলিপুর জেলের সুপার আধা পাগল। অর্থাৎ তাঁকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি-

দের স্বীকৃতি দিতে চান। তাতে চলবে কি করে! তাঁদের সব কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব রাইটার্সের সরাসরি নির্দেশে বলীয়ান হয়ে তারা সুপারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর বউ-মেয়েও বেরতে পাচ্ছে না। বেচারা বন্দীদের কথা ভাববে কখন? ফলে পাগল হয়ে যেতে বসেছে। অসংলগ্ন কথা-বার্তা, অদ্ভুত সব কাজ করে বসে।

সেই পুরনো পুরনো কথা, পুরনো শব্দ, হাসপাতাল, 'আমদানি এক!' চাবি খোলার আওয়াজ, ঘটাং শব্দে লোহার গেট্ বন্ধ! পৃথিবী পেছনে পড়ে রইল, ঘুরুক সে ঘুরুক। ঘুরুক তার সুতিকাগারকে বন্দনা করে, ঘুরুক! ঘুরতে ঘুরতেই সে রূপবতী হোক কিম্বা বুড়িয়ে যাক্! পৃথিবীর এ গতি থেকে আপাতত বিচ্ছিন্ন হলাম আমি। আমার গতি স্তব্ধ। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ। চোকলা ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে নির্দিষ্ট সেলের দিকে পা বাড়ালাম। গান্ধী-নেহরুর পাথরের মূর্তি ডান দিকে পড়ে রইল। বাঁ দিকে রামকৃষ্ণ মজুমদারদের শহীদ বেদী। একটু থেমে সেলাম জানালাম, 'শক্তি দাও, তোমরা শক্তি দাও, বিপ্লবী কিনা জানি না, আমার বিদ্রোহী সত্তাকে শক্তি দাও! প্রলোভন জয় করার শক্তি দাও। প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি দাও। তোমরা আমাকে ভুলো না! ভুল বুঝ না! সেলাম তোমাদের, লাখো কোটি সেলাম! কি করে গেছ তোমরা সে বিচার করার অধিকার আমার নেই।' এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা 'সেলের' সামনে এসে গেলাম। জেলের মধ্যে জেল, তার নাম সেল! সেল মানে একটা ব্লক, পাঁচিল দিয়ে অন্যান্য ব্লক বা বিল্ডিং থেকে পৃথক। জেলর, ডেপুটি, চিফ-হেডওয়ার্ডার, দুজন সিপাহী আর দুজন কয়েদী আগে-পিছে আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে এল। এ সেলটা দোতলা, পাঁচটা করে ঘর।

১নং সেল! ঘরের সামনে অপ্রশস্ত বারান্দা জাল দিয়ে ঘেরা, মুক্ত বাতাস যাতে না ঢুকে পড়ে তার ব্যবস্থা আর কি!

৭২ সালে কমরেড চারু মজুমদারের গ্রেপ্তারের পর এই সেলের দু-তলায় দুটো ঘর পাঁচিল তুলে পৃথক করা হয়। বারান্দাটা ঘন জাল দিয়ে ঘিরে সিঁড়ির মুখে জাল দেওয়া দরজা বসানো হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ না দেখতে পায়। নীচে দাঁড়িয়ে একবার উপরের দিকে তাকালাম। একটা লোকের মুখ নিমেষে উঁকি মারল। এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ যেন বুকের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে।—

'কি বউ-বাচ্চার জন্য মন খারাপ করছে?' হ্যাঁ, এই তো সেই কণ্ঠস্বর, যিনি

বলেছিলেন 'বিপ্লবীরা যন্ত্র নয়, মানুষ, মানুষ বলেই তাঁরা হাসেন, মানুষের দুঃখে কাঁদেন।' 'যে কাঁদতে জানে না সে বিপ্লবী নয়।'

মনে পড়ে গেল ৭০ সালের কথা, বাবা মারা গেছেন শুনেছি। আমি তখন গ্রেপ্তারি পরওয়ানা এড়িয়ে সুন্দরবনে কাজ করছি। বাড়ি যাবার কোনো সুযোগ নেই। পার্টিতে প্রত্যেকেই জানতেন আমি বাবারই ছেলে। দুজন দুজনের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিলাম। সেই বাবাকে দু-বছর দেখি নি, তাঁর মৃত্যুতেও যেতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ। চারুদা দরদভরা চোখ দুটো তুলে বললেন, 'কি ছাত্রনেতা (ওই নামেই ডাকতেন) মন খারাপ করছে? মায়ের সাথে একবার দেখা করে এস না।'

"বউ বাচ্চার জন্য মন খারাপ করছে?" হ্যাঁ—এই তো সেই কণ্ঠস্বর! ভুল ভাঙল, বুঝতে পারলাম হ্যালুশিনেশনে ভুগছি। এই এ্যাটিনোলোল খেলে এ সম্ভাবনা আছে, জেলর বললেন "চলুন, ওপরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে!" আবার চমক! কী! ঐ ঘরে, যেখানে উনি এলেন না, সেই ঘরে আমি থাকব? অদ্ভুত এক অনুভূতি! কাঁধে চেপেই ওপরে উঠলাম। একেবারে নিখুঁত ব্যবস্থা! জেলে এটাই নিখুঁত। আবার একটা পাখা!

বন্ধ করে দিয়ে জেলর তার দলবল নিয়ে চলে গেলেন। একা হয়েই নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেলাম। সারা দিনের চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ল, 'চারুদা বলুন আমি কি ভুল করছি?'

কিছুক্ষণ পরে হালকা হলাম। হেসে ফেললাম! একি! রোগ-শোক-দুঃখের ফাঁক দিয়ে এ কী চিন্তাধারা ঢুকছে?

প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা ভাববাদকে প্রকৃতি থেকে তাড়াতে অক্ষম হয়েছেন, মার্ক্স-এঙ্গেলস তাকে সমাজ এবং ইতিহাস থেকে তাড়িয়েছেন, তাই এখন ভাববাদের আশ্রয় মানুষের মস্তিষ্ক! এবার মাথার ভেতর থেকে তাড়াতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই সহজ! এটা যে প্যাথোলজি হয়ে গেছে। কয়েক প্রজন্মের ব্যাপার! অবিশ্বাসী মানুষ বলে কোনো মানুষ থাকতে পারে না। মানুষ মাত্রই আছে একটা নির্ভরতার প্রশ্ন। নির্যাতিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ বোঝে তার নির্যাতনের কারণ কি। কিন্তু যখন যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে (অবশ্যই তার সীমাবদ্ধতা সহ) এখান থেকে মুক্তির উপায় পায় না তখনই সে তার সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ করে বসে হয় 'ভগবানে' না হয় 'ভূতে', পড়ে আরও নির্যাতনের খপ্পরে। ফয়দা ওঠায় ধান্দাবাজরা। তাই জেলে ভূতের প্রকোপ বড় বেশি।

বাংলা সাহিত্যের কে যেন (খুব সম্ভব রাজশেখর বসু) ভূতের চারপুরুষের

নাম ঠিকুজী তৈরি করেছিলেন। ভূতের বাপ অদ্ভুত, তার বাপ কিম্ভূত, তার বাপ যমদূত, যমদূত থেকে অদ্-ভূত, কিম্-ভূত, ভূত! জেলে তো ধুলো-বালি থেকে পাহারাদার সকলেই সেই আদি পুরুষের চেলা বা দূত। বাইরে তো কত লোকের কত কেটে-ছড়ে যায়, কটা ঘা সেপ্টিক হয়? এখানে একটু কাটুক অমনি পেকে সেপ্টিক হয়ে ভুগিয়ে ছাড়বে! জেলের একটা গোলাপ, বেলফুল কিম্বা রজনীগন্ধা ছিঁড়ে নাকের কাছে আনলেও কোনো গন্ধ নেই। মনে হবে কাগজের ফুল। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এরই জন্য জেলের ভূত আর ভূতেদের জেল একাকার হয়ে গেছে। সন্ধের পরে রাত যত গভীর হয় খালি ভূতের গল্প, সে ভূতও কত রকম। নক্‌শালভূত, সাহেবভূত, কয়েদীভূত, ব্যাণ্ডেজভূত, হনু-ভূত, পেত্নি, এর কি আর শেষ আছে! সব মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে—জেলটা বেশির ভাগ সময় ভূতেরাই দখল করে থাকে। পাহারাদারীতে থাকে যমদূতের চেলারা!

তবে ভূতেদের দেখা পাওয়াটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভাষা জানলেই ভূতেদের কথা বোঝা যায় না। ভূত সম্পর্কে যদি জ্ঞান থাকে তবেই ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে তাদের কথা বোঝা যাবে। ব্যাপারটা কিছু কিছু তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিক কবিতার মত। আপনি ভাষাটাও জানে, শব্দগুলোর মানেও জানেন, শব্দগুলো জুড়ে যে অর্থ হয় তাও বুঝতে পারলেন, অথচ কবিতাটা বুঝলেন না, কবির কথা বুঝতে পারলেন না। গোটা ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য রয়ে গেল। এরই জন্য কিছু কিছু কবিকে কবিতার মুহূর্তটা ব্যাখ্যা করতে হয়। ভূতেদের তো আর সে সুযোগ নেই—তাই আগে থেকে 'জ্ঞান' নিয়েই তাদের কথা বুঝতে হয়। যিনি বুঝতে পারেন—তিনি 'রিড্‌ল অফ দ্য মাইণ্ড' কাটিয়ে ডিভাইন লাইট-এর সন্ধান পান। যমদূতের চেলারাও সে আলোকে আলোকিত হয়ে তাঁর পথ পরিষ্কার করে দেন। যাতে করে চেরাপুঞ্জী থেকে পুণ্ডীচেরীতে তিনি ভূতের নেত্ত নাচতে পারেন। বারীন ঘোষরা যাবজ্জীবন ভূত-ঘেরাও হয়ে কোনো এক নজরুলকে লিখতে থাকুন—'তোমার ধুমকেতু যেন সকল মেকী দেশপ্রেমিকদের দাড়ি-গোঁফ জ্বালিয়ে দেয়!' ভূতের জন্য দরকার জেলের সেল। যদি সে 'সেল'-এর ঘর অন্ধকার স্যাঁত-স্যাঁতে, ৭ পা-বাই ৭ পা হয়, তার এক কোণে যদি খাবার জলের কলসি আর মল-মূত্রের ঢাকনা-বিহীন টুকরি পাশাপাশি থাকে, পিপাসার জলে পেচ্ছাবের গন্ধ যদি মেশে, যদি আবার হয় 'সেল'টা পশ্চিমমুখো, এবং আপনি যদি হন আজীবন বিলেতে মানুষ হয়ে আসা, মহারাজার আশ্রয়পুষ্ট হয়ে যদি আপনার পুষ্টি হয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ যদি যুক্তিবদ্ধ মনের 'পাপ তাড়নায়' অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন, এবং তার ফলে যদি জেলে আসতে হয়, এসেই যদি ঐ রকম

সেলে থাকতে হয়, আর জেলটা যদি হয় প্রসিডেন্সি জেল, নির্ঘাৎ আপনার ঘাড়ে নরেন গোঁসাই-এর ভূত চাপবে। আপনি 'ডিভাইন-লাইটে'র সন্ধান পাবেন। এটা পেলেই আপনার মুক্তি। মেজাজে ভগবান সেজে আলো ছড়ান। পার্থিব সম্ভোগের সমস্ত রাস্তা তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, আই সি এস হয়ে বা মহারাজের নায়েবি করে এর একশ ভাগের এক ভাগও আপনি পেতেন না।

কৃষ্ণ-ঠাকুর কালিয়া নাগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি যমুনার জলে বিষ ঢালিয়া তাহাকে বিষাক্ত করিয়াছ কেন? সেই জল পান করিয়া আমার কত রাখাল এবং গরু মারা গিয়াছে দেখো!'

কালিয়া নাগ কহিল—'ঠাকুর আমাকে তো অমৃত দাও নাই যে ঢালিব, বিষ দিয়াছ তাই বিষই ঢালিলাম।'

কোনো মানুষের হৃদয়কে অনবরত বিষে জর্জরিত করলে সে সমাজ-সংসারকে বিষ ছাড়া আর কি দেবে?

কলকাতার সব থেকে বেশি 'নিরাপত্তা'র বেড়া দিয়ে ঘেরা জেল—প্রেসিডেন্সি জেল। আদিগঙ্গার পাড়ে প্রায় ১০০ একর জমিকে ১৮ফুট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জগৎ, '৭০-এর পর আরও চারও ফুট বাড়িয়ে সেটা ২২ ফুট করা হয়েছে। ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যখন পড়তে আসতাম, অবাক হয়ে পাঁচিলটা দেখতাম, মাঝে মাঝে ভাবতাম কারা থাকে কারান্তরালে? তখন কি জানতাম লাইব্রেরির মাঠের উলটো দিকের ব্লকটাতেই আসতে হবে আর কয়েক মাস পরে! ওটার নাম সাত-খাতা, 'খাতা' অর্থাৎ ব্লক। জেলের বিচিত্র একটা ভাষা আছে। মূল-শব্দ ভাঙতে ভাঙতে অধিবাসীদের উচ্চারণযোগ্য হয়ে সেগুলো স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসেছে। বাইরে থেকে আমদানি করা বিভিন্ন অসামাজিক পেশার জন্যও বিভিন্ন শব্দ:—টিঙ-বাজ (পকেটমার), গাব্বা-বাজ (চুরি) গাব্বা-ভস্‌কানো (তালা ভাঙা), পড়ি-বাজ (স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাকা, পরে সুযোগ বুঝে অপেক্ষারত যাত্রীর মালপত্তর নিয়ে সরে পড়া), ঢোলবাজ (ট্রেন ছাড়ার সময় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সরে পড়া)। এই সমস্ত পুরনো শব্দের সাথে ষাটের দশকে নতুন কিছু শব্দ আমদানী করা হয়েছে রুটি (ক্র্যাকার), গাই (রাইফেল), বাছুর (ছোটো আগ্নেয়াস্ত্র). গামছা (তালা ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন রড যেটা ক্রমশ সরু থেকে মোটা হয়েছে। যেমনই তালা হোক, তালার আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিলে লিভারটা কেটে যায়, তালা খুলে যায়) ষাটের দশকের শেষে কলকাতা-হাওড়ার অদ্ভুত আর একটা 'পেশা' বাজারে আসে।

তার বাজারি নাম—কড্‌-লাইন, কড্‌-মাস্টারদের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। আপনি বাড়ি কিনবেন, হন্তে হয়ে ঘুরছেন, কড্‌-লাইনের লোকেরা আপনাকে পাকড়াও করল। কড্‌-মাস্টার আপনাকে নিয়ে গেল একটা বাড়িতে, সেই বাড়িতে বসিয়ে আপনাকে চা-মিষ্টিও খাওয়াল, বাড়ি দেখলেন। ঠিক সময়ে (যদি পছন্দ হয়) আপনার দলিল-দস্তাবেজও তৈরি হয়ে গেল। টাকা পয়সা মিটিয়ে আপনি যখন নতুন বাড়িতে ঢুকতে গেলেন—তখনই বুঝতে পারলেন—লক্ষ টাকা কোথায় গেছে। আপনি যার ঘরে বসে খেয়ে এসেছেন তিনি হয়তো ভাড়াটে। এখানে কড্‌-মাস্টারের ঝকঝকে কথার মারপ্যাচে আপনারা দু-জনেই কাত হয়েছেন।

'এই যে মেশোমশাই, ইনি এই বাড়িটা কিনবেন।'

ভাড়াটেরা ভদ্রলোক—'নমস্কার। কত টাকা দাম দেবেন?' আপনি—'এই এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার।'

ভদ্রলোক—'তা সস্তা হয়ে গেল না?'

কড্‌-মাস্টার—'সে আমি ঠিক করে দেবো! কাগজপত্তর তো আমার কাছেই থাকে। ও আপনাকে ভাবতে হবে না (গলার স্বর খুব আস্তে, শুধুমাত্র আপনিই শুনতে পাবেন কথাটা)।' অর্থাৎ আপনি বুঝলেন—এই ভদ্রলোকই বুঝি মালিক। ভাড়াটে বুঝলেন—এই কড্‌-মাস্টারই মালিক কিম্বা মালিকের লোক। এক কড্‌-মাস্টার তো হাওড়া ময়দানটাই বিক্রি করে দিয়েছিল। অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা করে এরা জেলে এসেই পড়ে ভূতের খপ্পরে। বারো ভূতের কারবারে নাজেহাল হয়ে পড়ে।

ডি আই আর-এ রহস্যজনক ভাবে গ্রেপ্তার হলাম। যদিও এর আগে শৈবালদা গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন, তবুও আমি কেন সেদিন গ্রেপ্তার হলাম বুঝতে পারলাম না। পার্টি বা সংগঠনে তো আমার তেমন গুরুত্ব ছিল না। বুঝলাম জেলে এসে। থাক সে সব কথা। 'আত্মজীবনী' তো লিখতে বসি নি। তবে শৈবালদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ওর সমালোচনা ছিল একটাই—'তুমি বড় বেশি নিজেকে ছোট করে দেখছ, নিজের কাজকে ছোট করে দেখা অন্যায়।' এ কথা বললাম কারণ, পরে আরও দুজন ব্যক্তি আমাকে তীব্র ভৎর্সনা করেন প্রায় একই ভাষায়। প্রথমজন কমরেড চারু মজুমদার—'নিজের কাজকে ছোট করে দেখা এক ধরনের সংশোধনবাদ। এতে শত্রুকেই ছোট করে দেখা হয়। তাকে আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হয়।' অন্যজন হলেন সরোজদা। তিনি তো

সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন—'তোমার ঐ আত্ম-নিগ্রহের দর্শন ছাড়তে হবে। আত্ম-শুদ্ধি, আত্ম-নিগ্রহ লিও-শাউ-চি-র দর্শন।'

আমি আমার স্বভাব অনুযায়ীই সকলের কথা শুনতাম, কারুর কথাই মানতাম না। এখনও যে মানি তা নয়। গুরু বলে গেছেন—"Give they ear/few they voice" আমার মুখে 'গুরু' শুনে চমকে ওঠার কারণ নেই।

কারণ, জন্মসূত্রে আমি মুসলমান হলেও মনেপ্রাণে আমি পৌত্তলিক। পৌত্ত-লিকতা আমার প্যাথলজি হয়ে গেছে। কারই বা নয়। নিরাকার 'আল্লা'র সেবক এবং দুত পয়গম্বরকেও তো একই সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল। তিনি যখন প্রার্থনাগৃহ থেকে মূর্তিগুলো সরিয়ে দিয়ে 'নামাজ' প্রথার প্রবর্তন করেন তখন আরববাসীরা বগলে লুকিয়ে রাখতেন মুর্তি। পয়গম্বর দেখলেন মহা সমস্যা। তিনি তখন 'নিখুত'-বাঁধার (লক্ষ্য স্থির) জন্য কানে হাত তুলে, বুড়ো আঙুল দিয়ে কানের লতি ছুঁয়ে হাত দুটো নাভির ওপর রাখার (বাঁ হাতের ওপর ডান হাত) নির্দেশ দিলেন। এর ফলে বগলের তলার মূর্তিগুলো পড়ে যেতে লাগল। তাতেও কি নিস্তার আছে! শেষ পর্যন্ত খোদার দুত জিব্রাইল ফরমান দিলেন—ইব্রাহিমের 'মাকাম'-কে সিজদা-গাহ্ রূপে গ্রহণ কর। 'মাকাম' মানে হযরত ইব্রাহিমের বাসস্থান বা এখানে কবর)। সেই থেকে সমস্ত মুসলমানই সেইদিক মুখ করে সিজদা দেন।

এটা কি মূর্তিপুজোর সাথে আপস নয়? এহ বাহ্য। যে ইসলাম ধর্ম কোনো মানুষ প্রভুর কাছে 'সালাম' (সমর্পণ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাঁদেরই 'ইমামে'র 'কলমা' 'লা-ই-লাহা ইল্লাহ্ মুহাম্মদ-উর-রসুল্লাহ্' অর্থাৎ—আল্লাহ্ এক, মহম্মদ তাঁর রসুল। শুধু প্রথম অংশটা বললেই কেউ মুসলমান হয়ে যাবেন না, তাঁকে দ্বিতীয় অংশটাও বলতে হবে এবং মানতে হবে। 'মহম্মদ'কে না মানলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব মানা যাবে না।

এক কথায় বলা যায়—মূর্ত থেকে বিমূর্তে উত্তরণই হচ্ছে চিন্তার প্রক্রিয়া, 'ইসলামে'র বিমূর্ত উপাসনা তো পদে পদে মূর্ত থেকে উত্তরণ। অনেক বেশি মূর্তিমান। ['আম্-পারা' পড়া' 'মৌলুভী মোলবী'রা আমাকে মাফ করে দেবেন নিশ্চয়।] ইস্‌লাম শব্দটার ধাতু যদি 'সালাম' হয়, তাহলে তো একাধিক মানে হতেই পারে। শান্তি অর্থেও ইসলাম হয়। আবার 'সালাম' মানে বিনা শর্তে নিজেকে সমর্পণ। এই সমর্পণ আল্লাহ'র কাছে। কেন? কার জন্য জাতি, (কত্তম) ধর্ম, দেশের জল। পথ—'জেহাদী', চরম লক্ষ্য-শহীদ হওয়া। অথবা 'গাজী'।*

* গাজী :—ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) যাঁরা বেঁচে থাকেন।

ভাবুন একবার কতখানি মূর্ত ব্যাপার। কি মুশকিল! মুশকিল আসান কর বাবা! শুরু করেছিলাম 'ভূতে'র কথা বলল বলে, এসে গেল ভগবান, আসলে দুটোই তো ভূতুড়ে ব্যাপার—বিমূর্ত! তাই গুরুবিশ্বাসী আদিম-মনের ধারক আবার গুরুরই শরণাপন্ন, গুরু বলেন—'আরে বাবা, তন্ত্র যখন, তখন একটা গুরু ধরতেই হবে! সমাজতন্ত্রই বা তার থেকে বাদ যাবে কেন?' তাই যতই বিজ্ঞজনে উপদেশ দেন না কেন গুরু আমি ছাড়ছি না। মাথায় থাক পার্সোনালিটি কাল্ট-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হাজারো কাল্ট-এর থেকে, একটা গুরু ধরে কাল্ট-উত্তীর্ণ হওয়া অনেক ভালো। এতে তো অন্যের জীবন দুর্বিষহ হবে না। এই কাল্ট-এর জন্য আমার (বাবা বলতেন—মিশরীয় রক্ত, আমার তো মনে হয় মঙ্গোলীয়, না হলে নাক থ্যাবড়া চুলের অপ্রাচুর্যতা, হলদেটে রঙ হবে কেন?) ইসলামী রক্তের 'জেহাদী' জেদ শহীদী-মেজাজ সবগুলোকেই আমি আবার উস্কে তুলতেও রাজী আছি।

বিজ্ঞানের বৃদ্ধ অধ্যাপক শুনে হা হা করে হেসে বলবেন 'জয় বাবা সরোজ দত্তের জয়!' তা ওঁরা যতই বলুন, আসলে ওঁরা বুঝতেই পারেন না আমাদের সময়টাকে! সে সময়টা ছিল 'পার্সোনালিটি কাল্ট'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে যে কাল্ট তৈরি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়। প্রথম দল বাঁধনছাড়া উপোসী ডালকুত্তার মত রক্তের স্বাদ পেতে মেতে উঠলেন। শুরু হল ইঁদুর দৌড়। সমস্ত মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্য ঘাটে নোংরা ন্যাকড়া কাচাকাচি শুরু হয়ে গেল! (এদের নেতৃত্বে যদি একজন সিপাই মায়ের জন্য ফাটিলিটি ট্যাবলেট লেখায়, অশ্লীলতা কোথায়?) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধ্বজা তুলে ধান্দামূলক আত্ম-সর্বস্ববাদ দেখা দিল। কামিয়ে নাও, যত পার ভোগ কর। কোনো বাঁধন নেই, না ব্যক্তির, না আদর্শের!

অন্যদিকে দ্বিতীয় দল 'আঁকড়ে' ধরতে ধরতে, ক্রমশ ছুৎমার্গী হয়ে পড়লেন। কুয়োর ব্যাঙে পরিণত হলেন। যত বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়েন, তত বেশি আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের শুরু হয়েছিল সঠিক ভাবে, কিন্তু তাঁরা মূর্ত থেকে বিমূর্তে উঠতে পারলেন না। প্রাথমিক পর্যায়েই আটকে থাকলেন। তথ্য আর তত্ত্ব হল হল না। 'বিশেষ' আর 'সাধারণ' হল না। ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিটাই হয়ে উঠল প্রধান। ভুতুড়ে ব্যাপার আর কি! এই যুগে 'ভুতুড়ে' কারণেই যে গ্রেপ্তার হতে হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

'৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি জেলের দরজা হাট করে খুলে দিয়ে আমরা ৪৫ জন পালালাম। তারপর ধরা পড়লাম। সে সব এক পর্ব—থাক সে

কথা। ধরা পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না কি কোর্টে হাজির করতে হয়—কেতাবে লেখা আছে। যদি কেউ কোনো দিন এ লেখা পড়েন, তাঁরা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন আমি ইনডিকেটিভ সেনটেন্স খুব কম ব্যবহার করি কারণ তাহলে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা আছে। ইনডিকেটিভ সেনটেন্স-এর চরিত্রই হল হয় সত্য না হয় মিথ্যা। এই বাক্য যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সত্যবাদী কিম্বা মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করাও সহজ। আমাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষও তাই ও ধার ধারেন না। কে একজন না কি 'পুলিশি' কথার ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সেফ গার্ডিং দ্য ডেমক্র্যাসি—বাংলাদেশের লোকেরা অবশ্য বলে থাকেন—'পাজী'র প, 'লোচ্চার, ল, আর 'শয়তানে'র শ নিয়ে 'উ' দিককার পানি 'ই' দিক করেই তৈরি হয়েছে 'পুলিশ' তাই ২৪ ঘণ্টা কেন, ২৪ দিনেও লোকে জানতে পারল না আমি ধরা পড়েছি, কখনও 'রামমিশির যাদব' কখনও 'ভোলা সিং' কখনও বা 'আব্দুর রহিম' হয়ে লালবাজারের রেজিস্টারে বিরাজ করতে লাগলাম। প্রায় দেড়মাস পুলিশ হাজত খাটার পর আমি হলাম—আজিজুল হক। দেড়টা মাস একপাল নররক্তলোভী নেকড়ের মধ্যে থাকা যে কি ব্যাপার সেটা এখন প্রায় প্রত্যেকেই জেনে গেছেন—বিভিন্ন কাগজের দৌলতে। সে সব গল্প তো প্রায় শ্রুতি হয়ে গেছে। কিন্তু যেটা কেউ বলেন না, তা হল এই একমাস, দেড় মাস একটা লোক একপাল রক্ত-লোলুপ নেকড়ের মাঝে থেকেও মানুষ হিসাবে বেরিয়ে আসে কি করে? তার শরীরের সর্বত্রই মানুষের-অধিকার অর্জন-চিহ্ন। হাত-পা ভাঙা, নখের কোলে কোলে রক্ত জমে পচা ক্ষত। মাথার চাঁদিতে দগদগে ঘা, পুরুষ হলে যৌনাঙ্গের দুপাশে কালসিটে দাগ—বৈদ্যুতিক শকের চিহ্ন হিসাবে থেকে গেছে, নারী হলে—স্তনের বোঁটায় ফোস্কা কিম্বা ক্ষতবিক্ষত স্তন-বোঁটা! হ্যাঁ, এগুলোই আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের চিহ্ন! গণতন্ত্রের দেওয়া মনুষ্যত্বের প্রায় সব কটা চিহ্নে চিত্রিত হয়ে মানুষ আজিজুল হককে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হল; স্ট্রেচারে শুয়ে চারজন পুলিশের ঘাড়ে চেপে কোর্টে উঠলাম, মনের গোপনকোণে ক্ষীণ আশা ছিল আমার এই রকম অবস্থা দেখে বিচারক নিশ্চয় আর পুলিশ হাজতের নির্দেশ দেবেন না। আসামী বলতে আমি একা। আসামীর কাঠগড়ার জালের ফাঁক দিয়ে দেখলাম চেনা-শোনা অনেক মুখই কালো কোট গায়ে বসে আছেন। গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে নিঃশব্দে বিচারক ঢুকলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা উকিল একসারে উঠে চিৎকার করছে—'স্যার, এঁকে জেল-কাস্টডিতে পাঠান, হাসপাতালে পাঠান স্যার! স্যার এঁকে পি-সি দেবেন না স্যার!' সেদিনকার সেই ম্যাজিস্ট্রেট আজকে হাইকোর্টের জজ! সেদিনই তিনি

শপথ করে নিয়েছিলেন—'জজ' আমাকে হতেই হবে!' তাই সব আবেদন-নিবেদনকে তিনি দার্শনিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন—'১৫ দিনের জন্য পুলিশ হাজত!' ঘরসুদ্ধ উকিলবাবুরা আঁতকে উঠলেন—'স্যার, মরে যাবে স্যার!' ম্যাজিস্ট্রেট একটা বাঁকা চাহনিতে আমাকে দেখে কোর্ট মুলতুবি করে উঠে গেলেন। নিজের ভাঙা হাত দিয়ে নিজেরই গালে একটা চড় কষালাম—"আইন? মোহ? এরই জন্য তোমার কমরেডরা তোমাকে সংশোধনবাদী বলে, বুঝলে? হল তো শিক্ষা?"

উকিলগুলোর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার আর কি করবে? এখন এক মেরে ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। আর মেরে যে ফেলতে পারবে না বোঝাই যাচ্ছে। এত মানুষ এখনও ভালোবাসে। কেন যে ছেলে-গুলো যেচে গিয়ে চড় খেল!

হ্যাঁ ওদের ভালোবাসার মূল্য দিতে আমার ডান হাতের সব কটা আঙুল থেঁতলে গেল (কারণ গোটা শরীরের মধ্যে ওই আঙুলকটাই অক্ষত ছিল)।

"কেন সমস্ত উকিল একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে জেল কাস্টডির জন্য প্রে করল? তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে সংগঠন আছে? সংগঠন যখন আছে তখন বল নাম!" মামদোবাজী আর কি! বাকি আছে তো দশটা আঙুল! আঙুল-কেলী শুরু হল। এক-একটা আঙুলকে উলটে কব্জির সঙ্গে ঠেকানো আবার তালুর শেষপ্রান্তে নিয়ে আসা। পরিশ্রম ওদেরও কম হচ্ছিল না। থাক সে সব কথা। এ সব তো জানা জিনিস! 'আইনের' চোখে ধরা পড়ে আইনের দৌলতে আইনী পি সি খাটা শুরু হল। রাখা হল লালবাজারের দু-তলার লক্-আপে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকে মহিলা লক্ আপ, তার উলটো দিকের একটা খালি ঘরে আমি একা। লক্-আপের বাইরে একজন সার্জেন্টের ডিউটি। যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ বিষ। বিড়ির নেশা চেপেছে। লক্-আপে বিড়ি পাই কোথায়? এর আগে তো চোর পকেটমারগুলো ছিল। বিচিত্র কায়দায় তারা যে বিড়ি-সিগারেট স্মাগল করত তাতে চলে যেত। সে সব অদ্ভুত কৌশল, পরে অবশ্য কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য আমরাও সে সব কায়দা ব্যবহার করেছি। অনবরত তল্লাসির হাত থেকে কোনো লেখা বা নিষিদ্ধ বই লুকিয়ে রাখতে হলে 'চোরের' এমন বুদ্ধি কাজে লাগে যা কোনো ভদ্রসন্তান ভাবতেও পারেন না। এগুলো ট্রেড-সিক্রেট তাই বলা উচিত নয়। বললে সমস্ত 'চোর' আমাকে বয়কট করবেন। আর আমি তো বসেছি ভদ্রসন্তানদের চুরির কথা বলতে যে কথা শুনলে 'চোরে'রাও লজ্জা পাবে, চোরদের চুরির একটা এথিক্স আছে। জাত-চোর কোনো দিন কাউকে সহায়সম্বলহীন করে না। সুযোগ

থাকা সত্ত্বেও সে কয়েক দিন চলার মত মালপত্তর গেরস্তর বাড়িতে রেখে আসে। জাত-ডাকাত মেয়ে বা শিশুর গায়ে হাত দেয় না। জাত-চোর, জাত-ডাকাত কোনো দিন কারুর মুখের খাবার কেড়ে নেয় না। এগুলো যারা করে তারা চোরেদের বা ডাকাতদের জগতে 'সিডিউলড্ কাস্ট' অর্থাৎ ছ্যাঁচড়া। চোর বা ডাকাতদের জগতে সব চেয়ে ঘৃণ্য হল রেপিস্ট এবং পরস্ত্রী-গমনকারীরা। কোনো রেপিস্ট বা পরস্ত্রী-গমনকারীকে পেলে এরা 'পোচাড়া' মেরে আর 'পলিতা' দিয়ে তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। 'পোচাড়া মারা' হল একটা ন্যাকড়ায় মল-মূত্র মাখিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারা। 'পলিতা' হচ্ছে যখন কেউ শুয়ে থাকবে তার পায়ের আঙুলের ফাঁকে দেশলাই কাঠির পোড়া বারুদ থুতু দিয়ে বসিয়ে ধূপকাঠি আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এতে আগুনের শিখা থাকবে না, কিন্তু ধূপের মত সেটা জ্বলতে জ্বলতে পায়ের পাতা পুড়িয়ে ছাড়বে, ঘুমের ঘোরে আগুনের ছেঁকা খেয়ে লাফিয়ে উঠলেই ফোস্কা যাবে ফেটে, জ্বালা যন্ত্রণায় সে রাত্তির তার ঘুমের গয়া। আর জেলখানার লক্-আপে ঘুম না হওয়ার মত অভিশাপ আর দুটো নেই। যুগের সাথে সাথে মন্ত্রীত্ব বদলের ঢেউ এসে পড়েছে জেলেও। এখন জেলে দেখেছি রেপিস্টরা সম্মানীয় কয়েদী। আগে এদের মাথার এক পাশ কামিয়ে এক পাশে লাল-টুপি পরিয়ে দেওয়া হত। তাই ওদের নাম ছিল লাল-টুপি কেস। সমাজের গার্জেনদের রুচি এবং মূল্যবোধের প্রতিফলনে জেলেও রুচি এবং মূল্যবোধ পালটেছে। 'লাল-টুপি'রা এখন কেউ 'চিফ্-রাইটার' কেউ 'আর্দালী'।

বিড়ির কথা বলতে গিয়ে চোরেদের ইতিবৃত্ত শুরু করেছিলাম—আবার বিড়িতেই ফিরে আসি, তবে ট্রেড সিক্রেটটা সিক্রেটই থাক। 'নিশিকুটুম্বে'র নিশিকুটুম্ব—গল্পেই সম্ভব। 'উথলি যখন উঠেছে বাসনা'...তখন কি আর করা যায় সার্জেন্টটাকেই বললাম "একটা বিড়ি দেন তো!" বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে বলল—'আমি তো বিড়ি খাই না স্যার! তা ছাড়া আপনার কাছে ডিউটিতে তো বিড়ি দেশলাই আনা যাবে না। সব নীচে সার্চ করে জমা রেখে দেয়।" অবাক হয়ে গেলাম। কি ভাবছিলাম মনে নেই। হঠাৎ তীক্ষ্ণ মহিলা-কণ্ঠের খিস্তি। এই মা-মেগো এই যে সিগারেট প্যাকেট আর দেশলাইটা, ছেলেটাকে দে। মা-মেগোরা মেরে ফেলেছে গা ছেলেটাকে। পাড়ায় যাবে না, এবার গেলে মুখে (স্ত্রী অঙ্গের নাম) ঘষে দোব।" বুঝতেই পারলাম সামনের লক্-আপ থেকে খিস্তিটা ভেসে আসছে। ওটা দেহ-পসারিণীদের লক্-আপ। সার্জেন্টটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে খিস্তি দেনেওয়ালীর কাছ থেকে সিগারেট এনে একটা আমাকে ধরিয়ে দিল। মহিলা আবার খিস্তি করে উঠল—এই, প্যাকেটটা ঝেড়ে দিলি যে

শালা ? এবার পুলিশপুঙ্গবও ঝাঁঝিয়ে উঠল—চুপ কর মাগী, না হলে লক্-আপ খুলে···তে লাঠি ঢুকিয়ে দোব।" এর পর দু তরফে যে বাক্য বিনিময় চলতে থাকল সে সব আর লেখা যায় না। সেও অভিজ্ঞতা, দেহপসারিণী বনাম পুলিশ! এ বলে আমাকে ছ্যাখ। ও বলে আমাকে ছ্যাখ। সার্জেন্টটা হঠাৎ তেড়ে গেল লকআপের দিকে! তার পর কি চুক্তি হল জানি না। মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"দে না বাবা একটু মালিশ করে। আহা ছেলেটাকে কি মার মেরেছে!" সার্জেন্টকে দেখি এক বোতল মদ নিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। তারপর "বলল আপনার পা দুটো লক-আপের বাইরে একটু চেষ্টা করে বার করে দেন তো! মাগীর আর দয়া ধরে না!" আমি চিত হয়ে শুয়ে পা-দুটো দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে বার করে দিলাম। ভদ্রলোক হাঁটু পর্যন্ত পেশাদারী কায়দায় মদ দিয়ে মালিশ করে দিল। একেবারে ম্যাজিক-রিলিফ, ঘুম এসে গেল। কিন্তু ঘুমানো তো চলবে না। রাত্রি একটার আগে ঘুমানো যায় না। কারণ তারপরই শুরু হয় জেরা অর্থাৎ ধোলাই, তাই গল্প করতে শুরু করলাম পুলিশ সার্জেন্টটার সাথে। বললাম—"লক-আপে মদ ?" সার্জেন্টও বস্তুবাদীর নির্ভীকতার সাথে উত্তর দিল—"ও মাগীদের কে আটকাবে! কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে ? পাড়ায় যেতে হবে না। বাবুকেই যেতে হয়। এমন ঘরে ঢুকিয়ে দেবে যে সারাজীবন ঘায়ে বরবাদ! আর তা ছাড়া দেখলেন তো মুখ ?" হেসে ফেললাম—"তা আপনারটাও তো দেখলাম!" বেচারা এবার সত্যিই লজ্জা পেল—"তা কি করব বলুন, এইসব চোর আর বেশ্যাদের নিয়ে কাজ করতে করতে সব···" হুই হুই করতে করতে একপাল মেয়ে নিয়ে লক্-আপ বাবু এসে হাজির। বুঝলাম এরা সব উলটো দিকের ঘরের বাসিন্দা হবে। আদি রসে সিক্ত রসিকতা করতে করতে লক্-আপবাবু কারুর গালে টোকা মেরে, কারুর পাছায় একটা চিমটি কেটে, কারুর বা থুতনীটা একটু নেড়ে দিতে দিতে গুনে গুনে ঢোকাচ্ছেন। মোট ৪১। ঘটাং শব্দে লক-আপ বন্ধ হল। তালা টেনে পরীক্ষা করে বাবু একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন।

"দেখিস শান্তিতে থাকিস সব। যদি গণ্ডগোল করিস এমন না,···ফাটিয়ে রক্ত বার করে দোব।" ভেতর থেকে কে একজন মুখরা মেয়ে জবাব দিলো—"···তে লোহার-ক্যাপ পরে আসিস!" বাবু চলে গেলেন। আমার পাহারাদার সার্জেন্ট এতক্ষণ অ্যাটেনশনে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে গেটের উলটোদিকে মাথা রেখে গেটের গরাদের ওপর পা তুলে আমি চিত হয়ে শুয়ে আছি। মনে মনে ভাবছি আনন্দ জিনিসটা পেতে জানতে হয়। সার্জেন্ট ডাক দিল—"এই যে দাদা, শুনেন না কি। আরে এদিকে আসুন না, খান একটা সিগারেট খান" শুয়ে

শুয়েই কোনোক্রমে শরীরটা ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আবার কঁকিয়ে উঠলাম। সার্জেণ্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। মাঝবয়সী ভদ্রলোক। উলটোদিকের মেয়েরা তখনও কল কল করে আবোলতাবোল বকে চলেছে। পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। আশ্চর্য! সবাই যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েগুলোও চুপ। সার্জেণ্টটা গেটের পাশে রাখা টুলের ওপর বসে জোরে গরাদের একটা শিক আঁকড়ে ধরে 'রাম, রাম, সীতা রাম' জপছে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। এর আগে তিনতলায় ছিলাম—এসব তো দেখি নি। সার্জেণ্টটা ফিস ফিস করে "বলল এই শুরু হল। তিনার উৎপাত।" দূর থেকে একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। কালকে হয়ত মেরে লক্ আপে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তার কাতরানি! ঘটাং করে লক্-আপ বন্ধের শব্দ! সার্জেণ্টটা আর্তচিৎকার করে উঠল—"দাদা, আপনি উনাকে বলুন না, উনি তো আপনাদের নেতা ছিলেন! আমি তো পাহারাদার!" ফস করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ। "ঐ দেখুন, উনি পাইপ ধরালেন!" আর সহ্য হল না। ন্যাকামিরও একটা শেষ আছে! ধমক দিয়ে উঠলাম—"চুপ করুন তো। বলুন তো কি ব্যাপার?" কে শোনে কার কথা। সে তখন সমানে তারস্বরে 'রাম নাম' করছে আর "আমি না বাবা, আমি না" বলে চিৎকার করছে। দমবন্ধ করা অবস্থা। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য হাঁক দিলাম—"ও মাসীরা ঘুমুলেন নাকি!" কে জবাব দেবে? মনে হল সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরের কোনো আওয়াজও আসছে না, শুধু একটানা যন্ত্রণা-কাতর গোঙানির স্বর ভেসে আসছে। এমন সময় দূর থেকে একটা লক্-আপ খোলার শব্দ ভেসে এল। আবার বন্ধ-এর শব্দ। পাশের লক্-আপে বা ওপরে কেউ এল! কয়েক জোড়া বুটের মস্ মস্ আওয়াজ, একটা গোঙানি ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। ঘুমন্ত দৈত্যপুরী যেন জেগে উঠল, মেয়েগুলো কল কল করে এক সাথে জিজ্ঞাসা করল—"বাবু কিছু বলছিলেন!"

'ওমা তা হলে আপনারা ঘুমুন নি, তো সাড়া দিলেন না কেন?'

"এ তলায় প্রতি মঙ্গলবার তিনি আসেন তো, আজ চার বছর ধরে আসছেন। এই সময় তাঁর পুজো করতে হয়! তিনি নাকি বাবু আমাদের ইজ্জতের কথা বলতেন, তা এই মা-মেগোরো তিনাকে মেরে ফেলল গো! তিনি কত বড় মানুষ ছিলেন জানেন বাবু আপনি?"

সার্জেণ্টটা এতক্ষণে স্ব-মূর্তি ধারণ করল—"এই মাগী একটু জল দে তো! নখ ডোবাবি না, দেখিস কাপড়ে না ঠেকে!" জল খেয়েই ধমকে উঠল—"যা গিয়ে ঘুমো।" তারপর আমাকে বলল—"আজ আপনি ছিলেন বলে বেঁচে গেলুম। আমার

কি দোষ বলুন, আমি তো পাহারাদার ছিলাম: শুধু স্ট্রেচারটা বয়ে নিয়ে গিয়েছি।"

আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এই লোকটার হাত থেকে কি করে মুক্তি পেতে পারি। এ বিরক্তিকর বক্‌বকানি থামাবে না। সত্যি যদি চারু মজুমদারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে তা হলে এদের মধ্যে এই পাপ-বোধ কেন? কেন এই অপরাধ বোধ? এমন সময় লক্-আপ বাবু এসে হাজির—"আজিজুল হক—অফিস কল"

অফিস কল। এই একটা কথা শুনলে লক্-আপের আসামীরা আঁতকে ওঠে।

'অফিস-কল' মানে তাদের কাছে সাক্ষাৎ শমন। ডি-ডি অফিসে যেতে হবে। লোকে যেটাকে টর্চার চেম্বার বলে, প্রশ্ন—গালাগালি আর নির্যাতন। সার্জেণ্টটা বোধ হয় আমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। ওর মুখটা শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল—"স্যার, এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যাবেন।" লক্-আপ বাবু একটু ম্লান হেসে বললেন—"এ তো তোমার-আমার কেস নয়, স্বয়ং সি পি-র কেস।" উলটোদিকের লক্-আপ থেকে মেয়েগুলো খিস্তি করে উঠল। স্ট্রেচার নিয়ে দুজন হাজির। রাত দুটো। স্ট্রেচারে শুয়ে লক্-আপ বিল্ডিং থেকে চললাম অফিস বিল্ডিং-এ। আশ্চর্য কোনো বিকার নেই। আসলে বিপদটা আপদটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভয়, সেটা যখন শিয়রে শমন হিসাবে হাজির হয়ে যায় তখন আর ভয় থাকে না। এখন আর মারার কোনো জায়গাও নেই। এক হয় মেরে ফেলা। সেটা পারবে না কারণ লোকে জেনে গেছে। কোর্টে তুলতো না তাহলে। আমার মাকে আরও কয়েকশ বার তাঁর অনুপস্থিতিতেই ধর্ষিতা হতে হবে—আমাকে বসে বসে এই সমস্ত জানোয়ারগুলোর পাশবিক অঙ্গভঙ্গি দেখতে হবে—অসহ্য। না প্রথম প্রথম অসহ্য লাগত। এখন আর লাগে না। এরা সব মানসিক ভাবে বিকৃত। কোনো সুস্থ মানুষই এই ধরনের ব্যবহার করতে পারে না।

লক্-আপ থেকে লনটা পার হয়ে উলটোদিকের বাড়িটাই অফিস, দু-তলায় ডি-ডি অফিস। চারতলা বিল্ডিং। উপরে থাকে কয়েকজন অফিসার। খুন-খারাবী রঙ-এর বিল্ডিং। রঙটা সত্যিই সার্থক। এর রঙটা বোধহয় মানুষের রক্তেই করা হয়েছে। প্রতিটি ইটই অত্যাচারের সাক্ষী। ফ্লাড-লাইটে আলোকিত লনটা দেখে বোঝা গেল না—আকাশে চাঁদ আছে কি না। অভ্যাসবশেই আকাশের দিকে তাকালাম। কাল-পুরুষটা তীর বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি খুঁজছি—সপ্তর্ষি মণ্ডল, স্ট্রেচার যারা বইছিল ওদের বললাম, দাদা উত্তর দিকটা কোনটা?

ওরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, একটু সামাল দিতে দিতেই দেখতে পেলাম সপ্তর্ষি মণ্ডল। বিশাল জিজ্ঞাসার চিহ্ন! ঐ তো বশিষ্ঠ! ওর গা ঘেঁষে অরুন্ধতী কেমন সুন্দর গায়ে ছুঁয়ে আছে। সাত ঋষির দরবারে অরুন্ধতী ঢুকে পড়ল কি করে? আশ্চর্য একরোখা মহিলা তো! এই অরুন্ধতী তারাটা চিরকাল আমার কাছে একটা রহস্য। রোমান্টিক রহস্য। কারণটা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের একটা লোকাচার নতুন বউ শ্বশুরবাড়ি এলে তাকে অরুন্ধতী দেখানো হয়। প্রথমে সপ্তর্ষি মণ্ডল, তারপর উজ্জ্বল-বশিষ্ঠতে বউ-এর দৃষ্টি নিয়ে যাওয়া হয়, তার পর তাকে বলা হয়—ঐ পাশে মিটমিট করছে যেটা ওটাই অরুন্ধতী! "দ্যাখো বউ, দ্যাখো।" স্থূল-বস্তু থেকে সূক্ষ্ম বস্তুতে দৃষ্টি নিয়ে যাবার এই প্রক্রিয়াটা বেশ মজার! পরে কত দিন এই উদাহরণটা ব্যবহার করেছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা মানুষের পেটের সমস্যাটা বুঝতেই চাইতেন না, অথচ বড় বড় কথা বলতেন—তাদের বোঝানোর জন্য বলতাম—বশিষ্ঠের ঔজ্জ্বল্যই অরুন্ধতীকে খুঁজে দেয়। এই গাঁয়ের এই এক বিঘে জমি দখলদারীই কৃষকদের দেখিয়ে দেবে দিল্লি-কলকাতা! সুতরাং জমিতে দৃষ্টিটা নিয়ে যাও। তারপর ওঁদের দৃষ্টিকে একটু একটু করে প্রসারিত করতে থাক, দেখবে ওঁরা ঠিক দিল্লির সিংহাসনটা দেখতে পেয়েছেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দৃষ্টিটাকে সরাতে হবে। না হলেই চোরাবালিতে পড়ে যাবে।

অক্র কে দেখলাম উত্তর আকাশে। বেচারা নিঃসঙ্গ। ওখান থেকে লাইনটা বাড়িয়ে দিতেই ম্যাড়-ম্যাড়ে 'ধ্রুবতারা।'

স্থির-অনড়, নিজের অবস্থান পালটাতে রাজী নন। 'যার যেদিক খুশি ঘোরো আমি আমার অবস্থান পালটাতে রাজী নই!' ধ্রুবতারা দেখতে দেখতেই ঢুকলাম অফিস বিল্ডিং-এর গেটে। কলাপসিবেল গেটে দু-জন সি আর পি পাহারা দিচ্ছে। ওরা সরে দাঁড়াল। একজন বাঙালি সশস্ত্র জওয়ান সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ ছুটে এসে জলন্ত সিগারেটটা আমার গালে চেপে ধরে 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' করে হাসতে থাকল। স্ট্রেচারবাহকরা ধমক দিল—"এই শ্লা, তোর কি করেছে, যাদের আসামী তারাই সামলাক! এরই জন্য তো শ্লা রা মরে!" রাত দুটো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে সারি সারি ঘর। কোনোটার দোরের ওপর—লেখা মার্ডার সেকসন, কোনোটার গায়ে, বার্গলারি, রবারি, আমার গন্তব্য আমি জানি, মাঝামাঝি হল-ঘরের মত ঘরটা—যার গায়ে লেখা এ্যান্টি-নক্শাল সেকশন—আর গুহনিয়োগী হলের লাগোয়া ঘরটা ইন্সপেক্টারের। হলের ভেতরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে স্ট্রেচারবাহকরা চলে গেল।

কয়েকজন বসে জুয়া খেলছে। বিভিন্ন সময় এদের সাথে পরিচিত হবার

'সৌভাগ্য' হয়েছে সুতরাং চিনতে অসুবিধা হল না। আমি শুয়ে আছি—ওদিকে মদ-আর জুয়ার হুল্লোড়; অদ্ভুত ব্যাপার, জুয়া-নিরোধ করার দায়িত্বে আছে এরাই। কতক্ষণ এরকম চলত জানি না। হঠাৎ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল 'সাহেব আসছেন'। সাহেব ঢুকলেন। বাইরে কোথাও ঘুম-ভাঙানিয়া পাখি চিৎকার করে উঠছে। অনবরত ভারী গাড়ির আওয়াজ। আজকাল আওয়াজ শুনেই বলে দিতে পারি—কোনটা পুলিশ-ভ্যানের শব্দ। সাহেব এলেন, পেছনে ইনসপেকটর ইন চার্জ। হলের লাগোয়া ছোটঘরটার পর্দা সরিয়ে ঢোকার মুখে আমাকে দেখে একটু বক্রহাসি হেসে বললেন—"খেল খতম।" স্যালুটের শব্দসহ তিনি—নিঃশব্দে কুরসী আসীন হয়েই হুঙ্কার ছাড়লেন—"লে-আও।" পিলে চমকানো হাঁক। দু-জন জুয়াড়ি পুলিশের কাঁধে চেপে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। উনি উলটোদিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বসুন।" দু-জনের মাঝখানে একটা টেবিল। ওপারে উনি আর এ পারে আমি। বাকিরা স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেল?

"রুণুবাবু, দেখো তো চা পাও কিনা।"

"ইয়েস স্যার।" বলে রুণুবাবুও হাঁক ছাড়লেন মনে হল।

ভাবছি এ কেমন হবে।

"তা হক্ সাহেব, আমাকে চেনেন।" প্রশ্ন করলেন। মাথা নাড়লাম। 'ন্না' মনে মনে গালাগালি যে দিলাম না তা নয়, বললাম—'কে হে তুমি হরিদাস যে তোমাকে চিনতে হবে।' একটু আশ্চর্য হলেন বটে তবে পরিচয়টা দিলেন না। আমিও আশ্চর্য হয়ে ওর চোখটা দেখছিলাম। মাছের চোখ। মনে হয় চোখের পাতা নেই। অদ্ভুত ঠাণ্ডা। কোনো জীবন্ত মানুষের এমন চোখ আমি দেখি নি। হ্যাঁ, এই লোকই পারে। কোলরিজের কবিতা থেকে তুলে আনা, 'ডেমন'। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল 'একী চোখ রে বাবা।' বোধ হয় একটু হাসলেন।

প্রঃ—'লেখাপড়া কতদূর?'

উঃ—শূন্য, কিছুই শিখি নি, এটুকুই শিখেছি।

প্রশ্নকর্তার স্বগতোক্তি—'হার্ড-নাট।'

চালাক, একে মেরে কিচ্ছু হবে না। তারপর হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন:

'জেল ভেঙে কি হবে?'

"দেখুন এটা একটা অবজেকটিভ ল, ইনডিপেনডেণ্ট অফ ম্যান উইল। যতদিন জেল থাকবে জেল ভাঙাও থাকবে। কারুরই ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে না।"

—"জেল ভাঙার বিরোধিতা করে আপনি একটা বিবৃতি দিন না।"

—"সে কী মশায়! আমি যদি সূর্যের বিরোধিতা করি—সূর্য উঠবে না নাকি?"

একটু দাঁত কিড়-মিড়ানি। বুঝতে পারলাম না এর পরের অধ্যায়টা কি। পায়ের যা অবস্থা ঝোলানো যাবে না। না, দেখলাম উনি সামলে নিয়েছেন।

—"না, তা বলছি না, বলছিলাম—এই সেন্সলেস ভায়োলেন্সের বিরোধিতা করুন।"

—"তা সেন্সিবল ভায়োলেন্স কোনটা?" আমার উত্তর শুনে হোঁচট খেলেন?

আমিও স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিয়েছি—ওকে প্রোভোক করে যাব—যাতে গায়ে হাত তুলতে বাধ্য হয়। আর খেপে গেলে প্রশ্নটা ওলটপালট হয়ে যাবে। না, ইনিও খুব চতুর। আবার বাউন্সারটা ডাক করে বেরিয়ে যেতে দিলেন। হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন—"আপনাকে বলতে হবেই কোন কোন জেল-অফিসার আপনাদের সাহায্য করেছিল।" "কিছু মনে করবেন না, আপনাদের অবস্থা কি রকম জানেন, আমি একটা তামিল কবিতার অনুবাদ করেছিলাম, ঠিক সেইরকম—

'বাড়িকে রক্ষার জন্য
বানালাম একটা বাগান,
বাগানকে বাঁচাতে—
বেড়া,
বেড়ার জন্য রাখলাম দরওয়ান,
এখন দরওয়ানকে নিয়েই হয়েছে
যত চিন্তা'।"

ব্যস এবারে আমার হতভম্ব হবার পালা। তামিল! "তার মানে আপনি অন্ধ্রে গিয়েছিলেন, শ্রীকাকুলামের সাথে নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে।" ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। এ কীরে বাবা! এ লোকটা কি জানেও না শ্রীকাকুলামের ভাষা তামিল নয়। আর তা ছাড়া তামিল কবিতা পড়ার জন্য আজকাল তামিল না জানলেও চলে! হৈ-হৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল! "অন্ধ্রে যোগাযোগ কর।"

সব্বনাশের মাথায় বাড়ি! বেশি কথা বলার ফল।

কেন আজকালকার মানুষ দর্শনশাস্ত্র জানতে আগ্রহী নন এটা বোঝাবার জন্য রাসেল খুব চমৎকার একটা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণটা বাংলা করলে দাঁড়াবে—শেয়ালদাতে দাঁড়িয়ে এক পথিক একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মশায় কলেজ স্ট্রিট যাবার সোজা রাস্তা কোনটা?''

দার্শনিক—'কলেজ স্ট্রিট?'

পথিক—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দার্শনিক—'কলেজ স্ট্রিটের রাস্তা?'

পথিক—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দার্শনিক—'সোজা রাস্তা?'

পথিক—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

দার্শনিক—'জানি না তো।'

প্রশ্নের চরিত্র বুঝতে বুঝতেই দার্শনিকের সময় গেল। তখন পথিককে তো গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য অন্য পথ নিতেই হবে। তরুণদের রাজনীতি-নিস্পৃহতা ঠিক কি এই কারণেই নয়। বিপ্লবী বুলির আড়ালে শুধুই কচকচি আর রাস্তা দেখানোর সময়—'করে নাও!'

হ্যাঁ ঠিকই, বেঁচে থাকার মত অসৎ হতে পারব না। আবার মরার মত ভীরুও নই, তাই জেলই আমার নির্দিষ্ট জায়গা। একটা বিপ্লবী পার্টিকে অবশ্যই গোপন পার্টি হতেই হবে—কিন্তু এই গোপন পার্টি, পার্টি সভ্যদের চারিত্রিক অবনতি ঘটাতে পারে। আত্মপরিচয় গোপনের মাধ্যম দিয়ে যে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস শুরু হয়—সেটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায়—যে যত বেশিদিন গোপন থাকতে বাধ্য হয় সে তত বড় মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। হ্যাঁ, সত্য-মিথ্যাকে আপেক্ষিক ধরেই বলছি। নাম বাবার নাম গোপনের মধ্যে দিয়ে যে প্রক্রিয়াটা শুরু হয়, পরে সেটা অভ্যাসই হয়ে যায়। অহেতুক মিথ্যা বলার একটা প্রবণতা দানা বাঁধে। এক কথায় এর বিরুদ্ধে সচেতন লড়াই চালাতে না পারলে এক একজন প্যাথোলজিকাল লায়ার তৈরি হয়।

বাচ্চা বেলা থেকে খুবই দুঃসাহসী ছিলাম। আর দুঃসাহসী লোক আর যাই হোক মিথ্যাবাদী হয় না। তাছাড়া ছোট বয়সে মা শেখাতেন মিথ্যা বললে বাবা মারা যায়। এটা একটা সংস্কারই হয়ে গেছে। এটা এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস করে ফেলি। প্রথম আত্মগোপন করার পর যখন শুনলাম বাবার ক্যান্সার হয়েছে, বুকটা ধক করে উঠল—এই আমি মিথ্যা কথা বলছি এর জন্যই বাবার ক্যান্সার হল। পাপ-পুণ্য বোধ থেকে নয়—কেমন একটা অপরাধবোধ থেকেই কথাগুলো মনে হয়েছিল। সহকর্মীদের হাসি-ঠাট্টায় ধাক্কাটা কাটালাম বটে কিন্তু সংস্কারটা রয়েই গেছে। গোপন পার্টি পরিচালনা করতে গিয়ে এর সব থেকে মারাত্মক দিক লক্ষ করেছি। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা রিপোর্ট: সব সময়ই ধরা যেত না। অথচ ঐ রিপোর্ট-এর ভিত্তিতেই নির্দেশ দিতে হবে, কৌশল নির্ধারণ করতে হবে, ভুল তো হবেই, হতে বাধ্য। একটা সিদ্ধান্ত যখন সকলে মিলেই নিলেন যেই সেটা ব্যর্থ

হল—অমনি তার দায়িত্ব একজনের ঘাড়ে চাপানোর প্রক্রিয়া তো ঐ প্রথম দিনেই শুরু। খবর লিক করে যাকে ধরিয়ে দেওয়া হল সেই হল বিশ্বাস ভঙ্গকারী। কাকে দোষ দেব? পলিটিক্‌স আর পলিট্রিক্‌স যেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে সেখানে তথাকথিত পলিটিক্‌স্‌কে শত শত সেলাম।

তাহলে পথ কি? প্রতিটি কর্মীর এই চারিত্রিক অধঃপতন '৭১ সাল থেকেই আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিকে গোপন পার্টির আবশ্যকতা, (বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা, এবং আমাদের দেশে ছোটখাটো হলেও '৬২ সালের ঘটনার পর এটা যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত একটা সত্য হিসাবে স্বীকৃত।) অন্যদিকে তার সমস্ত কুফল, গোপন পার্টির কুফল নিয়ে অনেকেই অনেক আলোচনা করেছেন, আমার তো মনে হয় সবচেয়ে বড় কুফল-কর্মীদের চারিত্রিক অবনতি, কোনো দ্বন্দ্বতত্ত্বের দুন্দুভি বাজিয়েই এটাকে জাস্টিফাই করা উচিত নয়।

বিচ্ছিন্নতাবোধ অনেক অপকর্মের জন্য দায়ী। এ নিয়ে জেলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। কেউ কোনো গুরুত্ব দিতেই রাজী হলেন না। তাঁরা সংস্কারের বশেই বিরোধিতা করলেন। কিন্তু গোপন কাজ করতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খেতে শুরু করে তাঁদের মধ্যেও কারো কারো চিন্তাভাবনা শুরু হল। জেলের মধ্যে একটার পর একটা অঘটন ঘটতে শুরু করল। এমন কি একটা কাগজ-ও লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তখন তাঁদের বললাম, 'দেড়-হাতি গামছা পরে ঘোমটা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়, মুখ ঢাকতে গিয়ে পাছা বেরিয়ে যেতে বাধ্য', এমন কিছু কাজ কর যাতে সাধারণ বন্দীদের আস্থা ফেরত আসে। একটু খোলা-মেলা আবহাওয়ার চালু কর। 'লিকেজ' নয়, বিস্তৃতির অভাবই ধরা পড়ার কারণ। বিস্তৃতি থাকলে যত 'লিকেজ'ই হোক খুব একটা ক্ষয় ক্ষতি হবে না। আবার ধর্মীয় সংস্কার নিয়ে বিরোধিতা শুরু হল। এর কারণ বিরোধীরা খোলা-মেলা বলতে এমন সব কাজ শুরু করলেন যাকে 'উলঙ্গ নৃত্য' বললেও কম বলা হবে। দুইই চরম! মুষ্টিমেয় আমরা কজন পড়লাম বিপদে। সংস্কারমূলক কাজ না বন্দী-দশা থেকে মুক্তির কাজ—কোন্‌টা প্রধান? আমাদের বক্তব্য ছিল—মুক্তির কাজকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সংস্কারমূলক কাজ। সব মানুষকে এই কাজে জড়িয়ে নেওয়া। কেউ সচেতনভাবে করবে কেউবা না জেনেই অংশ গ্রহণ করবে। এক-জন 'বিপ্লবী' হঠাৎ একটা চমৎকার কথা বললেন—'সংস্কারমূলক কাজ করবে সংশোধনবাদীরা, আমরা ফল ভোগ করব।' অদ্ভুত কথা তো? আমার প্রায় 'ভিরমি' খাবার অবস্থা! সামলে নিয়ে বললাম, "সেকি! চিরকাল তো জানতাম লড়াই করেন বিপ্লবীরা, সংশোধনবাদীরা ফল ভোগ করে। আমাদের পার্টি

কংগ্রেসও তো তাই বলল—মধ্যপন্থীরা ফলটা আত্মসাৎ করল, তুই এটা কি বলছিস।” সে গোঁ ধরে বসল। মনে মনে বললাম—“হায় খোদা! চারু মজুমদারকে চারু মজুমদারপন্থীদের হাত থেকে রক্ষা কর! এরা লোকটাকে সন্ত্রাসবাদী বানিয়েই ছাড়বে।” নীরো মার্কা হিরোর থেকে একজন জিরো মার্কা হৃদয়বান মানুষ যে অনেক বেশি মূল্যবান এটা কবে বুঝবে এরা?

ভুবনের ভার এই নীরো-মার্কা-হিরোদের হাতে নেই। এরা শুধু পারে ইতিহাসের চাকাকে সাময়িকভাবে পেছনে টেনে রাখতে। ইতিহাস গড়ে ৺., শান্ত-ভীরু হৃদয়বান মানুষগুলোই, হিরোরা নয়। হিরো সাজার প্রবণতার শিকার হতে দেখেছি কত সম্ভাবনাময় তরুণকে আবার দেখেছি পাতি-হিরোদের কলরবে সত্যিকারের হিরোদের হারিয়ে যেতে। মনে পড়ছে জুলিয়স ফুচিকের কথা, “কে হিরো? একটা ছেলে জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছেলেটা তার গলা জড়িয়ে ধরল, দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে, অন্য একজন একটা নৌকা জোগাড় করে দড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল, দড়িটা ছুঁড়ে দিল ডুবন্ত মানুষ দুটোর দিকে। দু-জনেই উঠে এল। কে আসল হিরো?” আমাদের শিল্প-সাহিত্য সংবাদ-মাধ্যম প্রথম ব্যক্তির বীরত্বপনা প্রকাশেই ব্যস্ত। পুলিশ প্রশাসনের কাম্য এটাই। ওরাও এদেরই চেনা'ত চায়, এদেরই তুলে ধরতে চায়—যাতে করে সকলেই ডুবে মরে। ওরা এক ি ল দুটো পাখিই মারে। এরই জন্য আমি ফ্যানটম, অরণ্যদেব প্রভৃতির বিরোধী।